# সমকালীন বিশ্বে মুসলমান

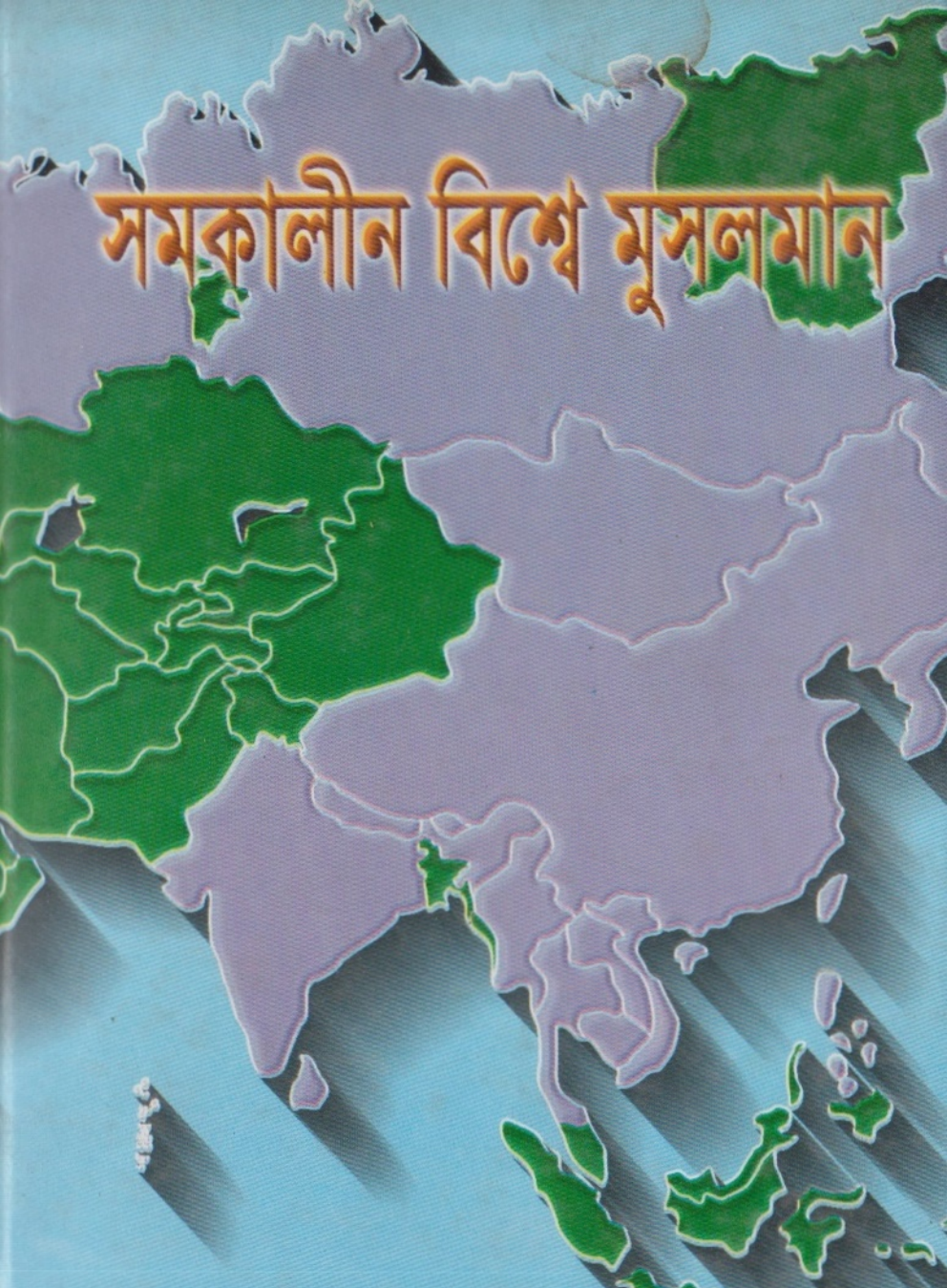

নূর হোসেন মজিদী

# সমকালীন বিশ্বে মুসলমান

নূর হোসেন মজিদী

কনফিডেন্ট পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিঃ

www.pathagar.com

# সমকালীন বিশ্বে মুসলমান

নূর হোসেন মজিদী

**প্রকাশক ঃ**
**কনফিডেন্ট পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিঃ**
১৩২, ইউনিভার্সিটি মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৬১৩২০১

**প্রকাশকাল ঃ**
জমাদিউস সানী, ১৪২১
আশ্বিন, ১৪০৭
সেপ্টেম্বর, ২০০০

**প্রচ্ছদ ঃ**
আরিফুর রহমান

**কম্পিউটার গ্রাফিক্স্ ঃ**
নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড (পঞ্চম তলা), ঢাকা-১০০০

**কম্পোজ ঃ**
চৌকস
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড (চতুর্থ তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৪১৯৬৫৪

**মুদ্রণে ঃ**
এবিসি কালার প্রসেস এন্ড প্রিন্টার্স
১৪২/১৪৩, ইউনিভার্সিটি মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৬১৩২০১

**মূল্য ঃ** ১৩০ টাকা

---

**SAMOKALIN BISHWE MUSALMAN (MUSLIMS IN THE CONTEMPORARY WORLD)** by **Nur Hosain Majidi** Published by **Confident Publications (Pvt.) Ltd,** 132, University Market, Katabon, Dhaka-1000, Bangladesh. **Price** : Tk. 130·00 only

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

# প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ। এদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮৮ ভাগ মুসলমান। শুধু তা-ই নয়, দেশে সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে দ্বীনী অনুভূতি খুবই প্রবল। এটা আশার কথা। এই দ্বীনী অনুভূতির একটি বড় ধরনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ। আর এ ভ্রাতৃত্ববোধের অনিবার্য দাবী হিসেবেই একজন মুসলমান সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সম্বন্ধে জানতে চায়। এই জানার আগ্রহ পূরণের লক্ষ্যেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ।

গ্রন্থকার অত্যন্ত সংক্ষেপে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের এবং বিশ্বের মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ থেকে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জানার আকাঙ্ক্ষা যেমন পরিতৃপ্ত হবে, তেমনি বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদের জন্যেও গ্রন্থটি খুবই সহায়ক হবে।

এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এতে সন্নিবেশিত বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা সংক্রান্ত চার্ট এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক তথ্যাদি। এ ধরনের গবেষণা ইতিপূর্বে কেউ করেছেন বলে জানা নেই। অবশ্য তথ্যসূত্রাদির দুর্বলতার কারণে সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যানসমূহ প্রকৃত অবস্থা থেকে সামান্য কম-বেশী হয়ে থাকতে পারে। তবে কোন বড় ধরনের পার্থক্যের সম্ভাবনা যে নেই তা যে কোন পাঠক-পাঠিকার নিকটই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। অবশ্য যে কোন পরিসংখ্যানের বেলায়ই কমবেশী এরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সকলের নিকটই গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যান গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শতাব্দীর সমাপ্তিতে বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা ১৭৩ কোটির ওপরে দাঁড়াচ্ছে। গ্রন্থকারের মতে, তথ্যসূত্রাদির দুর্বলতা বিবেচনায় সতর্ক হিসাবেও ১৬৫ কোটির নীচে নয় কিছুতেই। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিঃসন্দেহে। কারণ, সর্বত্র বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা একশ' বা সোয়াশ' কোটি বলে উল্লেখ করা হয়। অথচ প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী। বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যার সঠিক তথ্য নিঃসন্দেহে মুসলিম মনস্তত্ত্বে প্রভাব বিস্তার করবে।

এ গ্রন্থটি শুধু সাধারণ পাঠক-পাঠিকা ও ছাত্রছাত্রীদের জন্যই নয়, বরং ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, সুধী পাঠক-পাঠিকা ও বিশ্বপরিস্থিতির পর্যবেক্ষকদের জন্যও লাভজনক হবে। বিশেষ করে সংবাদপত্রের সাথে যারা জড়িত এ গ্রন্থটি তাঁদের যথেষ্ট কাজে লাগবে।

আমরা আশা করি গ্রন্থটি সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আদরণীয় হবে। তাহলেই আমাদের উদ্যোগ সার্থক হবে।

ঢাকা
জমাদিউস সানী, ১৪২১
আশ্বিন, ১৪০৭
সেপ্টেম্বর, ২০০০

কনফিডেন্ট পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে
**অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহাদত হোসাইন খান**

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

# ভূমিকা

বর্তমান যুগকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী গণজাগরণের যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে বর্তমান যুগের পরিধি সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বলে গণ্য করা যায়। কারণ এ সময়টিতে এমন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় যা বিশ্বব্যাপী মুসলিম গণজাগরণের কারণ হয়। এর মধ্যে প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে ১৯৭৯ সালে সংঘটিত ইরানের ইসলামী বিপ্লব এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে নব্বই-এর দশকের শুরুতে পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি।

প্রথম ঘটনাটি বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামকে এমন একটি বিপ্লবী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে যা কেবল জনতার ঈমানী শক্তির দ্বারা প্রবল প্রতাপান্বিত সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম। দ্বিতীয়তঃ এ ঘটনা দল-মত-মাযহাব নির্বিশেষে মুসলমানদের সামনে এ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে যে, এ যুগেও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা ও যুগের চাহিদা মিটিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব। এর ফলে বিশ্বব্যাপী সকল ধারার ইসলামী আন্দোলনেই নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়।

দ্বিতীয় ঘটনার ফলে একদিকে মধ্য এশিয়ায় ছয়টি, ইউরোপে দুইটি ও আফ্রিকায় একটি নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে মুসলিম জাহানের পরিধি বিস্তৃততর হয়, অন্যদিকে কমিউনিজমের বিদায়ের ফলে পাশ্চাত্যের পক্ষপুটাশ্রিত মুসলিম জাতিসমূহের জন্যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ও কার্যতঃ স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্যে প্রবল আগ্রহ জন্ম নেয়।

বিগত দুই দশকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যে আরো কতগুলো আশাব্যঞ্জক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সূদানের ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তর, লেবাননের মুসলমানদের প্রতিরোধের মুখে দেশটি থেকে দখলদার যায়নবাদী ইসরাইলী বাহিনীর পশ্চাদপসরণ, আফগানিস্তান থেকে প্রথমে সোভিয়েত বাহিনীর ও পরে কমিউনিস্ট সরকারের বিদায়, ফিলিপাইনের মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসন লাভ এবং আলজেরিয়ায় ইসলামী গণজাগরণ।

অবশ্য এ সময় ইসলামের দুশমনরাও নিশ্চুপ বসে ছিল না। তারা তাদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার সাহায্যে মুসলিম উম্মাহ্‌র, বিশেষতঃ ইসলামী শক্তির উত্থানকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের নাশকতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলাম-বিরোধী শক্তির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের ফলে ইরান-ইরাক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এরপর ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের নাটক অভিনীত ও সেই ছুতায় বহুজাতিক বাহিনীর নামে আমেরিকার পক্ষ থেকে ইরাকে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী সামরিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। এছাড়া বসনীয় ও

www.pathagar.com

কসোভার মুসলমানদের বিরুদ্ধে জাতিগত নির্মূলকরণের পৈশাচিক অভিযান চালানো হয়, সোমালিয়ায় গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়, মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ ইথিওপিয়াকে বিভক্ত করা হয়, কুর্দী বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে, আলজেরিয়ায় ইসলামের পক্ষে প্রদত্ত গণরায় বানচাল করে দেয়া হয়, আযারবাইজানের অংশবিশেষ আর্মেনিয়া ও তার সমর্থনপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে চলে যায়, বাকুতে গণহত্যা সংঘটিত হয়, চেচনিয়ার স্বাধীনতাকে অস্ত্রের জোরে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, আফগানিস্তানে নতুন করে ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করা হয়, ইন্দোনেশিযা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব তাইমুরকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হয় এবং বাংলাদেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে কার্যতঃ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

আর মাত্র সাড়ে চার মাস পর একবিংশ শতাব্দী শুরু হবে। মুসলিম উম্মাহ্ কয়েকটি বড় বড় সমস্যা সহকারে নতুন শতাব্দীতে পা রাখতে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে কুর্দী বিদ্রোহ, আলজেরিয়া ও আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ, ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের মাধ্যমে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা, ফিলিস্তিন সমস্যা; কাশ্মীর, আরাকান ও সিনকিয়াং-এর মুক্তিযুদ্ধ, নগোর্নো-কারাবাগ পুনরুদ্ধার সমস্যা, দক্ষিণ সূদানের খৃস্টান বিদ্রোহ ইত্যাদি।

যোগ-বিয়োগের ফলে সার্বিকভাবে বিগত দুই দশককে ইসলামী গণজাগরণের যুগ বলাই সঙ্গত যদিও ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্রের ফলে এ গণজাগরণ যতখানি সম্ভব ছিল ততখানি হয় নি। তবে মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানগত অগ্রযাত্রায় কিছুটা হলেও সাফল্য অর্জিত হওয়ায় এবং বিশ্বব্যাপী যোগাযোগব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় সার্বিকভাবে বলা চলে যে, একবিংশ শতাব্দী হবে মুসলমানদের বিস্তৃতি ও বিজয় এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার শতাব্দী। তাই ইসলামের দুশমনরা এ বিজয় ও অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বলা বাহুল্য যে, ইসলামের দুশমনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ দুশমন হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য ও ক্রুসেডার শক্তি। আসলে এ দু'টি অপশক্তি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে এ অপশক্তির লড়াই শুরু থেকেই চলে আসছে এবং এখনো চলছে; ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। মাঝখানে বিগত অর্ধ শতাব্দীকাল এ অপশক্তি তাদের মানসিক তাবেদার মুসলিম দেশসমূহের সরকারগুলোকে এবং সেই সাথে অনেক ইসলামী আন্দোলনকেও কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদী ও ক্রুসেডার শক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার কর্মসূচীর পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। বরং এ অপশক্তি ইসলামের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মরণকামড় শুরু করেছে। কারণ, বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত-লুণ্ঠিত-প্রতারিত মানুষের সামনে মাত্র দু'টি মুক্তিপথ উপস্থাপিত হচ্ছিল ঃ ইসলাম ও কমিউনিজম।

শতাব্দীর পর শতাব্দী দমননীতির শিকার ইসলামের কণ্ঠস্বর খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে কমিউনিজম মানুষের ভাত-কাপড়ের সমাধানের বিনিময়ে তার ধর্মপালন, মতপ্রকাশ ও মালিকানার স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছিল। এ কারণে পুঁজিবাদী

www.pathagar.com

ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে মজলুম মানবতার ওপর আধিপত্য অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। একই কারণে কমিউনিজমের ধ্বংসসাধন সম্ভব হয়।

কিন্তু কমিউনিজমের এ পরাজয় ক্রুসেডারদের জন্যে বিজয়ের পরমুহূর্তেই আতঙ্ক নিয়ে আসে। কারণ, কমিউনিজমের বিদায়ের ফলে মুসলিম দেশসমূহের তালিকায় শুধু নতুন আট-নয়টি দেশের নামই যোগ হয় নি, বরং সাম্রাজ্যবাদী শোষকগোষ্ঠী ও তাদের তাবেদাররা নিজেদের মোকাবিলায় একটিমাত্র শক্তিকে দণ্ডায়মান দেখতে পায়; তা হচ্ছে ইসলামী শক্তি। বিশেষ করে ধর্ম, মতপ্রকাশ ও মালিকানার স্বাধীনতার নিশ্চয়তার পাশাপাশি পুঁজিবাদী শোষণ-লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অবসান ঘটানোর মুক্তিবাণীর কারণে ইসলামকে তারা অপ্রতিরোধ্য দেখতে পায়।[১] তাই ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আর ক্রুসেডাররা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এ সিদ্ধান্তের কথা গোপন করে নি।

অন্যদিকে কমিউনিজমের পতন ইসলামের জন্যেও আশা ও আতঙ্ক উভয়ের কারণস্বরূপ হয়েছে। কারণ, এতদিন ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কমিউনিজমের দেয়াল ছিল যা কৌশলগতভাবে ক্রুসেডারদের হাত থেকে ইসলামের নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করছিল। হঠাৎ করে সে দেয়াল ভেঙ্গে পড়ায় ইসলাম নিজেকে বিশ্বশাসক হবার দাবীদার এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ শয়তানী শক্তির সাথে যুদ্ধরত দেখতে পায়, অথচ এর সাথে যুদ্ধের জন্যে তার প্রস্তুতি তখনো শেষ হয় নি। অন্যদিকে আশার কারণ এই যে, ইতিমধ্যে ইসলামী গণজাগরণ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। তাছাড়া কমিউনিজমের জুজুর ভয়ে যারা নিজেদের চিরশত্রু পাশ্চাত্যের কোলে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের জন্যে এবার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে এবং ইসলামের মুক্তিবাণী গ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে ইসলামী শক্তির অংশবিশেষ কমিউনিজমের ভয়ে সাম্রাজ্যবাদের কোলে আশ্রয় নেয়ার মত ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর ভূমিকা গ্রহণ করায় ইসলাম সম্পর্কে যাদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যারা সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমকে মুক্তিদূত মনে করেছিল, কমিউনিজমের ব্যর্থতা এবং সাম্রাজ্যবাদ বনাম ইসলাম লড়াই এই উভয় গোষ্ঠীরই অনেককে ইসলামের কাতারে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

এ প্রেক্ষিতে সমকালীন বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থান ও অবস্থা এবং ইসলামী আন্দোলনসমূহের পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা ন্যূনতম ধারণা থাকা প্রতিটি মুসলমানের, বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে অপরিহার্য। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে

---

*(১) উপনিবেশিক যুগের আলজেরিয়া সংক্রান্ত ফরাসী বিশেষজ্ঞ বেনজামিন স্টুয়ারা বলেন ঃ "প্রাচ্যের পতনের পর এখন দক্ষিণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ এখন প্রাচ্যের ঠাণ্ডা হুমকির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।"*
*(দৈনিক এত্তেলাআত, তেহরান ঃ ২৫-১-১৯৯৩)*
*বলা বাহুল্য যে, এখানে 'দক্ষিণ' বলতে পূর্ব গোলার্ধের দক্ষিণ তথা মুসলিম বিশ্বকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ পশ্চিম গোলার্ধের দক্ষিণ তথা দক্ষিণ আমেরিকা নিয়ে পাশ্চাত্যের কোন সমস্যা নেই।*

www.pathagar.com

পশ্চিমা ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতেই আমরা এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য অবগত হতে পারছি না। পশ্চিমা প্রচারসাম্রাজ্যবাদ আমাদের সে সুযোগ দিতে প্রস্তুত নয়। তাই এ বিষয়ে একটি পুস্তক রচনার জন্য দ্বীনী ভাইদের অনেকের নিকট থেকে অনুরোধ আসে। বিশেষ করে একাধিক ইসলামী প্রশিক্ষণবৈঠকে আমাকে "বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ঃ ভবিষ্যত সম্ভাবনা", "বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমান" এবং "বিশ্বের মুসলমানদের সমস্যা ও তার সমাধান" শিরোনামে বক্তব্য রাখতে হয়। এসব বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করতে হয়। অন্যদিকে শ্রোতাদের পক্ষ থেকেও বিষয়টি পুস্তক আকারে উপস্থাপনের জন্যে তাগাদা করা হয়। তাই ১৯৯২-র শেষ দিকে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ যত সহজ কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়। তাই মাসের পর মাস চলে যায় কাজে হাত দিতে পারি নি। কারণ বহুবিধ। প্রথমেই যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্রের অভাব। প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা, অস্পষ্টতা বা বিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। যেমন ঃ বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে এ জাতীয় কতগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক দেশে বিগত দেড়-দুই যুগেও জনসংখ্যা পরিসংখ্যান নেয়া হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সঠিক তথ্য গোপন করা হয়। যেমন ঃ ভারতে মুসলমানের সংখ্যা সরকারী সূত্রে বলা হয় ৮ কোটি, কোন কোন বেসরকারী সূত্র বলে ১২ কোটি, দিল্লীর শাহী জামে মসজিদের ইমাম সৈয়দ আবদুল্লাহ্ বোখারী বলেন ১৫ কোটি, আর কোন কোন মুসলিম সূত্র বলে ১৮ বা ২০ কোটি। ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ ভোটার তালিকা বিশ্লেষণ করে বলে মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ শতাব্দী শেষে ২৬ কোটিতে দাঁড়াবে। চীনের মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে এ বিভ্রান্তি আরো হতবুদ্ধিকর। সে দেশের মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে এক কোটি থেকে ১৫ কোটি পর্যন্ত দাবী করা হয়েছে।

এ বিভ্রান্তি শুধু মুসলিম সংখ্যালঘুদের ব্যাপারেই নয়, মুসলিম-প্রধান দেশের ক্ষেত্রেও বিরাজমান। ওআইসি-ভুক্ত বেশ কয়েকটি দেশের মুসলিম জনসংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে কম বলে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। তেমনি তাঞ্জানিয়া, ইথিওপিয়া ও মেসিডোনিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশকে মুসলিম-প্রধান ও খৃস্টান-প্রধান বলে দু'ধরনের দাবীই করা হয়েছে।

অনেক দেশের মোট জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যও সন্দেহের উর্ধে নয়। অনেকের ধারণা, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো জাতিসংঘ ও পাশ্চাত্যকে খুশী করার লক্ষ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সাফল্য দেখানোর নামে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কম করে দেখাচ্ছে।

এছাড়া বহু অমুসলিম-প্রধান দেশের পরিসংখ্যানেই জনসংখ্যা বা শতকরা হার ধর্মভিত্তিতে উল্লেখ থাকে না। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে আদৌ মুসলমান আছে কিনা তা-ও উল্লেখ থাকে না। অথচ বিশ্বে এমন কোন দেশ আছে বলে মনে হয় না যেখানে মুসলমান নেই।

www.pathagar.com

এসব কারণে মুসলমানদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে ইসলামী আন্দোলনসমূহ রয়েছে বা ছিল তার সঠিক ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া কঠিন।

এতসব অসম্পূর্ণতা ও অসুবিধার পরে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এসব নিয়ে গবেষণা করার জন্যে প্রয়োজনীয় সময়ের অভাব এবং কোনরূপ প্রতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে কেবল ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র সংগ্রহ ও ব্যবহারজনিত সীমাবদ্ধতা।

যা-ই হোক, প্রাপ্ত সীমিত তথ্যসূত্রের ব্যবহার ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ে সঠিক তথ্যে উপনীত হবার চেষ্টা করি। এভাবে ১৯৯৩ সালের নভেম্বরের শেষ নাগাদ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। কিন্তু যিনি এটি প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর্থিক সমস্যার কারণে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয় নি বলে তিনি বছর খানেক পরে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেন। তবে এ বিষয়ে চলমান তথ্যাবলী সংগ্রহ ও বিন্যাস অব্যাহত রাখি। বিশেষ করে বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যা নির্ণয়ের জন্যে প্রাপ্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনা অব্যাহত রাখি এবং ১৯৯৬-র শেষ নাগাদ এতদসংক্রান্ত একটা চার্ট প্রস্তুত করি। এ অসম্পূর্ণ গবেষণা অনুযায়ী ১৯৯৬-র শেষ নাগাদ বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যা প্রাক্কলিত হয় প্রায় ১৪০ কোটি। (সে হিসেবে ২০০০ সালের শেষে এ সংখ্যা মোটামুটি দেড়শ' কোটিতে দাঁড়াবার কথা।) এর ভিত্তিতে "বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা ঃ একটি সমীক্ষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি যা দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৯৮-র শেষ দিকে, প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে ২০০০ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা কত দাঁড়াবে সে সম্পর্কে প্রাক্কলন ও মূল পাণ্ডুলিপির সংশোধনের কাজে হাত দেই।

অবশেষে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে পাণ্ডুলিপির কাজ সমাপ্ত করি। এটি একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থের রূপ নেয়। কিন্তু কতক বিষয়ে আরো কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এতদসহ আরো কতক কারণে এটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দু'টি গ্রন্থের রূপদানের সিদ্ধান্ত নেই। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ এরই অন্যতম।

সব শেষে এ গ্রন্থের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

এ গ্রন্থে বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম জাতি ও জনগোষ্ঠীর বিস্তারিত পরিচয় ও ইতিহাস এবং সংশ্লিষ্ট দেশ বা ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির বর্ণনা দেয়া হয় নি। বস্তুতঃ সে উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত হয় নি। কেননা সেজন্যে একটি বিশালায়তন গ্রন্থ রচনা অপরিহার্য। (আল্লাহ্ তাআলা তওফীক দিলে ভবিষ্যতে এরূপ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বা গ্রন্থমালা রচনার আশা আছে)। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে মুসলমানদের সামগ্রিক সাধারণ অবস্থা তুলে ধরা। এ কারণে যেসব মুসলিম

www.pathagar.com

দেশে বা সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন বা পরিবর্তনপ্রয়াস অথবা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা চোখে পড়ে না সাধারণতঃ তাদের সম্পর্কিত আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া মুসলিম দেশ ও জাতি এবং মুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে তাদের পরিস্থিতির আলোকে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। (একই কারণে বিশ্বব্যাপী সক্রিয় ইসলামী আন্দোলনসমূহ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে যা ইনশা আল্লাহ্ স্বতন্ত্র গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হবে।)

তথ্যসূত্র নির্দেশের ক্ষেত্রে পাদটীকাভারাক্রান্ত অবস্থা এড়াবার লক্ষ্যে কেবল যেখানে অপরিহার্য গণ্য করেছি, বিশেষ করে যে তথ্য বিতর্কিত হতে পারে বলে ধারণা হয়েছে সেক্ষেত্রে পাদটীকায় তথ্যনির্দেশ করেছি। সাধারণতঃ সাম্প্রতিকতম ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সংবাদপত্র ও রেডিও-টিভি-র মাধ্যমে অনেকেই যেসব ঘটনা অবগত সেসব ক্ষেত্রে পাদটীকায় তথ্যসূত্র উল্লেখ অপরিহার্য মনে করি নি। তেমনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অবগত তথ্যাদি এবং ব্যাপকভিত্তিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি (যেমন ঃ বাংলাদেশ ও ইরান সংক্রান্ত অনেক তথ্য) সম্বন্ধেও সূত্র নির্দেশ করি নি। অন্যদিকে অতীতে অধ্যয়ন বা ব্যবহার করেছি অথচ পরে হারিয়ে গেছে এমন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য শুধু স্মৃতি থেকে ব্যবহার করেছি বলে তার সূত্রনির্দেশ থেকে বিরত থেকেছি।

বলা বাহুল্য যে, বক্ষ্যমাণ বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। তথাপি সাধ্যানুযায়ী সংক্ষেপে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। ছাপাখানায় দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যাদির আলোকে সংশোধনের চেষ্টা করেছি; তবে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা সত্ত্বেও এতে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, অসম্পূর্ণতা তো আছেই। আল্লাহ্ তাআলা তওফীক দিলে ভবিষ্যতে ভুল-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করার এবং গ্রন্থটিকে পূর্ণতর ও অধিকতর প্রামাণ্যরূপে উপস্থাপনের আশা রইল।

এ পুস্তকখানি মুসলমানদের পারস্পরিক জানাজানির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে উপকারী প্রমাণিত হলেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এ পুস্তককে লেখকের ও এর প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের পরকালীন মুক্তির সহায়করূপে কবুল করুন—পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের নিকট এ জন্য দোআ-প্রার্থী।

ঢাকা
১৪ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪২১
১লা ভাদ্র, ১৪০৭
১৬ই আগস্ট, ২০০০

বিনীত
**নূর হোসেন মজিদী**

www.pathagar.com

# সূচীপত্র


| *বিষয়* | *পৃষ্ঠা* |
|---|---|
| **সীমাহীন সম্ভাবনার মুসলিম জাহান** | **১৫** |
| **সমকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক চিত্র** | **১৯** |
| **গতানুগতিক ধারার গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহ** | **২১** |
| ইন্দোনেশিয়া | ২২ |
| বাংলাদেশ | ২৭ |
| পাকিস্তান | ২৯ |
| নাইজেরিয়া | ৩১ |
| তুরস্ক | ৩২ |
| মিসর | ৩৩ |
| ইরাক | ৩৪ |
| সউদী আরব | ৩৬ |
| মালয়েশিয়া | ৩৭ |
| সিরিয়া | ৩৮ |
| ইথিওপিয়া | ৩৯ |
| **বিপ্লবী দেশসমূহ** | **৪০** |
| ইরান | ৪০ |
| লেবানন | ৪২ |
| সূদান | ৪৪ |
| লিবিয়া | ৪৫ |
| **সদ্যস্বাধীন দেশসমূহ** | **৪৬** |
| ককেসাস ও মধ্য এশিয়ার ছয়টি মুসলিম দেশ | ৪৭ |
| বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | ৪৯ |
| মেসিডোনিয়া | ৪৯ |
| ইরিত্রিয়া | ৫০ |
| চেচ্‌নিয়া (ইচকেরিয়া) | ৫০ |
| আব্‌খাযিয়া | ৫৩ |
| **অন্যান্য মুসলিম দেশ** | **৫৩** |
| আফগানিস্তান | ৫৩ |
| আলজেরিয়া | ৫৪ |


www.pathagar.com

*বিষয়* *পৃষ্ঠা*
সোমালিয়া ৫৪
মরোক্কো ৫৪
ইয়েমেন ৫৪
জর্দান ৫৫
আরব আমিরাত ৫৫
কুয়েত ৫৫
ওমান ৫৬
তুর্কী সাইপ্রাস ৫৬
তাঞ্জানিয়া ৫৭
সিয়েরা লিওন ৫৮
ব্রুনাই ৫৯
আলবেনিয়া ৫৯
মালদ্বীপ ৬০
তিউনিসিয়া ৬০
নাইজার ৬০
সেনেগাল ৬১
উগান্ডা ৬১
আইভরি কোস্ট ৬১
অন্যান্য দেশ ৬২
**মুসলিম জাহানে গৃহযুদ্ধ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ** **৬৫**
পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা ৬৫
ইরানকে বিভক্ত করার মার্কিন পরিকল্পনা ৬৭
কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র ৬৮
আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ ৭৩
শাদের গৃহযুদ্ধ ৭৬
তাজিকিস্তানের গৃহযুদ্ধ ৭৭
আলজেরিয়ার জিহাদ ৮০
পশ্চিম সাহারার মুক্তিযুদ্ধ ৮২
**মুসলিম বিশ্বে ক্রুসেডারদের ক্রুর থাবা** **৮৫**
ক্রুসেডারদের 'ইসলাম ঠেকাও' অভিযান ৯১
ফিলিস্তিনে ৯৭

www.pathagar.com

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় | ১০২ |
| আযারবাইজানে | ১১৩ |
| সূদানে | ১১৮ |
| সোমালিয়ায় | ১২০ |
| বাংলাদেশে | ১২৩ |
| কসোভোতে | ১২৮ |
| ইন্দোনেশিয়ায় | ১৩২ |
| পূর্ব তাইমুর | ১৩৩ |
| ইরিয়ান জায়া | ১৩৫ |
| আচেহ্ | ১৩৫ |
| মালুকু | ১৩৬ |
| উত্তর-পূর্ব ভারতে | ১৩৬ |
| **বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘু** | **১৪১** |
| ভারত | ১৪১ |
| চীন | ১৪৪ |
| রাশিয়া | ১৪৭ |
| দাগেস্তান | ১৪৮ |
| তাতারিস্তান | ১৪৯ |
| বাশকিরিয়া | ১৫০ |
| চুভাস | ১৫১ |
| ইয়াকুতিয়া | ১৫১ |
| বার্মা | ১৫১ |
| ফিলিপাইন | ১৫২ |
| থাইল্যান্ড | ১৫৩ |
| কম্বোডিয়া | ১৫৪ |
| শ্রীলঙ্কা | ১৫৫ |
| নেপাল | ১৫৫ |
| অন্যান্য এশীয় দেশ | ১৫৬ |
| আফ্রিকা মহাদেশ | ১৫৬ |
| যুগোস্লাভিয়া | ১৫৬ |
| ইউক্রেন | ১৫৭ |
| ক্রিমিয়ার মুসলমান | ১৫৭ |


www.pathagar.com

| *বিষয়* | *পৃষ্ঠা* |
|---|---|
| বুলগেরিয়া | ১৫৮ |
| ফ্রান্স | ১৫৮ |
| বৃটেন | ১৫৯ |
| অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ | ১৫৯ |
| আমেরিকা ও কানাডা | ১৫৯ |
| মধ্য ও দক্ষিণ অমেরিকা | ১৬০ |
| অস্ট্রেলিয়া | ১৬১ |
| **মুসলিম মুক্তিযুদ্ধ** | **১৬৩** |
| কাশ্মীর | ১৬৩ |
| আরাকান | ১৬৬ |
| সিনকিয়াং | ১৭১ |
| থাইল্যান্ড | ১৭৩ |
| ফিলিপাইন | ১৭৩ |
| **বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা ঃ একটি সমীক্ষা** | **১৭৯** |
| ওআইসিভূক্ত ও মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশসমূহ | ১৮৩ |
| মুসলিম সংখ্যালঘু | ১৮৭ |
| জনসংখ্যা পরিসংখ্যানে ব্যবহৃত বিশেষ তথ্যসূত্র (ক্রমানুসারে) | ১৯৩ |
| জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ঃ বিশেষ নোট | ১৯৭ |
| **পরিশিষ্ট ঃ ১** | |
| ওআইসি-র সদস্য দেশসমূহ | ২১১ |
| **পরিশিষ্ট ঃ ২** | |
| ওআইসি-বহির্ভূত মুসলিম দেশসমূহ | ২১৩ |
| **পরিশিষ্ট ঃ ৩** | |
| ওআইসিভুক্ত ও মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশসমূহের আয়তন | ২১৪ |
| **পরিশিষ্ট ঃ ৪** | |
| অমুসলিম-প্রধান দেশসমূহের কতিপয় মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকার আয়তন | ২১৭ |
| **তথ্যসূত্র** | **২১৯** |


www.pathagar.com

# সীমাহীন সম্ভাবনার মুসলিম জাহান

বর্তমান যুগ বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণের যুগ। শুধু মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশসমূহেই নয়, বরং অমুসলিম-প্রধান দেশসমূহে বসবাসকারী মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যেও জাগরণ এসেছে। একদিকে মুসলিম-প্রধান দেশসমূহ নিজের পায়ে দাঁড়াবার ও সামনে এগিয়ে চলার চেষ্টা চালাচ্ছে, অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যালঘুরা অমুসলিম-প্রধান দেশে স্বকীয় মুসলিম পরিচিতিকে সগৌরবে তুলে ধরার এবং ইসলামের অধিকতর প্রচার-প্রসারের সংগ্রামে নিয়োজিত। অনেকগুলো বড় আকারের ও কেন্দ্রীভূত মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে।

মুসলিম জাহানের চেহারা কেমন? এর ব্যাপ্তি কতখানি? এ ব্যাপারে সকলের হয়ত ভাববার অবকাশ নেই। কিন্তু এদিকে একবার মনোযোগী দৃষ্টিপাত করলে মুসলিম জাহানের বিশালতা ও সীমাহীন সম্ভাবনা দৃষ্টে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে হয়।

বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৭ থেকে সাড়ে ২৮ ভাগ মুসলমান। অবশ্য সারা বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান প্রাপ্তি এক দুরূহ ব্যাপার। তবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে মোটামুটিভাবে যে উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় তদনুযায়ী শতাব্দীশেষে বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা ১৬৫ থেকে ১৭৩ কোটির মধ্যে দাঁড়াবে। (পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণায় এ সংখ্যা ১৭৩ কোটি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তবে কিছু বিতর্কিত সংখ্যা বিবেচনায় রেখে সতর্ক হিসাবেও ১৬৫ কোটির নীচে দাঁড়াবে না।) এর মধ্যে প্রায় একশ' বাইশ কোটিই মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশসমূহে বসবাস করছে।

মুসলিম জাহান বলতে আমরা চার ধরনের দেশকে এর মধ্যে শামিল করা সঙ্গত মনে করেছি। প্রথমতঃ ওআইসি-র সদস্য দেশসমূহ। এর মধ্যে কতক দেশর জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫০-এর নীচে। কিন্তু শাসনক্ষমতায় মুসলমানরা অধিষ্ঠিত থাকায় বা তাদের প্রভাবে এসব দেশ ওআইসি-র সদস্য হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ওআইসি-বহির্ভূত কিন্তু নিশ্চিতভাবে মুসলিম সংখ্যাগুরু এমন দেশসমূহ। এর মধ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিবিহীন অথচ কার্যতঃ স্বাধীন এমন দেশ এবং উপনিবেশ হলেও স্বতন্ত্র দেশরূপে বিবেচিত ভূখণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ নিশ্চিতভাবে মুসলিম সংখ্যাগুরু অথচ শাসনক্ষমতায় অমুসলিমরা রয়েছে এমন দেশসমূহ। চুতর্থতঃ মুসলিম দেশরূপে পরিচিত নয় অথচ নির্ভরযোগ্য সূত্রানুযায়ী যেসব দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ বা তার বেশী মুসলমান।

পূর্ব গোলার্ধের এক বিশাল এলাকা জুড়ে স্বাধীন মুসলিম বিশ্বের অবস্থান। এ এলাকাটি পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী দেশ সেনেগাল থেকে শুরু করে

www.pathagar.com

পূর্বে ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে উপনীত হয়েছে। আর দক্ষিণে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপমালার দেশ কমোরো, মালদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে উত্তরে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম মধ্য এশিয়া পর্যন্ত এ মুসলিম জাহানের ব্যাপ্তি।

অবশ্য এ বিশালায়তন মুসলিম জাহানকে ভৌগলিক অবস্থানগত দিক থেকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। এর প্রথম ভাগে রয়েছে সেনেগাল থেকে সোমালিয়া পর্যন্ত গোটা মুসলিম উত্তর আফ্রিকা এবং আরব উপদ্বীপ ও তুরস্ক থেকে শুরু করে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও মধ্য এশীয় মুসলিম দেশসমূহ। মুসলিম জাহানের ৬৯টি মুসলিম দেশের মধ্যে ৫৯টিই এ ভূখণ্ডে অবস্থিত। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে মুসলিম জাহানের তিনটি দেশ ঃ মালয়েশিয়া, ব্রুনাই এবং হাজার হাজার দ্বীপের দেশ ইন্দোনেশিয়া। তৃতীয় অংশে রয়েছে এ দু'য়ের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত বিচ্ছিন্ন দেশ বাংলাদেশ এবং ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপমালার দেশ মালদ্বীপ। আর চতুর্থ অংশে রয়েছে ইউরোপীয় তিনটি মুসলিম দেশ ঃ আলবেনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও মেসিডোনিয়া।

স্বাধীন মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, ঘানা, মালাভী, তাঞ্জানিয়া, তোগো, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, আইভরি কোস্ট, মোযাম্বিক, আলবেনিয়া ও মেসিডোনিয়া বাদে বাকী ৫২টি দেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র সদস্য। এছাড়া স্বাধীন দেশ না হলও ফিলিস্তিনকেও ওআইসি-র সদস্য করা হয়েছে। এর বাইরে মরোক্কোর দখলাধীন পশ্চিম সাহারা (এসএডিআর) বহু বছর পূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। কিন্তু আফ্রিকার বাইরে তার তেমন স্বীকৃতি নেই। আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু এশিয়ায় সম্ভবতঃ একমাত্র ইরান এসএডিআর-কে স্বীকৃতি দিয়েছে। কার্যতঃ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও চেচনিয়া, আবখাযিয়া এবং সাইপ্রাসের স্বাধীনতার ঘোষণাও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় নি। নিরঙ্কুশ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত মায়োত্ দ্বীপ ফরাসী শাসনাধীন। যা-ই হোক, এ ক'টি দেশ এবং ফিলিস্তিনকে হিসেবে আনলে বর্তমানে বিশ্বে মুসলিম দেশের সংখ্যা ৬৯টি।

স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র না হলেও মুসলিম জাহানের ভূখণ্ড সংলগ্ন কয়েকটি অমুসলিম-প্রধান দেশের মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলের অবস্থান এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। এসব অঞ্চলকে বিবেচনায় আনলে মুসলিম জাহানের আয়তন বিশালতর প্রতিভাত হবে।

বর্তমান ক্ষুদ্রতর যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্গত কসোভো প্রদেশ একটি নিরঙ্কুশ মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা। আলবেনিয়া-সংলগ্ন কসোভোর জনসাধারণ আলবেনীয় বংশোদ্ভুত মুসলমান; তারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে।

ভারতের দখলাধীন কাশ্মীর সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে। পাকিস্তান-ভূখণ্ড সংলগ্ন কাশ্মীরের মুসলিম জনগণ পাকিস্তানভুক্ত হওয়া বা স্বাধীন দেশ গড়ার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ

www.pathagar.com

অব্যাহত রেখেছে। এরই কাছাকাছি রয়েছে চীনের সিনকিয়াং (বর্তমান নাম জিংজিয়াং) প্রদেশ। এটি চীনের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ। এ বিশাল প্রদেশটি এক সময় স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল ; বর্তমানে এর অভ্যন্তর থেকে স্বাধীনতার দাবী উত্থিত হয়েছে।

চেচনিয়ার মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিনই বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শিরোনাম হত। শুধু চেচনিয়া নয়, রুশ ফেডারেশনের মধ্যে আরো অনেকগুলো জাতিগত মুসলিম প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চল রয়েছে। এর মধ্যে আযারবাইজান-সংলগ্ন দাগেস্তানের পাশেই রয়েছে, ইঙ্গুশ্‌তিয়া, কাবারদিনো বেলকারিয়া, কারাচাই বেলকার ও উত্তর ওসেতিয়া। এরই পাশে রয়েছে জর্জিয়ার মুসলিম-প্রধান অঞ্চল দক্ষিণ ওসেতিয়া ও আযারিস্তান। রাশিয়ার অভ্যন্তরে (যদিও মুসলিম জাহানের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন) অবস্থিত মুসলিম জাতিগত প্রজাতন্ত্র তাতারিস্তান, বাশকিরিয়া, চুভাস্ ও ইয়াকুতিয়া বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

বাংলাদেশ-সংলগ্ন বার্মার আরাকান প্রদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা। সেখানকার মুসলমানরা বিগত অর্ধ শতাব্দীকাল যাবত মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে আসছে। থাইল্যান্ডের দক্ষিণাংশের পাঁচটি প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক। সেখানে এক সময় স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল। বর্তমানে সেখানে পাত্তানী নামে মুসলিম রাষ্ট্র গড়ার সংগ্রাম চলছে।

দক্ষিণ ফিলিপাইন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম অঞ্চল। দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধের পর সেখানে বর্তমানে সমঝোতার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই হচ্ছে বর্তমান মুসলিম জাহানের ব্যাপ্তি। কিন্তু মুসলিম জাহান শুধু বিশাল ব্যাপ্তিরই অধিকারী নয়, বরং এর যেমন রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অতীত, তেমনি রয়েছে সীমাহীন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলিম জাহানের সম্ভাবনা এতই বেশী যে, তা অন্যদের জন্য ঈর্ষার কারণ বটে।

মুসলিম জাহানে রয়েছে অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ। এখানে রয়েছে তেল, গ্যাস, কয়লা, তামা, লোহা এবং আরো অনেক খনিজ সম্পদের বিরাট মওজুদ। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর পাশ্চাত্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। এছাড়া মুসলিম জাহানে রয়েছে প্রচুর বনভূমি, উর্বর কৃষিভূমি, সবুজ পাহাড়, মূল্যবান প্রস্তর সম্বলিত খনি ও পাহাড়-পর্বত, নাব্য ও মৎস্যসমৃদ্ধ অসংখ্য নদীনালা। রয়েছে সুদীর্ঘ সমুদ্র-উপকুল ও মৎস্যসমৃদ্ধ উপকূলীয় পানি।

সমুদ্র-উপকূলের বাণিজ্যিক ও সামরিক গুরুত্ব ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। মুসলিম জাহান যে পরিমাণ সমুদ্র-উপকূলের অধিকারী তা অন্যদের জন্যে ঈর্ষার কারণ হয়ে রয়েছে। সেনেগাল থেকে মিসর হয়ে সোমালিয়া পর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগর, ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর ও ওমান সাগর হয়ে ভারত মহাসাগরের বিশাল উপকূল মুসলিম

www.pathagar.com

জাহানের এখতিয়ারে। তুরস্কের উত্তর-পূর্ব অংশ থেকে শুরু করে কৃষ্ণ সাগর, ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর, ওমান সাগর (বা আরব সাগর), ও পারস্য উপসাগর হয়ে আরব সাগরের তীরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত আরেকটি বিশাল উপকূল মুসলিম জাহানের হাতে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই নিয়ে যে এলাকা তার প্রায় চারদিকেই রয়েছে সমুদ্র। মালদ্বীপ ও কমোরো সমুদ্রবক্ষে অবস্থিত। বাংলাদেশের রয়েছে বিরাট সমুদ্র-উপকূল। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-অর্ধেক মুসলিম উপকূল। এমন কি ইউরোপের ছোট দেশ আলবেনিয়া ও মেসিডোনিয়ার রয়েছে বিরাট উপকূলীয় এলাকা। বসনিয়া-হার্জেগোভিনাও উপকূল থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত নয়।

এ বিশাল সমুদ্র-উপকূল এমনই কৌশলগত গুরুত্বের অধিকারী যে, মুসলিম জাহানের অন্য কোন সম্পদ না থাকলে শুধু এই সমুদ্র-উপকূলের কৌশলগত গুরুত্বের সদ্ব্যবহার করেই মুসলিম জাহানের পক্ষে বিরাট শক্তিরূপে গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল।

মুসলিম জাহানের এত সব সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্যে কোন যথাযথ উদ্যোগ নেই। এর যথাযথ মূল্যায়নও হচ্ছে না। ইসলামী চেতনা ও ভাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এসব সম্পদ ও সম্ভাবনার যথাযথ মূল্যায়ন ও সদ্ব্যবহার অপরিহার্য।

www.pathagar.com

# সমকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক চিত্র

মুসলিম উম্মাহ্ ১৬৫ কোটি থেকে ১৭৩ কোটি সদস্য নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে জনসংখ্যার বিচারে চারটি বড় দেশের প্রতিটির মোট জনসংখ্যা দশ কোটির ওপরে এবং আরো চারটি দেশ মাঝারি আকারের জনসংখ্যার অধিকারী যার প্রতিটির মোট জনসংখ্যা পাঁচ কোটির ওপরে ও দশ কোটির নীচে। বাকী দেশগুলোর মধ্যে ১১টি দেশের প্রতিটির জনসংখ্যা দুই কোটির ওপরে ও পাঁচ কোটির নীচে এবং আরো ১১টি দেশের প্রতিটির জনসংখ্যা এক কোটির ওপরে ও দুই কোটির নীচে। বেশ ক'টি দেশ জনসংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্র হলেও প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে মুসলিম দেশসমূহের সরকারগুলোর তেমন কোন গুরুত্ব বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। এ ব্যাপারে বড় দেশগুলোর ভূমিকাই সর্বাধিক হতাশাব্যঞ্জক। আর এর মূল মুসলিম উম্মাহ্র ইতিহাসের দূর অতীতের গর্ভে নিহিত রয়েছে।

চাপের মুখে হযরত ইমাম হাসানের (রাঃ) ক্ষমতাত্যাগ ও ইসলামী খেলাফতের বিলুপ্তি এবং তদস্থলে রাজতন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে মুসলিম জাহানে ইসলামী শক্তি ও মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অসহযোগিতার সূচনা। ইসলামী শক্তি তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির সাথে কখনো প্রত্যক্ষ সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে, কখনো পরিস্থিতি বিবেচনায় নীরবতা অবলম্বন করেছে, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে মুসলিম উম্মাহ্র অস্তিত্বের স্বার্থে সাময়িকভাবে হলেও রাষ্ট্রশক্তিকে সহায়তা দিয়েছে। কিন্তু নীতিগতভাবে এ দুই শক্তির মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা অব্যাহত থেকে যায়। এক্ষেত্রে মুসলিম জনগণ সব সময় ইসলামী শক্তির সাথেই ছিল। কিন্তু অস্ত্রধারী রাজতান্ত্রিক শাসকদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারার মত পরিস্থিতির খুব কমই উদ্ভব হয়েছে। তবে মোদ্দা কথা, তথাকথিত মুসলিম রাজশক্তির সাথে মুসলিম জনগণের কোন সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য কখনো কখনো মুসলিম উম্মাহ্র স্বার্থ বিবেচনায় বিপ্লবী ওলামায়ে কেরামের ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলিম জনগণ রাষ্ট্রশক্তির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যখনই বিপদ কেটে গেছে তখনি রাষ্ট্রশক্তি জনগণকে পূর্ববৎ গোলামে পরিণত করেছে।

মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির এই গণবিচ্ছিন্নতার কারণে রাজশক্তির ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জনগণের কোন ভূমিকা থাকত না। জনগণের ভূমিকা থাকাটা রাজশক্তি পছন্দও করত না। ফলে এক সময় দেখা গেল, মুসলিম রাজশক্তিসমূহের ক্ষমতার লড়াই-এ ইউরোপ থেকে ব্যবসায়ীর ছদ্মাবরণে আগত ক্রুসেডার-শক্তি পরোক্ষ অংশগ্রহণ করছে। তারা ক্ষমতার লড়াই-এ না গিয়ে বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে কাউকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তারাই এ বিবাদের সৃষ্টি করছে। এভাবে ধাপে ধাপে সমগ্র মুসলিম জাহান

www.pathagar.com

খৃস্টান উপনিবেশবাদী শক্তির করতলগত হয়ে গেল। কিন্তু তারা শুধু ক্ষমতা দখল করেই ক্ষান্ত থাকল না, বরং তাদের শাসনকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে বিজিতদের ওপরে সাংস্কৃতিক গোলামী চাপিয়ে দিল।

একদিকে খৃস্টান মিশনারীরা খৃস্টধর্মের প্রচার করতে লাগল, অন্যদিকে রাষ্ট্রশক্তি পরিকল্পিতভাবে মুসলিম জনগণের ওপর পশ্চিমা শিক্ষা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দিল। শুধু তা-ই নয়, তারা রাজনৈতিক দল গঠনের ন্যায় সমাজ ও জাতিকে ছিন্নভিন্নকারী রাজনৈতিক ব্যাধিরও পরিকল্পিত বিস্তার ঘটাল। এরপর কালের প্রবাহে এক সময় ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ শাসনের অবসানের পালা এল। তারা বিদায় নিল। কিন্তু বিদায় নেয়ার সময় সত্যিকারের মুসলিম শক্তিকে নয়, বরং তাদেরই মানসপুত্রদের ক্ষমতায় বসিয়ে গেল যারা নামে মুসলমান হলেও মনে-মগজে, চিন্তা-চেতনায়, চরিত্রে-আচরণে ছিল পশ্চিমাদেরই প্রতিভূ। ফলে স্বাধীন দেশের পতাকা উড়লেও কার্যতঃ পশ্চিমা শাসন অব্যাহত থাকে। বিশ্বরাজনীতিতে মুসলিম দেশসমূহের যথাযথ গুরুত্ব না থাকার এটাই বড় কারণ।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহে বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। অনেকগুলো দেশে অতীতের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে নামসর্বস্ব পার্লামেন্ট ও নির্বাচন থাকলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও আমীরতন্ত্র বিদ্যমান। এসব শাসকদের বেশীর ভাগই অযোগ্য এবং বহির্শক্তির সেবাদাস। তাই ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ্ ও নিজ জাতির কল্যাণ ও স্বার্থ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। কতক দেশে সামরিক বা একদলীয় স্বৈরশাসকের শাসন বিদ্যমান, যদিও দু'একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রকৃত দেশপ্রেমিক সামরিক শাসক ছিলেন বা রয়েছেন। কতক স্বৈরশাসক নির্যাতনের স্টীম রোলারের ওপর নির্ভর করে ক্ষমতায় টিকে আছে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিশিষ্ট দেশগুলোর অবস্থা সর্বাধিক মর্মান্তিক। এসব দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ ও নেতানেত্রীগণ (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) অযোগ্য, বহির্শক্তির তাবেদার, দুর্নীতিপরায়ণ ও সন্ত্রাসী বাহিনী লালনকারী।

পশ্চিমা বস্তুবাদী সমাজ থেকে উদ্ভূত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মুসলিম সমাজে কোন সুফল দিতে পারে নি। পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র আক্ষরিক অর্থেই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বিধায় সেখানে পুঁজিবাদী শ্রেণী রাজনৈতিক দলগুলোকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের পারস্পরিক বিরোধিতাকে একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব জাতীয় স্বার্থ ও ঐক্যের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয় নি।

www.pathagar.com

কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে গণতন্ত্র শুধু কুফলই প্রদান করছে। রাজনৈতিক দলগুলোর সীমাহীন পারস্পরিক দুশমনী এবং বিরোধী দলসমূহের ওপর সরকারের দমননীতি এক একটি জাতিকে বহুধাবিভক্ত পারস্পরিক শত্রুতে পরিণত করে জাতীয় স্বার্থ ও ঐক্যের অনুভূতিকে সমাধিস্থ করেছে। অন্যদিকে স্বয়ং ব্যবসায়িক শ্রেণীও দুর্নীতি, বিজাতীয় তাবেদারী এবং প্রশাসনের ও ক্ষমতাসীন সরকারের অন্যায় সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পদের মালিক হওয়ায় এসব দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন ধরনের এবং এই পুঁজিপতিরা পারস্পরিক অনৈক্য ও সংকীর্ণ দলীয় অনুভূতির শিকার। ফলে তাদের পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোকে পাশ্চাত্যের মত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

তাছাড়া এসব দেশের নেতাদের বেশীর ভাগই পেশীশক্তি, বক্তৃতা, অর্থ ও সন্ত্রাসী লালনের মাধ্যমে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং এ কারণে জাতীয় জীবনের সমস্যাবলী সমাধানের যোগ্যতা তাঁদের থাকে না। ফলে ক্ষমতায় গেলে তাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ আমলা শ্রেণী এবং বহির্শক্তির দালাল তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ও বৈদেশিক উপদেষ্টাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। রাজনীতিকদের দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও ব্যর্থতাজাত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে অথবা ক্ষমতালিপ্সা বা বৈদেশিক প্রভাবে অনেক সময় সামরিক নেতাগণ গণতন্ত্রকে বাতিল বা স্থগিত করে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু বাস্তবতার সাথে পরিচিতি ও জনগণের সাথে সম্পর্কের অভাবে তাঁরা প্রায়শঃই ব্যর্থ হন।

এরই পাশাপাশি কদাচিত কোথাও যোগ্য বা স্বাধীনচেতা শাসকগোষ্ঠীও দেখা যায় এবং জাতীয় ঐক্যের জন্যে হুমকি নয় এমন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দু'একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা চোখে পড়ে।

এবার আমরা গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশগুলোর পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করব।[১] আমরা গুরুত্বপূর্ণ অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে দেশগুলোকে বিন্যস্ত করে আলোচনা করব। গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে প্রথমে গতানুগতিক ধারার দেশসমূহ সম্পর্কে ও পরে বিপ্লবী দেশসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব। এরপর অন্যান্য দেশের দিকে দৃষ্টি দেব।

## গতানুগতিক ধারার গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহ

মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়া জনসংখ্যার বিচারে বড় দেশ এবং ইরান, ইথিওপিয়া, তুরস্ক ও মিসর জনসংখ্যার বিচারে মাঝারি আকারের দেশ। এ দেশগুলোর মধ্যে ইরান হচ্ছে বিপ্লবী

www.pathagar.com

দেশ। এছাড়া মক্কা-মদীনার কারণে সাউদী আরব, সামরিক শক্তির কারণে ইরাক ও সিরিয়া এবং অর্থনৈতিক কারণে মালয়েশিয়া গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিগণিত যদিও এ দেশ ক'টির প্রতিটির জনসংখ্যা পাঁচ কোটির অনেক নীচে।

## ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। সাড়ে সতের হাজার দ্বীপ[২] নিয়ে গঠিত এ দেশটি। ইউরোপের বহু ধনী দেশ যেখানে সমুদ্রে নামার পথ না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত সেখানে ইন্দোনেশিয়ার চতুর্দিকেই সমুদ্র থাকা সত্ত্বেও দেশটি তা থেকে যথেষ্ট কল্যাণ হাসিল করতে পারছে না। তেলসম্পদের পাশাপাশি আরো বহু প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এ দেশ। কিন্তু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না থাকায় দেশটির অস্তিত্বের কথা বিশ্ববাসী প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কেবল সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গোলযোগ ও অর্থনৈতিক ধ্বস এবং এর পর রাজনৈতিক পরিবর্তন ইন্দোনেশিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচকিত করে তোলে।

জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ও মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম এ দেশটির যেখানে মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব গ্রহণ করা, নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো-ক্ষমতার দাবীদার হওয়া এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে নেতৃত্বের লড়াইয়ে নামা উচিত ছিল সেখানে পশ্চিমাদের মানসপুত্রদের নেতৃত্বের কারণে বিশ্বের বুকে দেশটির কোন মর্যাদা নেই। ক্ষুদ্র দেশ লেবানন বা লিবিয়ার নামোচ্চারণে বিশ্ববাসী যতটুকু সচকিত হয় ইন্দোনেশিয়ার নামোচ্চারণে তার শতকরা এক ভাগও প্রতিক্রিয়া ঘটে না। ইন্দোনেশিয়ায় কি ঘটেছে তা জানতেও ইতিপূর্বে কারো আগ্রহ হত না; কেবল সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাই দেশটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে।

ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে চীনা বংশোদ্ভুতদের[৩] একাধিপত্য, সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগণের দারিদ্র্য, সুদীর্ঘকাল যাবত রাজনীতিতে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ, পাশ্চাত্যের প্রভাব, খৃস্টান মিশনারীদের ব্যাপক তৎপরতা ইত্যাদি দেশটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়া ১৯৪৫ সালে স্বাধীন হয়। তখন থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দেশটির প্রতিষ্ঠাতা সুকর্নো দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন চীনা বংশোদ্ভুতদের ও কম্যুনিস্টদের হাতের পুতুল। ১৯৬৫ সালে কম্যুনিস্টরা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটালে জেনারেল সুহার্তোর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী তা দমন করে। এরপর কার্যতঃ তিনিই দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হন। ১৯৬৭ সালে সুহার্তো সুকর্নোকে সরিয়ে দিয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৯৮ সালের মে মাসে পদত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২ বছর তিনি দেশটির শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর দ্বারা সংশোধিত ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানই তাঁকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে সহায়তা করে।

সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বিশ্বের অন্য কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে তার কোন মিল ছিল না। এ ব্যবস্থায় ভাল-মন্দ দু'ধরনের বৈশিষ্ট্যই ছিল। সুহার্তোর পতনের পর এর আংশিক সংশোধন করা হয়েছে।

ইন্দোনেশীয় ব্যবস্থায় সংসদে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য আসন সংরক্ষিত আছে এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারতেন। সুহার্তো ক্ষমতায় আসার পর সকল রাজনৈতিক দলকে ভেঙ্গে তিনটি দলে সীমিত হবার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা তৈরি করেন যা বাধ্যতামুলক গ্রুপিং হিসেবে পরিচিত হয়। ফলে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকার-সমর্থকদের নিয়ে গোলকার দল গঠিত হয়। জাতীয়তাবাদী ও খৃস্টানরা ইন্দোনেশীয় গণতান্ত্রিক দল (পি.ডি.আই.)-তে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ইসলামপন্থীরা সংযুক্ত উন্নয়ন দল (পি.পি.পি.) গঠন করে। ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষের (গণপ্রতিনিধি পরিষদের) ৫০০ সদস্যের মধ্যে ১০০ জন থাকতেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি এবং ৪০০ জন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। প্রাপ্ত মোট ভোটসংখ্যার ভিত্তিতে দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টিত হত যা এখনো প্রচলিত রয়েছে। পরে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব হ্রাস করে প্রথমে ৭৫ জন ও সুহার্তোর পতনের পরে ৩৮ জন করা হয় এবং জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রথমে ৪২৫ জন ও পরে ৪৬২ জন করা হয়।

সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ তিন দলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। দলীয় নেতার নির্বাচনও সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। অবশ্য তিনটি দলকে অনেকটা একই দলের তিনটি উপদলের ন্যায় গণ্য করা হত; জাতীয় ঐক্য সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যবস্থা রাখা হয়।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষমতা পূর্বাপর গণপরিষদের হাতে রয়েছে ইতিপূর্বে যার এক হাজার সদস্যের মধ্যে পাঁচশ' জন ছিলেন গণপ্রতিনিধি পরিষদের সদস্য এবং বাকী পাঁচশ' জন থাকতেন বিভিন্ন প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি। ইতিপূর্বে শেষোক্ত পাঁচশ' জনের নির্বাচন ছিল পুরোপুরি প্রশাসনের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Majority Countries & Regions.

ıslim Majority Countries & Regions.

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হলে জনপ্রতিনিধিগণ সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরোধিতা করলেও কমপক্ষে ৬০০ বা ৫৭৫ ভোট পেয়ে তাঁর নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত ছিল। তাই ক্ষমতাসীন প্রার্থীর বিরুদ্ধে অন্য কারো প্রার্থিতা হত একটি অর্থহীন কাজ। এ কারণেই সুহার্তো প্রতিবারই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

ইন্দোনেশিয়ার বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও এক ব্যক্তির দীর্ঘ শাসনের স্থিতিশীলতা ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে এবং দেশটি উদীয়মান ব্যঘ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু সুহার্তো-পরিবারের দুর্নীতি এবং দেশের সম্পদের শতকরা নব্বই ভাগই সুহার্তো-পরিবার ও চীনা বংশোদ্ভূতদের কুক্ষিগত থাকায়[৪] দেশের 'উন্নয়ন' সাধারণ জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় নি। ১৩ হাজার ৮০০ কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়া ইন্দোনেশিয়ার পাঁচ কোটি মানুষ অর্থাত দেশের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবনযাপন করে।[৫] অন্যদিকে সুহার্তোর পরিবার এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনরা ২৭টি টিম্বার কোম্পানী ও ৮টি বনশিল্প এস্টেটের মাধ্যমে ২৭ হাজার ৫৬৭ বর্গমাইল (৭০ লাখ হেক্টর) বনাঞ্চলের মালিক।[৬] এ হচ্ছে সুহার্তোর দুর্নীতির অংশবিশেষ মাত্র।

এই ভারসাম্যহীনতা থেকে হঠাৎ করে ১৯৯৭-এর মাঝামাঝি হতে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে ধ্বস শুরু হয়। মুদ্রামানের দ্রুত পতনের ফলে দ্রব্যমুল্য গগনচুম্বী রূপ ধারণ করে ও এর প্রতিক্রিয়ায় গণবিক্ষোভ শুরু হয়। সুহার্তো সেনাবাহিনীর সহায়তায় বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করেন। এ অবস্থায়ও জনগণের প্রকাশ্য বিরোধিতা উপেক্ষা করে ১৯৯৮-এর মার্চে তিনি সপ্তম বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু গণবিক্ষোভের মুখে পরবর্তী মে মাসের ২১ তারিখে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন। ভাইস প্রেসিডেন্ট বি জে হাবীবী সংবিধান অনুযায়ী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সুহার্তো-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে ইসলামী সংগঠন মোহাম্মাদিয়া-র নেতা আমীন রইস ও তাঁর সমর্থকগণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বি জে হাবীবী ৭ই জুন ১৯৯৯ তারিখে পার্লামেন্ট নির্বাচন দেন। এ নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং বাধ্যতামূলক গ্রুপিং তুলে দেয়া হয়। ফলে রাতারাতি অনেকগুলো দল আত্মপ্রকাশ করে এবং এ নির্বাচনে ৪৮টি দল অংশগ্রহণ করে। এতে সুকর্নো-তনয়া মেঘবতীর নেতৃত্বাধীন পিডিআই-স্ট্রাগ্‌ল্ শতকরা ৩৩.৭৪ ভাগ ভোট পেয়ে বৃহত্তম দলরূপে আবির্ভূত হয়। ক্ষমতাসীন গোলকার পার্টি ২২.৪৪ ভাগ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পিপিপি থেকে বেরিয়ে আসা আবদুর রহমান ওয়াহিদের নেতৃত্বাধীন ওলামা সংগঠন 'নাহ্‌দাতুল উলামা'র রাজনৈতিক প্লাটফর্ম ন্যাশনাল এ্যাওয়াকেনিং পার্টি (পিকেবি) ১২.৬১ ভাগ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পিপিপি থেকে বেরিয়ে আসা অপর নেতা আমীন রইসের নেতৃত্বাধীন 'মোহাম্মাদিয়া'র রাজনৈতিক প্লাটফর্ম ন্যাশনাল

www.pathagar.com

ম্যান্ডেট পার্টি পায় শতকরা ৭ দশমিক ১২ ভাগ ভোট। পিপিপির অবশিষ্টাংশ পায় ১০ দশমিক ৭ ভাগ ভোট।

এ নির্বাচনেও আগের নিয়মেই জাতীয় ভিত্তিতে প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা অনুপাতে দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টিত হয়। এরপর ১৯৯৯-র নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য এবারে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিসংখ্যা ছিল ২০০ জন এবং নির্বাচকমণ্ডলীর মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৭০০ জন।

এ নির্বাচনে আবদুর রহমান ওয়াহিদ প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন ও মেঘবর্তী হেরে যান। তবে প্রেসিডেন্টের সমর্থন পাওয়ায় তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেন।

(ইন্দোনেশিয়ায় ক্রুসেডারদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে।)

## বাংলাদেশ

বাংলাদেশ—আমাদের নিজেদের দেশ— জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশের মানুষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে যুগে যুগে। তারা রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে এবং রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া ১৯৫২ থেকে শুরু করে ১৯৯০ পর্যন্ত বিভিন্ন গণসংগ্রামে অংশ নিয়ে তারা সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু এখানেও মূল সমস্যা হচ্ছে উপনিবেশবাদী ইংরেজদের রেখে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ফলে সীমাহীন প্রাকৃতিক সম্পদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে এ দেশ বৈদেশিক ঋণের ভারে জর্জরিত। অনুদানের নামে ভিক্ষা সংগ্রহের জন্যে ছুটাছুটি করতে আমাদের লজ্জা নেই; সাহায্যের নামে যে কোন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতেও দ্বিধা নেই। ভারত ও আমেরিকার রাজনৈতিক প্রভাব এবং অর্থনেতিক নীতি নির্ধারণে ভারত, আমেরিকা ও বিশ্বব্যাঙ্কের প্রশ্নাতীত প্রভাব এ দেশের নির্মম বাস্তবতা। এদেশের অতীত-বর্তমান সকল সরকারই বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর বাজেট প্রণয়ন ও অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে জাতির আত্মসম্মান বিকিয়ে দিয়েছে।

আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বে চরম দেউলিয়াত্ব বিরাজমান। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা নয়, বরং পিতা বা স্বামীর উত্তরাধিকারিত্ব এবং সাবেক সামরিক অফিসারদের উচ্চাসন থেকেই সুস্পষ্ট যে, নেতৃত্বের সংকট এখানে কতখানি মারাত্মক। বলা বাহুল্য যে, নারী বা সাবেক সামরিক অফিসারদের শীর্ষনেতৃত্ব তাঁদের অপরাধ নয়, বরং তা ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা বা শূন্যতাকেই প্রকটভাবে তুলে ধরছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শবোধ, সৌজন্য ও দেশাত্মবোধ প্রায় অনুপস্থিত। রাজনীতিতে দলসমূহের সন্ত্রাসী লালন এবং সরকারের বিরোধী দল দমন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। নির্বাচনব্যবস্থা গোয়েবল্‌সীয় প্রচারণা, প্রতিপক্ষের চরিত্রহনন, অবৈধ অর্থ, সন্ত্রাস ও প্রশাসনিক আনুকূল্যের নিয়ন্ত্রণে। নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় জড়িতদের নিরপেক্ষতা বিদায় নিয়েছে।

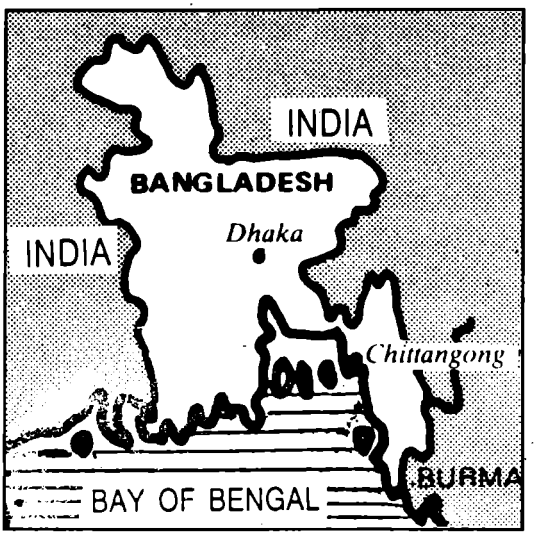


স্বাধীনতার ঊনত্রিশ বছর পরেও জাতীয় আদর্শের বিষয়টি অস্পষ্ট রাখা হয়েছে এবং সংখ্যাগুরু (শতকরা ৮৮ ভাগ) জনগণের আদর্শকে রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে গ্রহণের পরিবর্তে রাজনৈতিক ময়দান থেকে বিদায় দেয়ার জন্যেও আওয়াজ তোলা হচ্ছে। সেই সাথে রাজনৈতিক স্বার্থে জাতিকে রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধা নামে বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে। অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলো ইতিমধ্যেই জাতিকে বহুধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং পরস্পরকে অপরিহার্যভাবে নিশ্চিহ্ন করার উপযোগী শত্রুরূপে গণ্য করছে।

দেশের রাজনৈতিক দলগুলো পাশ্চাত্য থেকে প্রাপ্ত গণতন্ত্রের মোহে বিভোর। কিন্তু গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাদের ধারণা খুবই একপেশে। ফলে দেশের সংবিধানে যে গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা থেকে দেশকে মুক্ত করার চিন্তা কেউই করছে না। দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপ্রধানের পদকে সম্পূর্ণ নামসর্বস্ব করা হয়েছে এবং প্রাথমিক বিচারব্যবস্থা ও আইন বিভাগের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণসহ সর্বময় ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জনগণ 'জনপ্রতিনিধি'দের হাতে এবং সংসদসদস্যগণ দলনেতাদের হাতে বন্দী। প্রচলিত নির্বাচনব্যবস্থায় নির্বাচিত হবার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই শতকরা ২৫/৩০ ভাগ ভোট পাওয়াই যথেষ্ট।

বাংলাদেশে বর্তমানে ক্ষমতার লড়াই, প্রতিহিংসার রাজনীতি ও সরকারী দমননীতি নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে জাতির আশু মুক্তির কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এহেন একটি দেশ মুসলিম উম্মাহ্‌কে নেতৃত্ব দেবে বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ আসনের অধিকারী হবে এমনটি আশা করা যায় না।

www.pathagar.com

# পাকিস্তান

জনসংখ্যার বিচারে পাকিস্তান হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইন্দোনেশিয়া বা বাংলাদেশের তুলনায় পাকিস্তানকে কিছুটা বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশেষ করে পাকিস্তান ভারতকে চ্যালেঞ্জ করে চলেছে এবং তার হাতে ভারতেরই ন্যায় পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে যা মুসলিম জাহানে পাকিস্তানের প্রতি আশাবাদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়।

একটি জাতি হিসেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংহতির বড়ই অভাব। সেখানে পাঞ্জাবীদের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে সিন্ধী, বেলুচ ও পাঠানদের মধ্যে বঞ্চনা, পাঞ্জাবী-বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতার মনোভাব রয়েছে। তেমনি মুহাজিররা নিজেদেরকে স্থানীয় লোকদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত করেছে এবং করাচীসহ সিন্ধুর বিভিন্ন এলাকায় মুহাজিরভীতি চরমে। সেখানে প্রায়ই মুহাজির ও স্থানীয় লোকদের মধ্যে দাঙ্গা-সংঘর্ষ হয়ে থাকে।

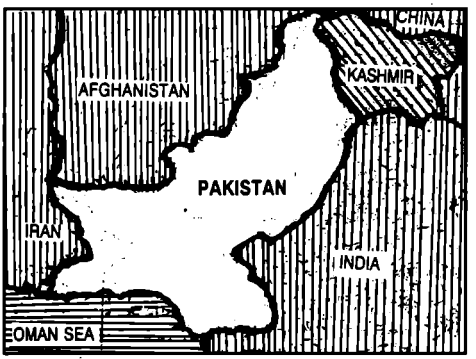


এছাড়া পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নী মাযহাবী সম্পর্ক খুবই খারাপ। উভয় পক্ষই পরস্পর সম্বন্ধে চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। পারস্পরিক হামলা এবং হত্যা পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। বিশেষ করে সিপাহে সাহাবাহ্ নামে চরমপন্থী ওহাবী সংগঠন কর্তৃক শিয়াদেরকে কাফের ফতোয়া দেয়া থেকেই এসব সংঘর্ষ ঘটছে।

জাতিগতভাবে বহুধাবিভক্ত একটি দেশ হিসেবে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে সব সময়ই সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ কারণে পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা খুবই শক্তিশালী। অবশ্য অতীতে সেনানায়করা তাঁদের পদমর্যাদার অপব্যবহার করেছেন বলে সমালোচনা করা হয়। কারণ তাঁরা শুধু রাজনীতিতে হস্তক্ষেপই করেন নি, বরং সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। দেশটি স্বাধীন হবার পর বিগত অর্ধ শতাব্দীকালের অর্ধেকই সামরিক শাসনের অধীনে কাটিয়েছে। কিন্তু এজন্য রাজনৈতিক দলসমূহ ও নেতৃবৃন্দের কোন্দল ও ষড়যন্ত্রই দায়ী ছিল।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে আধা-পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় যাতে প্রেসিডেন্টের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখত এবং ক্ষমতাসীন সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করত। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে দুই প্রধান রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ও পিপল্‌স্ পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালে শতকরা একশ' ভাগ ক্ষমতাভোগের মানসিকতা থেকে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।

অবশেষে বিগত নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর মুসলিম লীগ সরকার সংবিধান সংশোধন করার মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফ বিচারবিভাগকেও নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন এবং সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকাকেও সঙ্কুচিত করে ফেলেন। এভাবে সেখানে গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেখানকার বিরোধী দলগুলো অনুতপ্ত হয়। কারণ প্রথমে তারাই প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা খর্ব করার দাবী তুলেছিল। অতঃপর ১৯৯৯-র ১২ই অক্টোবর নওয়ায শরীফ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল পারভেয মোশাররফকে অপসারণ করলে সেনাবাহিনী নওয়ায শরীফকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল মোশাররফকে ক্ষমতায় বসায়।

পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। তার সামরিক বাহিনীও শক্তিশালী। পারমাণবিক বোমা তৈরী বিশ্বের মুসলমানদের নিকট পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। এছাড়া ইরানের সাথে সুসম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (একো)-এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন পাকিস্তানের অর্থনীতির জন্যে খুবই উপকারী প্রমাণিত হয়। সোভিয়েত দখলের বিরুদ্ধে আফগান জনগণকে সাহায্যকরণ, ভারতের সাথে প্রধানতঃ কাশ্মীর প্রশ্নে দ্বন্দ্ব এবং পারমাণবিক অস্ত্র প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মনোমালিন্যও মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকট পাকিস্তানের প্রিয় হওয়ার অন্যতম কারণ। তা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ্‌কে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা পাকিস্তান প্রদর্শন করতে পারে নি। অধিকন্তু সাম্প্রতিককালে পকিস্তান এক কঠিন অবস্থায় নিপতিত হয়েছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তা পাকিস্তানের অর্থনীতির জন্যে বিরাট ক্ষতি ডেকে এনেছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ, পাখতুনদের নিয়ে তালেবান বাহিনী গঠন ও গৃহযুদ্ধে তাকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতাদান এবং মাযারে শরীফে তালেবান কর্তৃক ইরানী কুটনীতিকদের হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধে ব্যর্থতা ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ককে শীতল করে ফেলে এবং পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির জন্যও ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এজন্য মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছেও পাকিস্তান সমালোচিত হয়েছিল।

অন্যদিকে জেনারেল জিয়াউল হকের সময় থেকে শরীআত সম্পর্কে অজ্ঞ সরকারী নেতাদের উদ্যোগে শরীআত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং অজ্ঞতার কারণে তাতে বড় ধরনের

www.pathagar.com

ভুলভ্রান্তি ঘটায় দেশে-বিদেশে, এমন কি ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনী ব্যক্তিত্বগণের পক্ষ থেকেও তার সমালোচনা ও বিরোধিতা করা হয়। বস্তুতঃ এ উদ্যোগ ইসলামের উপকার সাধনের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়েছে।

১৯৯৯-র শুরুর দিকে যথাযথ প্রস্তুতি ব্যতীতই কাশ্মীর উদ্ধারের জন্য হঠকারী সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও তাতে আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন পেতে ব্যর্থতা এবং সবশেষে আমেরিকার চাপে, উদ্ধারকৃত এলাকা থেকে হটে আসার ফলেও পাকিস্তানের ভাবমূর্তি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

## নাইজেরিয়া

অন্যান্য মুসলিম দেশের ন্যায় নাইজেরিয়ারও প্রধান সমস্যা হচ্ছে পশ্চিমা মন-মগজের অধিকারী লোকদের শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা।

সাবেক সামরিক শাসক জেনারেল ইবরাহীম বাবাঙ্গিদা পাশ্চাত্যের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে ওআইসি থেকে নাইজেরিয়ার সদস্যপদ প্রত্যাহার করেন এবং ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।

দেশটিতে খৃস্টান মিশনারীদেরকে অবারিত সুযোগ ও স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। বিপুল তেলসম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা-নিয়ন্ত্রিত শাসকগোষ্ঠীর কারণে বিশ্বের বুকে দেশটির কোন ভূমিকা নেই। অন্যদিকে দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বে চরম দেউলিয়াত্ব চলেছে যা দীর্ঘদিন যাবত সামরিকতন্ত্রকে অব্যাহত থাকার সুযোগ করে দেয়।

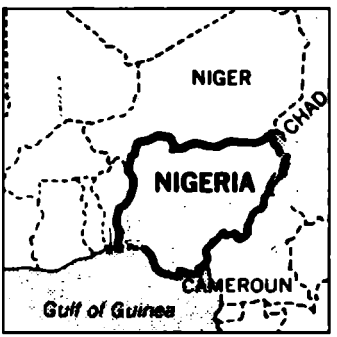


শেষ পর্যন্ত গণআন্দোলন ও শ্রমিক ধর্মঘটের মুখে বাবাঙ্গিদা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ১৯৯৩ সালের ১২ই জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এ নির্বাচনে মাশহুদ আবিওলা জয়লাভ করেন। কিন্তু বাবাঙ্গিদা নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন। এ থেকে উদ্ভুত গণঅভ্যুত্থানের মুখে তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর নিয়োজিত অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টও প্রত্যাখ্যাত হন। অতঃপর জেনারেল সানি আবাশা নতুন করে সামরিক শাসন জারী করেন। তিনি আবিওলাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। বেগম আবিওলা গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিলে তাঁকে রাজপথে গুলী করে হত্যা করা হয়। পরে ১৯৯৮-র জুলাইর প্রথম সপ্তাহে আবিওলাকেও কারাগারে 'অসুস্থ থেকে' মৃত্যুবরণ করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়। এর এক মাস আগে সানি আবাশা মারা যান। নতুন সামারিক শাসক জেনারেল আবু বকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করেন। ওলুউসেগুন ওবাসান্‌জো প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন।

ওবাসানজো ২৯মে ১৯৯৯ তারিখে ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। তিনি নাইজেরিয়াকে শেষ পর্যন্ত কোন্ দিকে নিয়ে যাবেন তা এখনো সুস্পষ্ট নয়। তবে তিনি মোটামুটি পাশ্চাত্যের মনোরঞ্জন করে চলার চেষ্টা করেছেন। তাই ৯ লাখ ২৩ হাজার ৮৫৩ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এ দেশটির জন্যে ৮০ হাজার সদস্যের সেনাবাহিনী যেখানে কোনভাবেই যথেষ্ট নয়, সেখানে তিনি সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা ১০ বছরে এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

অন্যদিকে নাইজেরিয়ার মুসলমানদেরকে ইসলামের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার লক্ষ্যে খৃস্টান মিশনারীরা সর্বাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাই উত্তরাঞ্চলীয় জামফারা ও কানো রাজ্যদ্বয় ইসলামী শরীআতের আইন জারি করলে খৃস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র দাঙ্গায় লিপ্ত হয় এবং হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। অবশ্য এ পর্যন্ত নাইজেরিয়ার সাতটি রাজ্যে ইসলামী আইন জারী করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে নাইজেরিয়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ দাবী করেছিল। জনসংখ্যার বিচারে আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশ হিসেবে তা কোন অসম্ভব দাবী ছিল না। সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পাশ্চাত্যের প্রভাব, খৃস্টান মিশনারীদের পক্ষ থেকে দেশটির খৃস্টায়নের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বাধা অপসারণ করতে পারলে নাইজেরিয়া আফ্রিকা মহাদেশের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু বর্তমানে সে আশা সুদূর পরাহত।

## তুরস্ক

ইংরেজদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে আরব-বিদ্রোহের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তুরস্কের ওসমানী খেলাফত টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অতঃপর ইহুদী-ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক মোস্তফা কামাল পাশা আনুষ্ঠানিকভাবে ওসমানী খেলাফতকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি এখানেই থেমে থাকেন নি, বরং দেশ থেকে ইসলাম ও আরব সংস্কৃতির সকল চিহ্নকে মুছে দেয়ার এবং তুরস্ককে একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার প্রয়াস পান। তাঁর পরেও তাঁর অনুসারীরা এ ধারা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তুরস্কের জনগণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী

www.pathagar.com

হওয়ায় খৃস্টান ইউরোপ আজো তুরস্ককে ইউরোপীয় দেশ বলে গ্রহণ করে নি। (তাছাড়া আসলেও তুরস্ক ইউরোপীয় দেশ নয়, বরং একটি ইউরেশীয় দেশ।) তারা তুরস্ককে ন্যাটোর সদস্য করেছে, কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সদস্য করার প্রশ্নে এতদিন পুরোপুরি অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। অবশ্য ১৯৯৯-র শেষ দিকে তুরস্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করে এবং এব্যাপারে ২০০২ সালে আলোচনা শুরু করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য যে, তুর্কী নেতাদের ইসলাম বিরোধিতায় সন্তুষ্টি হয়েই ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন হামলায় তুরস্কের ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেয়া থেকেই দেশটির পাশ্চাত্যমুখিতার রূঢ় প্রমাণ মেলে। এই পরপদলেহিতার কারণেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তুরস্ক কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে নি। এছাড়া আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশটি কুর্দী বিদ্রোহীদের নিয়ে চরমভাবে বিব্রত।

তুরস্কের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কামালী রাজনৈতিক তত্ত্বের বিষময় পরিণতি কমবেশী অনুভব করেছেন। তাই তাঁরা কমবেশী জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেখানকার সেনাবাহিনী ধর্মবিরোধী (সেক্যুলার) নীতির ধারক-বাহক হিসেবে চরমপন্থী ভুমিকা পালন করছে। ধর্মবিরোধিতার দিক থেকে তুরস্কের সেনাবাহিনীর অফিসাররা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তুলনায়ও এক ধাপ বেশী অগ্রসর। আমেরিকার মত দেশে যেখানে মুসলিম সৈন্যদের জন্য সেনাবাহিনীতে ইমাম নিয়োগ করা হচ্ছে সেখানে তুরস্কে নামায পড়ার বা স্ত্রীর হিজাবের অপরাধে সামরিক অফিসারদের চাকরিচ্যুতি ঘটছে।

সিআইএ-নিয়ন্ত্রিত তুরস্ক-সেনাবাহিনীর চাপে ১৯৯৭ সালে ইসলামপন্থী আরবাকানের সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয় এবং ১৯৯৮-র জানুয়ারীতে তাঁর দল হেয্‌বে রেফাহ্‌কে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

## মিসর

আফ্রিকা মহাদেশে নাইজেরিয়ার পরে বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হচ্ছে মিসর। দেশটির সরকার বর্তমানে পুরোপুরি আমেরিকার তাবেদার। মিসরের নিহত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করেন। আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুসনী মোবারক সে ধারা অব্যাহত রেখেছেন। ইরাকের বিরুদ্ধে ও আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়ে হুসনী মোবারক সরকার মুসলিম উম্মাহ্‌র অন্তরে চরম আঘাত দিয়েছে।

www.pathagar.com

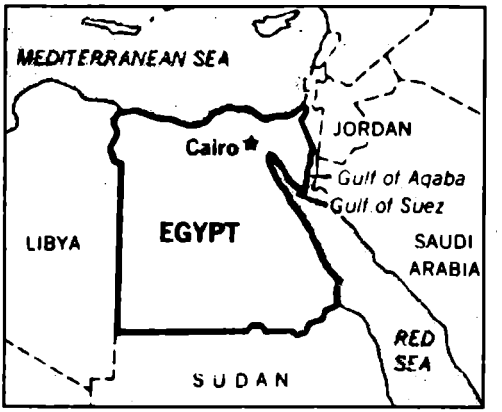


মিসরে অঘোষিতভাবে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। দেশের জনপ্রিয় দল ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে বেআইনী করে রাখা হয়েছে। ফলে ইসলামপন্থীদের একাংশ সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছে।

অবশ্য অতি সাম্প্রতিককালে মুসলিম দেশসমূহ, বিশেষতঃ আরব দেশগুলো মিসর সরকারের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মিসর সরকারও ইসরাইল ও আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণের নীতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিত আত্মসংরক্ষণের চেষ্টা করছে। কিন্তু পুরোপুরি স্বাধীন নীতি অনুসরণের কোন লক্ষণ নেই।

## ইরাক

বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ইরাক বিভিন্ন কারণে সুপরিচিত।

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়ে ইরাককে আমেরিকা সর্বাত্মক সাহায্য করে। এভাবে ইরাক মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। তার ছিল ১১ লাখ নিয়মিত সৈন্য, মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির কারখানা। কিন্তু ইরানের সাথে আট বছর যুদ্ধ চালানোর পর ব্যর্থতা ও হতাশার মুখে আমেরিকার ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখল করেন। দখলের পূর্বে সায় দিলেও দখলের পরে আমেরিকা কুয়েত দখলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং কুয়েত উদ্ধারের ছুতায় ইরাকের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে আমেরিকা ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখে। কারণ, তাঁর বিকল্প হচ্ছে ইসলামী হুকুমাত যা আমেরিকা কোন মতেই চাইতে পারে না। অনেকের ধারণা, কুয়েত দখল ও সেই ছুতায় ইরাকের ধ্বংসসাধন আমেরিকা ও সাদ্দামের মধ্যকার গোপন সমঝোতার ভিত্তিতে হয়েছে। কারণ, সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার হাতেগড়া লোক।

আমেরিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে মার্কিন-বিরোধী শিবিরে নিজস্ব অনুচরের অনুপ্রবেশ ঘটানো যারা মার্কিন-বিরোধী শ্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে আমেরিকার স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে এবং প্রকৃত মার্কিন-বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন বা দুর্বল করে দেবে। গর্বাচেভ ও ইয়েলৎসিনের ন্যায় সাদ্দাম হোসেন অনুরূপ একজন

www.pathagar.com

আমেরিকান তাবেদার। এ কারণেই আমেরিকা ইরাককে ধ্বংস করলেও সাদ্দামকে স্পর্শ করে নি। কুয়েত দখলের অপরাধে তাঁকে গ্রেফতার ও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করার পরিবর্তে ক্ষমতায় বসিয়ে রেখেছে। আর সাদ্দামও মাঝে মাঝে আমেরিকা-বিরোধী হুঙ্কার দিয়ে এবং জাতিসংঘের অস্ত্রপরিদর্শক দলের কাজে বাধা দিয়ে আমেরিকার জন্য পারস্য উপসাগরে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও আধিপত্য মজবুত করার সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং আমেরিকাও সাদ্দাম-বিরোধী প্রচার চালিয়ে তাঁকে মুসলিম জাহানে জনপ্রিয় ও মধ্যপ্রাচ্যের হিরোতে পরিণত করেছে। এটা সুনিশ্চিত যে, কোন শক্তিশালী মার্কিন এজেন্টকে ক্ষমতায় বসাবার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকা সাদ্দামকে যে কোন মূল্যে তাঁর বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে সর্বশক্তিতে চেষ্টা চালাবে।

ইরাকের বাথদলীয় সরকার একটি ঘোরতর ইসলাম ও গণবিরোধী নিপীড়ক সরকার। ১৯৬৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর বাথ পার্টি আল্লাহ্‌র কল্পিত জানাযা নিয়ে মিছিল করেছিল। ঐ সময়ে প্রখ্যাত সুন্নী আলেম আবদুল আজিজ বাদ্‌রীসহ দুই হাজার আলেমকে এবং মোট তিরিশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। ইরাকের সকল জনগণই বাথ পার্টির জুলুম-অত্যাচারের শিকার। তবে কুর্দী ও শিয়া জনগোষ্ঠীই সর্বাধিক জুলুম-অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। সাদ্দাম সরকারের জুলুম-অত্যাচারের কারণে ২০ লাখ ইরাকী[৭] দেশ থেকে পালিয়ে অন্যান্য দেশে আশ্রয় নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইরাকের জনসংখ্যা প্রধান তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ঃ আরব শিয়া, আরব সুন্নী ও কুর্দী সুন্নী। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৬ ভাগ মুসলমান[৮], তিন ভাগ খৃষ্টান[৯] ও এক ভাগ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। মুসলমানদের ৯৬ ভাগের মধ্যে ৬৪ ভাগ শিয়া ও ৩২ ভাগ সুন্নী।[১০] সুন্নীদের বেশীর ভাগই কুর্দী বংশোদ্ভুত—শতকরা ১৮ ভাগ[১১], বাকী ১৪ ভাগ আরব। প্রধানতঃ আরব সুন্নীদের মধ্যকার একটি ক্ষুদ্র ইসলাম-বিরোধী অংশ ও খৃস্টানরা ইরাককে শাসন করছে যাদের প্রতিভূ হচ্ছেন সাদ্দাম হোসেন। অবশ্য কতক শিয়া এবং কুর্দীও সরকারের সাথে সহযোগিতা করছে।

ইরাকের শিয়া ও কুর্দীরা অত্যন্ত চরমভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কুর্দীরা তাদের এলাকাকে ইরাক থেকে বিচ্ছিন্ন করার

www.pathagar.com

চেষ্টা করছে। অন্যদিকে আমেরিকা দেশটিকে তিন জনগোষ্ঠীর ভিত্তিতে তিন ভাগ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ইরাকের বিরুদ্ধে বহুজাতিক বাহিনীর বিজয়ের পর আমেরিকা নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট নিয়ে প্রথমে উত্তর ইরাকে কুর্দীদের জন্য ও পরে দক্ষিণ ইরাকের শিয়াদের জন্যে 'নিরাপদ এলাকা' গঠন করেছে যেখানে ইরাকী বাহিনীর প্রবেশ ও বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ।

উত্তর ইরাকের কুর্দী বিদ্রোহীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে ও নিজস্ব সরকার গঠন করেছে। আমেরিকা শিয়াদের জন্য অনুরূপ সুবিধাদানের অঙ্গীকারে ইরানের নিকট থেকে পরিকল্পিত কুর্দী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি চেয়েছিল। কিন্তু ইরান ও ইরাকী শিয়া নেতৃবৃন্দ ইরাকের বিভক্তির বিরোধিতা করায় এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হতে পারে নি। তবে দেশটির কার্যতঃদ্বিধাবিভক্ত অবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

ইরাকী জনগণ একদিকে সাদ্দামের গণবিরোধী শাসনের অসহায় শিকার, অন্যদিকে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার। ইরাকের নিকট মুসলিম উম্মাহ্‌র আপাততঃ কিছু আশা করার নেই।

## সউদী আরব

ইসলামের পবিত্র ভুমি মক্কা ও মদীনা সউদী আরবে অবস্থিত। মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকট এ দেশটির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দেশটির গণবিরোধী রাজতান্ত্রিক সরকার পুরোপুরি আমেরিকার তাবেদার। দেশটিতে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। ইরাককে ধ্বংস করার জন্যে আমেরিকান সৈন্যদের ডেকে এনে সউদী সরকার সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ঘৃণা কুড়িয়েছে। রাজতান্ত্রিক শ্বাসরুদ্ধকর শাসনে পিষ্ট সউদী আরবের জনগণ রক্তপিপাসু তলোয়ারের নীচে নীরবতা অবলম্বন করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

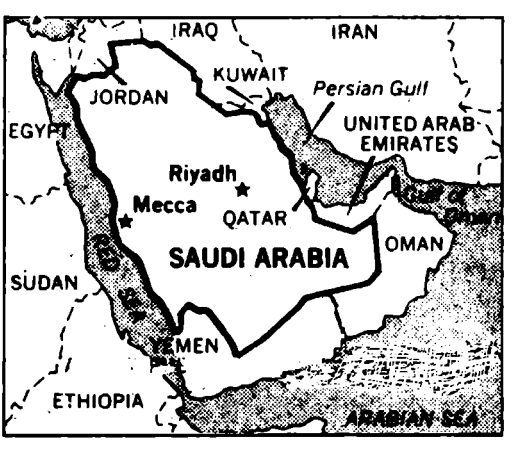


সউদী আরব নিজেকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবী করে থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, ইসলাম রাজতন্ত্রের অনুমোদন করে না। সউদী আরবে চিন্তা ও আকিদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা নেই; ভিন্নমতকে টুটি টিপে হত্যা করা হয়। দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ (মধ্যম স্তর পর্যন্ত) এবং

www.pathagar.com

ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পসহ প্রায় সকল সম্পদ সউদী রাজপরিবারের সদস্যদের কুক্ষিগত। একটি মনোনীত মজলিসে শূরা আছে বটে যাতে রাজপরিবারবহির্ভূত কিছু সদস্যও রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে রাজপরিবারের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখতে বাধ্য থাকেন। সাম্প্রতিক কালে কতক বুদ্ধিজীবী—যাঁরা পুরোপুরি রাজতন্ত্রের বিরোধী নন ও এর উৎখাত চান না— বাদশাহ্‌র হাতে সর্বাধিক ক্ষমতা রেখেই নির্বাচিত মজলিসে শূরা গঠনের পক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদেরও কণ্ঠরোধ করা হয়েছে।

ওপেকের সদস্যভুক্ত সব চেয়ে বেশী তেল উৎপাদনকারী দেশ সউদী আরব। তার হাতে প্রচুর অর্থ ছিল। কিন্তু এ অর্থের বেশীর ভাগই রাজপরিবারের সদস্যদের ভোগবিলাসিতায় ব্যয়িত হয় এবং বাকী অর্থ আমেরিকানদের হাতে তুলে দেয়া হয়। সউদী আরবের অর্থ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র কোন কল্যাণে আসছে না। ১৯৮০-র দশক থেকে সউদী আরব বার বার আমেরিকার নির্দেশে তেলের অতিরিক্ত উৎপাদন করে মূল্যহ্রাস ঘটিয়ে তেল রফতানীকারক অন্যান্য দেশকে এবং নিজেকেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সাম্প্রতিক কালে মার্কিন ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে সউদী আরবকে বৈদেশিক ঋণও গ্রহণ করতে হয়েছে। ১৯৯৯-এর শুরুর দিকে সউদী আরবের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৭০ কোটি ডলার।[১২]

পরপদলেহিতার কারণে বিশ্বের বুকে সউদী আরবের কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা নেই।

## মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া একটি বহুজাতিক দেশ, তবে মুসলিম সংখ্যাগুরু। এদেশের জনগণ ইসলাম, বৌদ্ধ, খৃস্ট ও হিন্দু—এই চার ধর্মের অনুসারী; স্বল্প সংখ্যক কনফুসীয়, তায়ু এবং এনিমিস্টও রয়েছে। মালয়েশিয়ার জনগণ জাতিগতভাবে মালয়ী, চীনা, ভারতীয় ও ফিলিপিনো বংশোদ্ভুত। এ দেশটিতে মালয়ী, ভারতীয় ও চীনা সংস্কৃতি বিদ্যমান। মুসলমানরা (প্রধানতঃ মালয়ী ও ফিলিপিনো) সংখ্যাগুরু হলেও (শতকরা ৫৫ ভাগ)[১৩] অন্য তিন ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ করে চীনা বংশোদ্ভুতদের প্রভাব অনেক বেশী। তারা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ হলেও দেশের সম্পদের বেশীর ভাগই

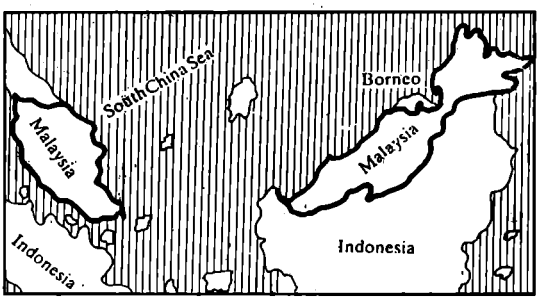


www.pathagar.com

তাদের হাতে।[১৪] পূর্বাঞ্চলীয় সাবাহ্ প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ; খৃস্টানরা এক তৃতীয়াংশ এবং চীনারা ২০ ভাগ।[১৫] খৃস্টানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা রয়েছে।

দেশটির এই বিশেষ ধর্মীয়, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক অবস্থা মালয়েশিয়াকে আদর্শিকভাবে অনেকখানি দুর্বল করে রেখেছে। তবে দেশটির ক্ষমতাসীন সরকারের নেতৃবৃন্দ পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও বাস্তব পরিস্থিতি অধ্যয়নে অন্যান্য মুসলিম দেশের শাসকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা দেশটিকে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখার চেষ্টা করছেন। ফলে ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে মালয়েশিয়া। কিন্তু ১৯৯৭-এর শেষ দিক থেকে দেশটিতে অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়। বিশেষ করে মুদ্রামানের পতনের ফলে জনজীবনে সমস্যা দেখা দেয়। তবে তা একটি সহনীয় মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

মালয়েশিয়ার জনগণ অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয় ও ধর্মীয় সহনশীলতার অধিকারী। এই বৈশিষ্ট্য দেশটির ঐক্য-সংহতি ও স্থিতিশীলতায় বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এ কারণে কেলানতান রাজ্যের রাজ্যসরকার সেখানে ইসলামী আইন প্রবর্তন করায় কোন জাতীয় সংকট সৃষ্টি হয় নি।

১৯৯৮ সালে দেশটির শাসকজোট ন্যাশনাল ফ্রন্টের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ তাঁর উরাধিকারী হিসেবে বহুলপ্রচারিত উপপ্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহীমকে বরখাস্ত ও জেলে নিক্ষেপ করেন। এর ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ বহুলাংশে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

১৯৯৯-র নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে আনোয়ার ইবরাহীমের স্ত্রী আজিজাহ্ ইসমাইল ন্যাশনাল জাস্টিস্ পার্টি নামে নতুন দল গঠন করেন যা শাসক জোটের জন্যে ক্ষতির কারণ হয়। শাসক জোটের এ সংকটের ফলে ইসলামপন্থীদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। যদিও নির্বাচনে শাসক জোট দুই তৃতীয়াংশের বেশী আসনে জয়লাভ করে, তবে তাদের আসনসংখ্যা ১৬৬ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪৮-এ দাঁড়ায় এবং ইসলামী দল 'পাস'-এর আসনসংখ্যা ৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭টিতে দাঁড়ায়। সেই সাথে পাস-এর নিয়ন্ত্রিত রাজ্যসংখ্যা একটি থেকে বেড়ে দু'টিতে দাঁড়ায়।

মালয়েশিয়া তার জনসংখ্যার আকার ও বিন্যাসের কারণে মুসলিম উম্মাহ্কে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম নয়। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে মালয়েশিয়া মুসলিম উম্মাহ্র জন্য একটি উৎসাহব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত বটে।

## সিরিয়া

মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ আরব দেশ সিরিয়া। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল, তবে সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী। মুসলিম জাহানে সামরিক শক্তির দিক থেকে

www.pathagar.com

সঠিক বিচারে বর্তমানে ইরানের পরেই সিরিয়ার স্থান। সাংবিধানিকভাবে বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং সরকারী ও বিরোধী জোটের অস্তিত্ব থাকলেও কার্যতঃ একদলীয় শাসন চলছে। বাথ পার্টির নেতা হাফেয আল্-আসাদ ১৯৭০ সাল থেকে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গত ১০ই জুন (২০০০) তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র বাশার আল্-আসাদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হন।

রাজনৈতিক তৎপরতার দিক থেকে সিরিয়াকে নীরব দেশ বললে অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য ১৯৮২ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমিন এক অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে। তবে তা দমন করা হয়।

সিরিয়ার চার লক্ষাধিক সৈন্যের এক শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী এবং ব্যালেস্টিক মিসাইলসহ যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। ১৯৭৬ সালে লেবাননের গৃহযুদ্ধের সময় আরব লীগের সিদ্ধান্তক্রমে সিরিয়া সেখানে ৩৫ হাজার সৈন্য পাঠায়[১৬] এবং তখন থেকে তারা সেখানে রয়েছে। এছাড়া লেবাননের জনগণের ও রাজনৈতিক দলসমূহের একাংশের ওপর সিরিয়ার প্রভাব রয়েছে।

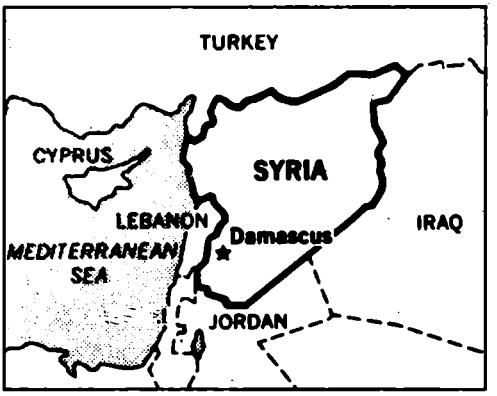


সিরিয়ার গোলান মালভূমি ইসরাইলের দখলে। প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র সিরিয়াই যায়নবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য এজন্য ইরানী সাহায্যের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

ইরাকের বাথ পার্টির প্রধান প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও সিরীয় বাথ পার্টির প্রধান প্রেসিডেন্ট হাফেয আল-আসাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছিল। এ কারণে ইরানের নিষেধ সত্ত্বেও সিরিয়া আমেরিকার নেতৃত্বে ইরাক-বিরোধী যুদ্ধে অংশ নেয়।

বহির্বিশ্বে সিরিয়ার কোন ভূমিকা নেই। দারিদ্র্য, স্বল্প জনসংখ্যা ও নেতৃত্বের কূপমণ্ডুকতা সিরিয়াকে তার সামরিক শক্তি সত্ত্বেও প্রভাববিহীন দেশে পরিণত করেছে।

## ইথিওপিয়া

ইথিওপিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সুবিদিত। অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম (সঃ)-এর যুগেই ইথিওপিয়ায় ইসলামের প্রবেশ ঘটে। পরবর্তীতে দেশটি মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশে পরিণত হলেও এর শাসনক্ষমতা খৃস্টানদের হাতে চলে যায়। ফলে এটি একটি খৃস্টান-প্রধান দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

www.pathagar.com

সম্রাট হাইলে সেলাসীর সময় ইথিওপিয়ার সর্বাধিক মুসলিম-প্রধান প্রদেশ ইরিত্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এতে প্রতিবেশী মুসলিম দেশ মিসর, সূদান, সউদী আরব, ইয়েমেন ও সোমালিয়া সাহায্য করে। পরে আমেরিকাও সাহায্য করে। কিন্তু ইথিওপিয়ার সচেতন মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ এ মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন নি। কারণ এর ফলে ইথিওপিয়ার মুসলমানদের দুর্বল হবার সম্ভাবনা ছিল। শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়।

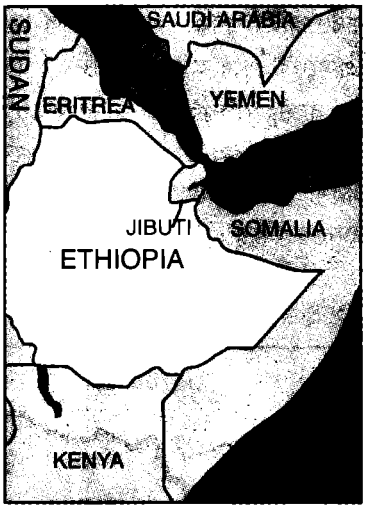


কম্যুনিস্ট সরকারের পতনের পর ইথিওপিয়ায় সরকার-বিরোধী গেরিলাতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত বামপন্থী শাসক মেঙ্গিস্তু হাইলে মার্‌ইয়াম দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ যুদ্ধে ইথিওপিয়ান মুক্তিফ্রন্ট ছাড়াও ইথিওপিয়ার মুসলিম গেরিলারাও অংশগ্রহণ করে। মেঙ্গিস্তু হাইলে মার্‌ইয়ামের বিদায়ের পর ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু উভয় দেশেই খৃস্টানরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়।

দারিদ্র্য ও অশিক্ষা ইথিওপিয়ার মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ। এই সুযোগে খৃস্টান মিশনারীরা দেশটিকে খৃস্টান সংখ্যাগুরু দেশে পরিণত করার জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। ১৯৯৮-৯৯-এ ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার মধ্যে ছোটখাট সীমান্তসংঘর্ষ ঘটে। প্রায় ১ বছর বন্ধ থাকার পর ২০০০ সালের মে মাসে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। অবশ্য গত ১৮ই জুন (২০০০) দু'দেশের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এছাড়া ১৯৯৯-র মাঝামাঝি থেকে ইথিওপিয়ায় সীমিত আকারে হলেও নতুন করে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। একটি ইসলামী দলও এতে জড়িয়ে পড়েছে।

## বিপ্লবী দেশসমূহ

মুসলিম জাহানের চিত্র কেবল হতাশার চিত্রই নয়। আশার আলোও রয়েছে এবং তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কারণ সংখ্যায় কম হলেও বেশ ক'টি দেশ বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে বিশ্বের বুকে নিজেদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এদেশ ক'টি হচ্ছে ইরান, লেবানন, সূদান ও লিবিয়া।

### ইরান

ইরানের ইসলামী বিপ্লব চলতি শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করে, আমেরিকার আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ উপেক্ষা করে এবং আমেরিকার আরোপিত একটি চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ মোকাবিলা করে ইরান শুধু টিকেই

www.pathagar.com

থাকে নি, বরং অনেকখানিই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। এটা কেবল ইসলামী বিপ্লব এবং খাঁটি ইসলামী নেতৃত্বের কারণে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইমাম খোমেনী(রঃ)-এর ইন্তেকাল, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধ ইরানের সামনে এক কঠিন ও জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়।

ইমাম খোমেনী(রঃ)-এর নেতৃত্ব সমগ্র ইরানী জনগণ ও মুসলিম উম্মাহ্‌কে যে শক্তি দিতে পারত তা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয় অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই। অন্যদিকে ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধে ইরাকের পরাজয়ে আমেরিকা কার্যতঃ ইরানের প্রতিবেশীতে

পরিণত হয় (কারণ, কুয়েতের বুবিয়ান দ্বীপে এখন মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে)। দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের এক নম্বর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। যে কোন ছুতায় ইরানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আমেরিকা প্রস্তুত হয়ে আছে। তাই বিগত একদশক-কাল ইরান সরকার খুব সাবধানতা ও ধৈর্য্যের সাথে অগ্রসর হয়। সেই সাথে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মার্কিন এজেন্টদের নাশকতার ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টাকে ইরান অত্যন্ত সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করেছে।

ইরান আমেরিকার সাথে সামরিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটাকে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য কল্যাণকর মনে করে নি। তাই উস্কানি সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলেছে। প্রতিবেশী আরব দেশসমূহের সাথে সম্পর্কের উন্নতি করেছে। অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। বলা হয়, ইরান কাজ্জাকিস্তান থেকে পারমাণবিক অস্ত্র কিনেছে যদিও ইরান তা অস্বীকার করেছে। ইরান রাশিয়ার নিকট থেকে দু'টো সাবমেরিন কিনেছে, চীনের নিকট থেকে পারমাণবিক বিদ্যুত প্রকল্প কিনেছে। অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করছে। ইরান ইতিমধ্যেই নিজস্ব প্রযুক্তিতে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাঙ্ক, কামান ও হোভারক্রাফ্‌ট্ নির্মাণ করেছে এবং জঙ্গী বিমান মেরামত করছে। আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগের মতে, ২০০৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইরান আমেরিকার শহরসমূহ ধ্বংসের উপযোগী ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী হবে।[১৭] যানবাহন উৎপাদনেও ইরান বহু দূর এগিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

ইসলামী আদর্শ, খাঁটি ইসলামী নেতৃত্ব এবং ক্ষমতার নিরঙ্কুশ বিভাজনমূলক রাষ্ট্রীয় কাঠামোই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাফল্যের চাবিকাঠি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরান কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। চীন, পাকিস্তান, রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সমঝোতা গড়ে ইরান এশিয়াকে মার্কিন আধিপত্যমুক্ত করার চেষ্টা করছে। সউদী আরব এবং মিসরের সাথেও ইরানের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। এছাড়া মধ্য এশিয়া ও ককেসাস এলাকার সদ্যস্বাধীন ছয়টি মুসলিম দেশের ওপর ইরানের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক নিয়ে গঠিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (একো)-কে সম্প্রসারিত করে উক্ত ছয়টি দেশ ও আফগানিস্তানকে এর সদস্য করা হয়েছে। এই ঐক্যের নেতৃত্ব কার্যতঃ ইরানেরই হাতে রয়েছে।

এছাড়া বিপ্লবী দেশ ভিয়েৎনাম, লিবিয়া ও কিউবার সাথে ইরানের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং সূদানের ওপর রয়েছে বিরাট প্রভাব। কার্যতঃ বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার একক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ইরান। বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে আমেরিকান নেতৃত্বের সমাপ্তি ঘটছে। তখন আঞ্চলিক নেতৃত্বের জন্যে জাপান ও জার্মানী ছাড়া আরো যেসব দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তার মধ্যে ইরান অন্যতম। তাই বলা যায়, আগামী শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব দেবে ইরান।

## লেবানন

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি মুসলমানদের সর্বশেষ শক্তিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিকল্পিতভাবে আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি করে এবং তুরস্কের ওসমানী খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানি দেয়। তারা মক্কার শাসক শরীফ হোসেনকে সমগ্র আরব ভূখন্ডের বাদশাহ বানানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু যুদ্ধে ওসমানীদের পরাজয়ের পর ইংরেজরা প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকার করে এবং আরব জাহানকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে শরীফ হোসেনের নিকট সমর্পণের পরিবর্তে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে। এভাবে সউদী আরব, মিসর, ফিলিস্তিন, জর্দান, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েত প্রভৃতি দেশের উদ্ভব ঘটে। এ সময়ে তারা ফিলিস্তিনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র ও লেবাননে একটি খৃস্টান রাষ্ট্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

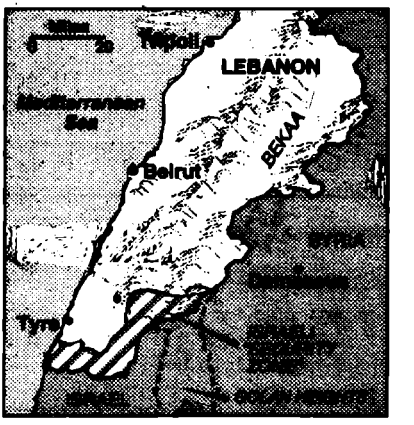


www.pathagar.com

ইংরেজদের প্ররোচনায় বাহশাহ্ আবদুল আজিজ শরীফ হোসেনকে উৎখাত করে মক্কা-মদীনা দখল করে সউদী আরব প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজরা কৌশলগত কারণে সিরিয়া ও লেবাননকে ফ্রান্সের অছিগিরিতে সমর্পণ করে, ফিলিস্তিনে নিজেদের অছিগিরি প্রতিষ্ঠা করে, শরীফ হোসেনের বড় পুত্র ফয়সলকে ইরাকে এবং ছোট পুত্র আবদুল্লাহ্কে জর্দানে তাবেদার শাসক নিয়োগ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাবেদার ও অছি দেশগুলোকে স্বাধীনতা প্রদানের হিড়িক পড়ে গেলে ফরাসীরা লেবাননকে মুসলমান ও খৃষ্টানদের একটি যৌথ রাষ্ট্ররূপে এক জটিল সংবিধানের অধীনে স্বাধীনতা প্রদান করে যার উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে যাতে দেশটি একটি খৃষ্টান সংখ্যাগুরু দেশে পরিণত হতে পারে। তবে সময়ের প্রবাহে বিগত কয়েক দশকের ব্যবধানে সেখানে এখন মুসলমানরা দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী হয়েছে। কিন্তু চাপিয়ে দেয়া সংবিধানের বাধ্যবাধকতার কারণে মুসলমানরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফল ভোগ করতে পারছে না। তবে বিগত কয়েক দশক যাবত তারা আধিপত্যবাদী দেশী খৃষ্টান শক্তি ও আগ্রাসী ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেভাবে টিকে আছে, বরং অগ্রগতি হাসিল করেছে— তা অনুসরণীয় উজ্জল দৃষ্টান্ত।

প্রতিবেশী দেশ ফিলিস্তিনের ওপর অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত যায়নবাদী ইসরাইল ১৯৮২ সালের ৪ঠা জুন লেবাননে হামলা চালায় এবং ১২ই জুনের মধ্যে রাজধানী বৈরুতের বিরাট এলাকাসহ দেশের এক তৃতীয়াংশ দখল করে নেয়। কিন্তু নবগঠিত ইরান-সমর্থিত হিযবুল্লাহ্ গেরিলা বাহিনী তাদেরকে লেবানন থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। ইসরাইলী দখলের পর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইতালীর নৌসেনারা লেবাননে অবতরণ ও অবস্থান গ্রহণ করে। হিযবুল্লাহ্র আত্মঘাতী হামলার ফলে কয়েকশ' সৈন্যের প্রাণহানি ঘটায় তারাও তড়িঘড়ি করে লেবানন থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়।

ইসরাইলী বাহিনী লেবানন ত্যাগ করে গেলেও তাদের তাবেদার দক্ষিণ লেবানন বাহিনী (এসএলএ) নামক খৃষ্টান মিলিশিয়া বাহিনীর সহায়তায় দক্ষিণ লেবাননের একটি অংশ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়। ইসরাইল এ জায়গাটিকে একটি বাফার জোন হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু দক্ষিণ লেবাননের হিযবুল্লাহ্ বাহিনী এ এলাকাটিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যায়নবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখে।

বিগত কয়েক বছরে যায়নবাদী ইসরাইল হিযবুল্লাহ্ গেরিলাদের অভিযানে দিশাহারা হয়ে পড়ে দেশটির দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য এলাকায় একাধিক বার ব্যাপক হামলা চালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মরণজয়ী হিযবুল্লাহ্ গেরিলাদের চাপের মুখে তাদের সাথে যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্য হয়। অবশ্য পরে পুনরায় সংঘর্ষ বাঁধে। হিযবুল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিরোধও অব্যাহত থাকে। অবশেষে গত ২৪শে মে (২০০০) ইসরাইলী বাহিনী ও এসএলএ-মিলিশিয়ারা দক্ষিণ লেবানন ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

ভবিষ্যতে ইসরাইলের উৎখাত ও ফিলিস্তিন উদ্ধারের প্রশ্নে লেবাননের হিযবুল্লাহ্ গেরিলারাই হচ্ছেন সব চেয়ে বড় আশার আলো। বিশ্বের বুকে এ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীটি তাই

www.pathagar.com

অপরিসীম গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণে লেবানন সরকারও হিযবুল্লাহ্‌কে সমীহ করে চলে। তাই ইতিপূর্বেই হিযবুল্লাহ্‌কে নিরস্ত্র করার আমেরিকান চাপকে বৈরুত সরকার প্রত্যাখ্যান করে। অবশ্য চাইলেও লেবানন সরকারের পক্ষে হিযবুল্লাহ্ বাহিনীকে নিরস্ত্র করা সম্ভব নয়।

লেবাননের মুসলমানরা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যে এক অনুপ্রেরণার উৎস বটে।

## সূদান

সুদানের এক বিপ্লবী ইসলামী ঐতিহ্য রয়েছে। উনিশ শতকের শেষে মোহাম্মদ আহ্‌মদ বা সূদানের মাহদী দেশটিতে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাভূত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পরে ধীরে ধীরে দেশটি তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। অবশেষে পশ্চিমা মন-মানসিকতার অধিকারী লোকেরা ক্ষমতা দখল করে বসে। ক্ষমতার হাতবদলের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রান্ত হবার পর বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল ওমর হাসান আল্‌বাশীর ক্ষমতায় আসেন। জেনারেল বাশীর ক্ষমতাসীন হবার পর স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা তাঁকে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবে তিনি ইসলামের পথকে বেছে নেন। তিনি দেশের ইসলামায়নের জন্যে ইরানের ইসলামী সরকারের সাহায্য নিচ্ছেন। ইরান তার আফ্রিকা মহাদেশে ইসলাম প্রচারের কর্মসূচীসমূহের সমন্বয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে সূদানে।

সূদানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলের খৃস্টান বিদ্রোহ। পাশ্চাত্যের ক্রুসেডার গোষ্ঠী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও প্রতিবেশী খৃস্টান সরকারগুলোর সহযোগিতায় বিদ্রোহীরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাদেক আল্‌মাহ্‌দীসহ অন্যান্য সরকার-বিরোধীরাও বিদ্রোহীদের সাথে আঁতাত করে। (পরে ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৯ অবশ্য বাশীর ও মাহ্‌দীর মধ্যে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।) কিন্তু সূদান সরকার এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ও দেশের ইসলামীকরণ অব্যাহত রাখে। এ কারণে সূদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রোশের শিকার হয়।

www.pathagar.com

আমেরিকা সূদানকে সন্ত্রাসবাদী দেশের তালিকাভুক্ত করেছে, সূদান থেকে স্বীয় রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নিয়েছে, দেশটির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং স্বীয় প্রভাব খাটিয়ে এ দরিদ্র দেশটিতে আইএমএফ-এর সাহায্য বন্ধ করাবার ব্যবস্থা করেছে। শুধু তা-ই নয়, আমেরিকা সূদানে সামরিক হামলাও চালিয়েছে। রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর ভূয়া অভিযোগে ১৯৯৮-র ২০শে আগস্ট আমেরিকা খার্তুমের আশশেফা ওষুধ কারখানায় বিমান হামলা চালায়। এতদ্সত্ত্বেও সূদানী জনগণ ইসলামের ওপর অনড়-অটল হয়ে রয়েছে। এটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য একটা অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত।

তবে ১৯৯৯-র শেষ দিক থেকে প্রেসিডেন্ট বাশীর এবং তাঁর রাজনৈতিক ও আদর্শিক গুরু পার্লামেন্টের স্পীকার শেখ হাসান তুরাবীর মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়। তুরাবী পার্লামেন্টের ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রেসিডেন্টকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে প্রেসিডেন্ট বাশীর ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৯৯) পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন ও দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, ১লা জানুয়ারী (২০০০) মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন এবং ৭ই মে (২০০০) ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির মহাসচিব পদ থেকে তাঁকে অপসারণ করেন। ফলে দেশ সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়।

## লিবিয়া

লিবিয়াও বিপ্লবী অতীতের অধিকারী। বিশ শতকের শুরুর দিকে লিবিয়ার ধর্মীয় নেতা ওমর মোখতার দীর্ঘ ২০ বছর যাবত ইতালীয় উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। দেশটি বিগত তিন দশক যাবত কর্নেল গাদ্দাফীর নেতৃত্বে স্বীয় বিপ্লবী ঐতিহ্য রক্ষার চেষ্টা করে আসছে। কর্নেল গাদ্দাফী শহীদ ওমর মেখতারের ন্যায় আলেম নন, অতএব, তাঁর নেতৃত্বে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আশা করা যায় না। কিন্তু তিনি দেশটিকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন রাখার চেষ্টা করছেন এবং

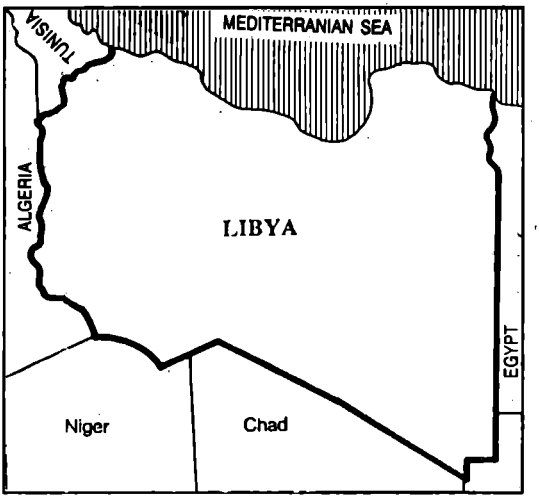


আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করে চলেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন মুক্তি আন্দোলনকে, বিশেষ করে আরাকান ও ফিলিপাইনের মুসলমানদের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সর্বাত্মক সাহায্য প্রদান করেছেন। কিন্তু অন্যান্য মুসলিম দেশের সহযোগিতার অভাবে তিনি এ দু'টি ভূখণ্ডকে স্বাধীন করতে পারেন নি।

www.pathagar.com

লিবিয়া আরব ঐক্যের প্রবক্তা। বিভিন্ন সময় সিরিয়া, মিসর ও মরোক্কোর সাথে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা চালিয়ে লিবিয়া ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকা তার বিরোধিতার কারণে গাদ্দাফীকে হত্যার চেষ্টা করে আসছে। ১৯৮৬ সালের ১৫ই এপ্রিল মার্কিন বিমানবাহিনী গাদ্দাফীকে হত্যার লক্ষ্যে বেনগাযী ও ত্রিপোলীতে তাঁর তাঁবুর ওপর বিমান হামলা চালায়। এছাড়া ১৯৯৬-র ফেব্রুয়ারীতেও গাদ্দাফীকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হয় যাতে বৃটেন জড়িত ছিল।

১৯৮৮ সালে সংঘটিত লকারবি বিমান বিস্ফোরণের সাথে দু'জন লিবীয় নাগরিকের জড়িত থাকার অভিযোগ করে আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে লিবিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, সামরিক ও বিমান নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এছাড়া আমেরিকা এ দেশটিকে সন্ত্রাসবাদী দেশের তালিকাভুক্ত করেছে। কথিত বিমানধ্বংসকারীদ্বয়ের বিচার আন্তর্জাতিক আদালতে বা তৃতীয় কোন দেশে অনুষ্ঠানে আমেরিকা, ফ্রান্স বা বৃটেন দীর্ঘদিন যাবত রাজী হয় নি। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে, তারা বিচারপ্রহসনের মাধ্যমে গাদ্দাফীকে ফাঁসাতে চাচ্ছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে পানামার দেশপ্রেমিক লৌহমানব নরিয়েগার বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের ন্যায় পদক্ষেপ নেয়ার ষড়যন্ত্র করছিল। শেষ পর্যন্ত লিবিয়ার ধৈর্যের জয় হয়েছে। অবশেষে হেগে বৃটিশ বিচারকের আদালতে উক্ত দু' লিবীয় নাগরিকের বিচার অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স রাযী হয়েছে। এছাড়া বৃটেন দীর্ঘ ১৫ বছর পর লিবিয়ার সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়েছে।

লিবিয়ার নেতা কর্নেল গাদ্দাফী লিবীয় জনগণের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। তিনি এক দলবিহীন জনপ্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। এ ব্যবস্থায় গ্রাম বা মহল্লার জনগণ মিলে স্থানীয় গণকংগ্রেস গঠিত হয় এবং তারা স্বীয় মনোনীত গণকমিটির মাধ্যমে সামষ্টিক কাজ আঞ্জাম দেয়। স্থানীয় গণকমিটিগুলো মিলে জিলা বা শহর গণকংগ্রেস গঠিত হয় এবং শহর বা জিলা গণকমিটির সদস্যদের নিয়ে জাতীয় গণকংগ্রেস হয় যা জাতীয় গণকমিটি বা সরকার গঠন করে।

লিবিয়ার দু'টি দুর্বল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনসংখ্যার স্বল্পতা এবং শক্তিশালী প্রতিবেশী মার্কিন-তাবেদার মিসরের শত্রুতা। এতদসহ নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞার কারণে তেলসমৃদ্ধ এ দেশটি বর্তমানে তার বিপ্লবী ভূমিকা থেকে অনেকটা হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেশটি স্বাধীনতাকামীদের জন্যে প্রেরণার উৎস।

## সদ্যস্বাধীন দেশসমূহ

নব্বই-এর দশকের সূচনাতে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যে অত্যন্ত আশা ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে কতগুলো মুসলিম দেশের স্বাধীনতা। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের

www.pathagar.com

বিলুপ্তির ফলে এর ছয়টি মুসলিম অধ্যুষিত প্রজাতন্ত্র আযারবাইজান, তুর্কামানিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান, কাজ্জাকিস্তান ও তাজিকিস্তান স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ ছাড়া রুশ ফেডারেশন থেকে চেচনিয়া এবং জর্জিয়া থেকে আবখাযিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। একই সময় যুগোস্লাভিয়া কনফেডারেশনে একদলীয় শাসনের পতন ঘটলে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও মেসিডোনিয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে ইথিওপিয়ায় মেঙ্গিস্তু হাইলে মার্ইয়ামের শাসনের অবসানের পর, তাঁকে উৎখাতকারী গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ইরিত্রিয়া স্বাধীন দেশে পরিণত হয়।

## ককেসাস ও মধ্য এশিয়ার ছয়টি মুসলিম দেশ

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির ফলে পাঁচটি মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্র আযারবাইজান, তুর্কামানিস্তান, কাজ্জাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান ও তাজিকিস্তান এবং কাফকায (ককেসাস) পার্বত্য অঞ্চলের মুসলিম প্রজাতন্ত্র আযারবাইজান স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। বাতিল শক্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ দেশগুলো স্বাধীন অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ মার্কিন এজেন্ট গর্বাচেভ কম্যুনিজমকে বিদায় দিলেও আমেরিকা বিরাট পুঁজিবাদী পরাশক্তিরূপে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখতে রাযী ছিল না। তাই আমেরিকা তার অপর এজেন্ট ইয়েলৎসিনের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিলুপ্ত করে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ভুক্ত ছয়টি মুসলিম প্রজাতন্ত্র প্রাকৃতিক সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ। বিশেষ করে আযারবাইজান ও তুর্কামানিস্তান তেলসমৃদ্ধ দেশ। কিন্তু দীর্ঘ ৭০ বছর ব্যাপী কমিউনিস্ট শাসন এবং তারও পূর্বে বহু বছর যাবত জারের শাসনে থাকার কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশগুলো বহুলাংশে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া এসব দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রুশ বংশোদ্ভুত রয়েছে যারা মুসলমানদের তুলনায় উন্নততর পেশায় নিয়োজিত।

www.pathagar.com

এ দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রুশ বংশোদ্ভুত রয়েছে কাজ্জাকিস্তানে—শতকরা ৩৮ ভাগ, এরপর কিরগিজিস্তানে—শতকরা ২১ ভাগ। তুর্কামানিস্তানে রুশদের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ এবং উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানে শতকরা ৮ ভাগ করে।[১৮] এর মধ্যে তাজিকিস্তান বাদে বাকী ৫টি দেশে সাবেক কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় রয়েছে। সোভিয়েত-উত্তর রুশ ফেডারেশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের সাথে চরিত্রগত মিলের কারণে রাশিয়ার ও এ ক'টি দেশের সরকারের মধ্যে খুবই ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অন্যদিকে তাজিকিস্তানে কট্টর কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তা সত্ত্বেও রাশিয়ার সাথে তাদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর কারণ, তাজিকিস্তানের ইসলামপন্থীদের মোকাবিলায় মার্কিনপন্থী ইয়েলৎসিন কম্যুনিস্টদের সমর্থন করা জরুরী মনে করেন। অবশ্য ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দীর্ঘ মধ্যস্থতা-প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯৭-র শেষ দিকে তাজিকিস্তানের সরকার ও ইসলামপন্থীদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গ্রহণকারী রুশ ফেডারেশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট মার্কিন তাবেদার ইয়েলৎসিনের উদ্যোগে গঠিত স্বাধীন দেশসমূহের কমনওয়েলথ (সিআইএস)-এ এ ক'টি দেশও সদস্য হয়েছে। এছাড়া রাশিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও বাইলোরাশিয়া (বেলারুস) এর সদস্য। কিছুদিন পূর্বে ইয়েলৎসিন সিআইএস-কে সামরিক জোটে পরিণত করারও উদ্যোগ নেন। তবে আযারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া এতে আগ্রহ প্রকাশ করে নি।

এ ছয়টি মুসলিম দেশের মধ্যে আযারবাইজান আর্মেনীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিয়ে বিব্রত। অন্যদিকে তাজিকিস্তানের কম্যুনিস্ট সরকার ইসলামপন্থী বিপ্লবীদের দমন করার লক্ষ্যে দেশে ২০ হাজার রুশ সৈন্য মোতায়েন করে।[১৯]

ইরান, পাকিস্তান ও তুরস্ক নিয়ে গঠিত 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা' (একো)-তেও এ ছ'টি মুসলিম রাষ্ট্র এবং আফগানিস্তান সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এভাবে মুসলিম জাহানের সাথে এ দেশগুলোর সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে।

আযারবাইজান ও তাজিকিস্তানের জনগণের মধ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এর বিশেষ কারণও রয়েছে। এক সময় আযারবাইজান ইরানের অংশ

www.pathagar.com

ছিল। তাছাড়া দেশটির মুসলিম জনগণের প্রায় সকলেই শিয়া মাযহাবের অনুসারী। মধ্য এশিয়ার অন্য মুসলিম দেশগুলোও এক সময় ইরানের অংশ ছিল বিধায় এ সব দেশের জনগণ ইরানের সাথে অভিন্ন সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ। এছাড়া ইরানের ইসলামী বিপ্লব এসব দেশের মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করেছে। অন্যদিকে তাজিকিস্তানের বেশীর ভাগ জনগণই ফার্সীভাষী। এটা ইরানের সাথে তাদের ভাববিনিময় ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

## বসনিয়া-হার্জেগোভিনা

ইউরোপের বলকান এলাকার মুসলিম-প্রধান দেশ বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ছিল যুগোস্লাভিয়ার অন্যতম প্রজাতন্ত্র। কনফেডারেটিভ সংবিধানভিত্তিক এ দেশটির একমাত্র ঐক্যসূত্র ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি। তাই একদলীয় শাসনের অবসানের পর খুব সহজেই এর ছয়টি প্রজাতন্ত্র পাঁচটি স্বাধীন দেশে পরিণত হয় যার অন্যতম হচ্ছে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা। (পরে 'মুসলিম বিশ্বে ক্রুসেডের ক্রুর থাবা' অধ্যায়ে বসনিয়ার গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

## মেসিডোনিয়া

মেসিডোনিয়াও যুগোস্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়েছে। মুসলিম সূত্রের দাবী অনুযায়ী দেশটির শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ মুসলমান। কিন্তু পাশ্চাত্য সূত্রে দেশটিকে খৃস্টান সংখ্যাগুরু বলে দাবী করা হয়। অবশ্য দেশটির শাসনক্ষমতায় খৃস্টানরাই অধিষ্ঠিত রয়েছে।

প্রতিবেশী গ্রীস এ দেশটির সাথে খুবই বৈরী আচরণ করছে। চাপের মুখে দেশটির জাতীয় পতাকা ও প্রতীক পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। এছাড়া গ্রীসের মেসিডোনিয়া প্রদেশের সাথে নামের মিল থাকায় দেশটির নাম পরিবর্তনের

www.pathagar.com

জন্যও চাপ দেয়া হয় যা অবশ্য প্রত্যাখ্যাত হয়েছে প্রতিবেশী ক্ষুদ্রতর যুগোস্লাভিয়াও (সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো প্রজাতন্ত্র সমবায়ে গঠিত) মেসিডোনিয়ার জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে। তাই দেশটির সীমান্তে জাতিসংঘের সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। দেশটির অভ্যন্তরে গ্রীক ও আলবেনীয় বংশোদ্ভুতদের মধ্যেও পারস্পরিক বৈরিতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আলবেনীয় বংশোদ্ভুতদেরকে দেশ ত্যাগ করে আলবেনিয়ায় চলে যেতে উৎসাহিত করা এবং গ্রীক বংশোদ্ভুতদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করা।

## ইরিত্রিয়া:

মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ ইথিওপিয়ার খৃস্টীয় রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে ইরিত্রিয়ার মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য লাভ করে। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ তিরিশ বছরে এক লাখ ৬০ হাজার লোক এ মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারায়।[২০] এদের প্রায় সকলেই মুসলমান। শেষ পর্যায়ে এ মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা সহায়তা করে।

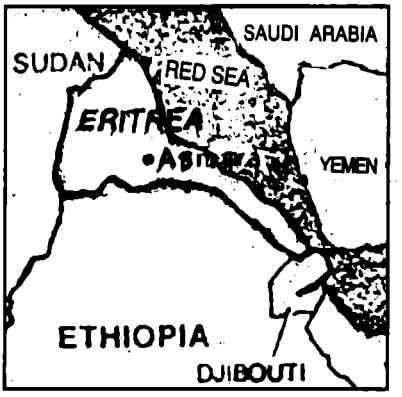


ইথিওপিয়ার ডিক্টেটর মেঙ্গিসতু হাইলে মরিয়মের উৎখাতের পর ইথিওপিয়ায় জনপ্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে ফেডারেল ব্যবস্থাই যথেষ্ট ছিল। ইরিত্রিয়ার স্বাধীন দেশে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তা সত্ত্বেও ইরিত্রিয়া স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এর শাসনক্ষমতা চলে গেছে খৃস্টানদের হাতে। খৃস্টান প্রেসিডেন্ট ইসাইয়াস আফেওয়ের্কী ক্ষমতায় এসেই গোত্র ও ধর্মভিত্তিক দল গঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কথা বলেন এবং ইসরাইল সফর করেন।

ইতিমধ্যেই ইরিত্রিয়া ইয়েমেনের দ্বীপ দখল করে তার সাথে যুদ্ধ করেছে, সূদানের সরকারবিরোধীদের সাহায্য দিয়েছে, ইথিওপিয়ার সাথেও দুই দফা যুদ্ধ করেছে এবং জিবুতির সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেছে। এভাবে ইরিত্রিয়া সরকার ইরিত্রিয়ার মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারীদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে।

## চেচ্‌নিয়া (ইচ্‌কেরিয়া)

চেচ্‌নিয়া হচ্ছে রুশ ফেডারেশনের সর্ব দক্ষিণাঞ্চলীয় এবং কাফকায পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র।

www.pathagar.com

চেচেন্ ও ইঙ্গুশ্ত্ নামে দু'টি অঞ্চল নিয়ে ১৯৩৬ সালে একটি স্বায়ত্তশাসিত জাতিগত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[২১] এর আয়তন ১৯ হাজার ৩০০ বর্গকিলোমিটার এবং ১৯৯১-র শেষ নাগাদ জনসংখ্যা ছিল পনর লাখ। জনসংখ্যার সকলেই মুসলমান।[২২]

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রুশ ফেডারেশনের আওতাভুক্ত ২২টি স্বায়ত্তশাসিত জাতিগত প্রজতান্ত্র এবং ৬৬টি জাতিগত অঞ্চল ও এলাকার নেতাদের সাথে রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন এক ইউনিয়ন-চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এতে জাতিগত প্রজাতন্ত্রসমূহের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়। কিন্তু খুব শীঘ্রই ইয়েলৎসিন এসব প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চলের সাথে প্রভুসুলভ আচরণ শুরু করেন। এমতাবস্থায় চেচেন-ইঙ্গুশ্ত্ প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু পরে ইঙ্গুশ্ত্ এলাকা ইঙ্গুশ্তিয়া নাম গ্রহণ করে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি জাতিগত অঞ্চল হিসেবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়; তবে স্বায়ত্তশাসন দাবী করতে থাকে। অন্যদিকে চেচনিয়া স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

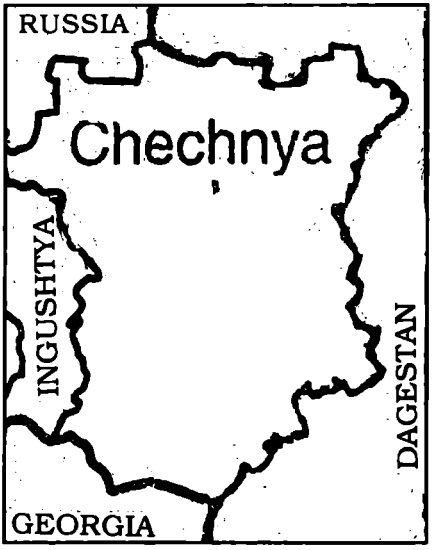


১৯৯১ সালে চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণাকালে সোভিয়েত বিমানবাহিনীর সাবেক জেনারেল জওহর দুদায়েভ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।[২৩] রুশ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট বোরিস ইয়েলৎসিন এর জবাবে চেচনিয়া দখলের জন্য সৈন্য পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পার্লামেন্টের বাধার মুখে এতে সফল হন নি। তবে দেশটির বিরুদ্ধে রুশ ফেডারেশনের অবরোধ চলতে থাকে। তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা করে চেচনিয়া ভালভাবেই অগ্রসর হতে থাকে।

অচিরেই চেচনিয়ার রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ দ্বন্দ্বে রাশিয়া দুদায়েভ-বিরোধীদের সহায়তা করে। শেষ পর্যন্ত সংঘাত বন্ধের নাম করে ১৯৯৪-এর ডিসেম্বরে রুশ বাহিনী চেচনিয়ায় প্রবেশ করে। চেচেনরা সর্বশক্তিতে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। এ যুদ্ধ স্মরণকালের ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ যুদ্ধরূপে প্রমাণিত হয়। এতে লক্ষাধিক বেসামরিক চেচেন ও চার সহস্রাধিক চেচেন মুজাহিদ শহীদ হন। অবশ্য কোন কোন সূত্রে[২৪] মোট নিহতের সংখ্যা ৮০ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রুশ পক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী ২ হাজার এবং মুজাহিদদের দাবী অনুযায়ী ২০ সহস্রাধিক রুশ সেনা নিহত হয়। এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট দুদায়েভ রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের

www.pathagar.com

হামলার শিকার হয়ে শাহাদৎ বরণ করেন। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া পরাজয় মানে এবং প্রেসিডেন্ট ইয়েল্‌ৎসিন ১৯৯৬-র ২৫শে নভেম্বর চেচনিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়ে ডিক্রী জারী করেন এবং দ্রুত সৈন্য প্রত্যাহার করেন।

১৯৯৭-র ২৭শে জানুয়ারী চেচনিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুদায়েভের অন্যতম সহকারী আসলান মাসখাদভ নির্বাচিত হন। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আসলান মাসখাদভের সরকার চেচনিয়াকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে গণ্য করেন এবং চেচনিয়ার নাম পরিবর্তন করে ইচকেরিয়া রাখেন। কার্যতঃ সেখানে রাশিয়ার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু রাশিয়া স্বীকৃতি না দেয়ায় বিশ্বের কোন দেশ চেচনিয়াকে স্বীকৃতি দেয় নি।

রাশিয়া চেচনিয়াকে স্বীকৃতি না দিলেও চেচনিয়ার অভ্যন্তরে রাশিয়ার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এভাবে দেড় বছরের অধিক অতিবাহিত হয়। কিন্তু একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাশিয়া পুনরায় চেচনিয়ায় সামরিক আগ্রাসন চালায়।

১৯৯৯-র ৭ই আগস্ট চেচনিয়া থেকে এক হাজার বেসরকারী ইসলামী গেরিলা যোদ্ধা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পার্শ্ববর্তী দাগেস্তান প্রজাতন্ত্রে (রাশিয়াভুক্ত) প্রবেশ করে এবং কয়েকটি গ্রাম দখল করে সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। এছাড়া তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের ঘোষণা দেয়। রাশিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী, এরা ওহাবী ফির্কার অনুসারী। রাশিয়া সর্বাত্মক সামরিক হামলা চালিয়ে তাদেরকে চেচনিয়ায় পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে এবং তাদেরকে দমনের বাহানায় চেচনিয়ায় হামলা চালায়। ফলে রুশ ও চেচেন বাহিনীর মধ্যে নতুন করে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৯৯) রুশ বাহিনী চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনী দখল করে নিতে সক্ষম হয়। কিন্ত চেচেনদের গেরিলা অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এক রিপোর্ট অনুযায়ী গত ১৪ই মে (২০০০) চেচেন প্রেসিডেন্ট মাসখাদভ এই দ্বিতীয় যুদ্ধে আট মাসে মোট ৪০ হাজারের বেশী বেসামরিক চেচেন নাগরিক ও দেড় হাজার চেচেন সৈন্য শহীদ হবার কথা উল্লেখ করেছেন।[২৫]

চেচনিয়ার (ইঙ্গুশতিয়া বাদে) জনসংখ্যা ১৯৯২ সালে ছিল ১১লাখ।[২৬] শতাব্দীশেষে অন্যূন ১৩ লাখে দাঁড়াবার সম্ভাবনা।

জর্জিয়ার উত্তরে এবং কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগর থেকে প্রায় সমান দুরত্বে রুশ ভূখন্ড দ্বারা সমুদ্র উপকূল থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও চেচনিয়া তেলসম্পদে সমৃদ্ধ। এছাড়া রাশিয়ার তেল পাইপলাইন চেচনিয়ার ওপর দিয়ে গেছে। তাই স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে চেচনিয়া খুব সহজেই একটি স্বচ্ছল দেশে পরিণত হতে পারবে। তবে তার স্বাধীনতার স্বীকৃতির প্রয়োজন।

www.pathagar.com

## আব্‌খাযিয়া

কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী ক্ষুদ্র জাতিগত প্রজাতন্ত্র আবখাযিয়া; রাজধানী সুখুমী। ১৯৯২ সালে জনসংখ্যা ছিল ৮ লাখ ১২ হাজার। মুসলিম-খৃষ্টান অনুপাত সম্বন্ধে অকাট্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আবখায বংশোদ্ভুত মুসলমানদের সেখানে সংখ্যাধিক্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অধিবাসীদের মধ্যে আড়াই লাখ জর্জীয় বংশোদ্ভুত।

সোভিয়েত শাসনামলে আবখাযিয়া জাতিগত প্রজাতন্ত্র হিসেবে জর্জিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হবার পর আবখাযিয়া জর্জিয়ার সাথে কোন সংযুক্তি বিষয়ক চুক্তি করে নি। বরং ১৯৯২ সালে আবখাযিয়ার সরকার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় জর্জিয়া সেখানে সৈন্য পাঠালে যুদ্ধ বেধে যায়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জর্জিয়া পরাজিত হয় এবং ১৯৯৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর সুখুমী মুক্ত হবার মধ্য দিয়ে আবখাযিয়া কার্যতঃ স্বাধীন হয়। এমতাবস্থায় রুশ সেনাবাহিনী শান্তিরক্ষাবাহিনী হিসেবে দু'পক্ষের মাঝখানে অবস্থান নেয় এবং সুখুমী থেকে বিতাড়িত জর্জীয়দের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে চুক্তি হয়।

আবখাযিয়া কার্যতঃ স্বাধীন। কিন্তু জর্জিয়া স্বীকৃতি না দেয়ায় বিশ্বের অন্য কোন দেশ এখনো আবখাযিয়াকে স্বীকৃতি দেয় নি।

# অন্যান্য মুসলিম দেশ

বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের মধ্যে যেগুলো বিভিন্ন কারণে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী বা দৃষ্টি আকর্ষণকারী এখানে সেগুলোর ওপরে অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

## আফগানিস্তান

পাকিস্তান ও ইরানের প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তান। দীর্ঘ একদশককাল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সোভিয়েত দখল ও কম্যুনিষ্ট শাসনের অবসান ঘটানোর পর দেশটি এখন গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। (এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) দেশটির শতকরা ৯০ ভাগ এলাকা তালেবানের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও তালেবান সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

## আলজেরিয়া

আফ্রিকা মহাদেশের তেলসমৃদ্ধ দেশ আলজেরিয়া। দেশটির রয়েছে উজ্জল অতীত ঐতিহ্য। ইসলামী হুকুমতের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবার পর পশ্চিমা ষড়যন্ত্রে সেখানে নতুন করে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে দেশটিতে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলছে। (এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) তেল রফতানীকারক এ দেশটি গৃহযুদ্ধর ফলে বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। ১৯৯৫-এর শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ হাজার ১৩০ কোটি ডলার।[২৭]

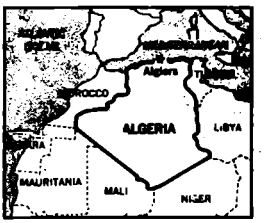


## সোমালিয়া

পূর্ব আফ্রিকান দেশ সোমালিয়া। দেশটি লোহিতসাগর, ওমান উপসাগর ও ভারত মহাসাগরে সুদীর্ঘ উপকূলের অধিকারী। আফ্রিকান শৃঙ্গ নামে পরিচিত এ দেশটির কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। বিগত কয়েক বছর যাবত সেখানে গৃহযুদ্ধ চলে এবং জাতিসংঘের নামে মার্কিন হস্তক্ষেপ চলে। ( পরে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) এখন কার্যতঃ সেখানে দ্বৈতশাসন চলছে।

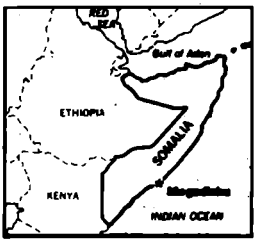


## মরোক্কো

আফ্রিকান দেশ মরোক্কো একটি রাজতান্ত্রিক দেশ। মরোক্কো সরকার পশ্চিমা তাবেদার ও ইসরাইলের সাথে আরবদের আপোষরফার প্রবক্তা। বাদশাহ্ দ্বিতীয় হাসান ১৯৯৯-র জুলাই মাসে মারা যান। নতুন বাদশাহ্ মোহাম্মদ মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মরোক্কো তার প্রতিবেশী দেশ পশ্চিম সাহারাকে দখল করে রেখেছে। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় এ বিরোধের সমাধানের চেষ্টা চলছে। বহির্বিশ্বে মরোক্কোর কোন ভূমিকা নেই।

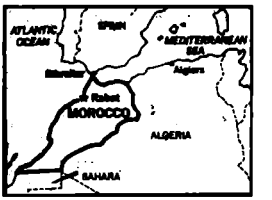


## ইয়েমেন

ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র সউদী আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। দেশটি কিছুদিন আগে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। পরে ১৯৯০ সালে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু উত্তর ইয়েমেন দক্ষিণ

www.pathagar.com

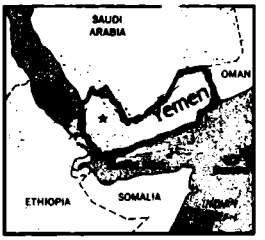


ইয়েমেনকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করছে—এ মর্মে অভিযোগ তুলে ১৯৯৪-এর এপ্রিলে দক্ষিণ ইয়েমেন পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে হাজার হাজার লোক নিহত ও শত শত কোটি ডলারের সম্পদ ধ্বংস হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৪-এর ৭ই জুলাই উত্তরের হাতে দক্ষিণের পতন ঘটলে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। উত্তরের নেতা আলী আবদুল্লাহ্ সালেহ্ দেশটির সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট।

## জর্দান

যায়নবাদীদের দ্বারা অধিকৃত ফিলিস্তিনের সাথে দীর্ঘতম সীমান্তের অধিকারী দেশ

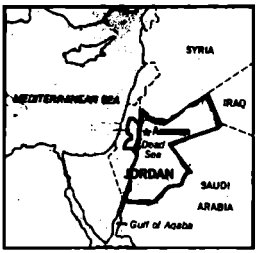


জর্দান। দেশটির জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই ফিলিস্তিনী। জর্দানের সরকার রাজতান্ত্রিক ও মার্কিন তাবেদার। পরলোকগত বাদশাহ্ হোসেন ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার অন্যতম প্রধান তল্পীবাহক। ইতিমধ্যেই দেশটির সরকার যায়নবাদী ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। হোসেনের পুত্র বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্ও একই ধারায় অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু জর্দানের জনগণ ইসরাইলের সাথে আপোষের বিরোধী।

## আরব আমিরাত

দুবাই ও আবু যাবী সহ আটটি আমীর-শাসিত এলাকা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম তেলসমৃদ্ধ ধনী দেশ সংযুক্ত আরব আমীরাত (ইউএই) গঠিত। আয়তন ৮৩,৬০০

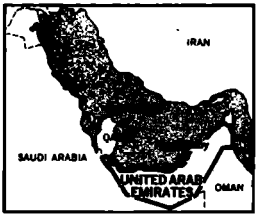


বর্গকিলোমিটার। শতাব্দীশেষে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৩২ লাখে। জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশী শ্রমিক ও পেশাজীবী। আবু যাবীর আমীর শেখ যায়েদ বিন সুলতান আন্‌নাহিয়ান পারস্য উসাগরীয় এ দেশটির প্রেসিডেন্ট।

ইউএই মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম তেলসমৃদ্ধ ধনী দেশ। আভ্যন্তরীণ অবস্থা মোটামুটি স্থিতিশীল। তবে বহির্বিশ্বে প্রভাব নেই।

## কুয়েত

পারস্য উসাগরীয় আমীর-শাসিত তেলসমৃদ্ধ দেশ কুয়েত। দেশটির শাসকগোষ্ঠী সব সময়ই আমেরিকার তাবেদার। ইরানের বিরুদ্ধে ইরাকের যুদ্ধে এ দেশটি ইরাককে

www.pathagar.com

পানির মত অঢেল অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছিল। কিন্তু পরে ইরাক দেশটিকে দখল করে নিলে আমেরিকার নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনী তাকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসে। সাড়ে তিন হাজার কোটি ডলার যুদ্ধের খরচ মিটিয়ে কুয়েত ঘাটতি বাজেটের দেশে পরিণত হয়।[২৮] তাছাড়া দেশটি তার বুবিয়ান দ্বীপকে সামরিক ঘাঁটি তৈরীর জন্য আমেরিকার হাতে সোপর্দ করেছে যা ইরান ও ইরাকের জন্যে হুমকি সৃষ্টি করেছে।

## ওমান

আরব সাগর (অন্য নাম ওমান সাগর)-এর তীরে অবস্থিত তেলসমৃদ্ধ ওমান একটি সুলতান-শাসিত আরব দেশ। শতাব্দীশেষে জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২৭ লাখে। ওমানের শাসকের নাম সুলতান কাবুস। সুদীর্ঘ সমুদ্র উপকূলের অধিকারী এ দেশটি সামরিক শক্তিতে, বিশেষতঃ নৌশক্তিতে, মোটামুটি অগ্রসর। কিন্তু বাইরে কোন প্রভাব নেই।

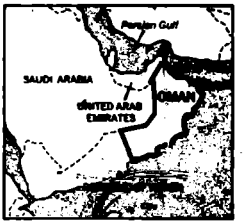


## তুর্কী সাইপ্রাস

তুরস্কের পাশে ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপ সাইপ্রাস। আয়তন ৯ হাজার ২৫১ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় সোয়া সাত লাখ; তুর্কী বংশোদ্ভুত মুসলমান শতকরা ২০ ভাগ[২৯]; বর্তমানে ১ লাখ ৫৬ হাজার। বাকী ৮০ ভাগ গ্রীক খৃস্টান।

১৯৬০ সালে স্বাধীন হবার পূর্বে সাইপ্রাস বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল। খৃস্টানরা গ্রীসের সাথে যোগদানের পক্ষপাতী ছিল। তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে দীর্ঘ বিরোধের কারণে গ্রীসের জনগণ ইউরোপের মধ্যে মুসলিম-বিদ্বেষের জন্যে বিশেষভাবে পরিচিত। তাই সাইপ্রাসের তুর্কী মুসলমানরা গ্রীসে যোগদানের ঘোরতর বিরোধিতা করে। এ কারণে সাইপ্রাসবাসীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের উপক্রম হয়। গৃহযুদ্ধ এড়ানোর লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে এক আপোষ-ফর্মুলা উদ্ভাবিত হয়। তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৬০ সালে সাইপ্রাস স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট গ্রীক খৃস্টানদের দ্বারা ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট তুর্কী মুসলমানদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

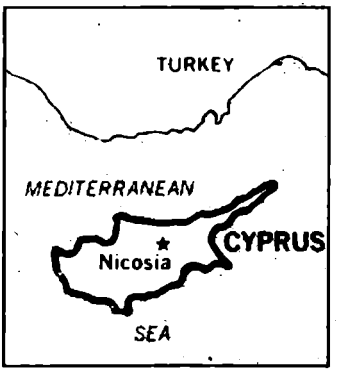


www.pathagar.com

এভাবে সাইপ্রাস স্বাধীন দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ১৯৬৩ সালে গ্রীক ও তুর্কী বংশোদ্ভুতদের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে এবং গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ১৯৬৪ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রেরণ করে যারা উত্তর সাইপ্রাসের তুর্কী ও দক্ষিণ সাইপ্রাসের গ্রীকদের মাঝ বরাবর অবস্থান গ্রহণ করে। এ সত্ত্বেও দুই জাতির মধ্যে বিরোধ অব্যাহত থাকে।

এমতাবস্থায় তুরস্ক ১৯৭৪ সালে তুর্কী সাইপ্রিয়টদের সাহায্যের জন্যে সেনাবাহিনী পাঠায় এবং উত্তর সাইপ্রাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তুরস্কের সহায়তায় তুর্কী সাইপ্রিয়টরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু তাদের এ স্বাধীনতার ঘোষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে নি। এমন কি মুসলিম দেশসমূহের স্বীকৃতিও পায় নি। কারণ, তুর্কী বাহিনী প্রত্যাহার করা হলে তুর্কী সাইপ্রাসের পক্ষে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। তাই কার্যতঃ তুর্কী সাইপ্রাসকে বর্তমানে তুরস্কের অঘোষিত অংশ বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনগত বাধার কারণে তুরস্কের পক্ষে তুর্কী সাইপ্রাসকে তুরস্কভুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

সমস্যাটি সমাধানের জন্য ১৯৭৪ সাল থেকেই জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় আলোচনা চলছে, কিন্তু এখনো সমাধান হয় নি। তবে কার্যতঃ তুর্কী সাইপ্রাস তুরস্কের ছত্রছায়াধীন স্বাধীন দেশ হিসেবেই চলছে।

অতি সম্প্রতি, কনফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় আলোচনা করতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই সম্মত হয়েছে।

## তাঞ্জানিয়া

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের তাঞ্জানিয়ার মুসলমানগণ। টাঙ্গানাইকা ও যাঙ্গেবার নামে দু'টি প্রজাতন্ত্র নিয়ে দেশটি গঠিত। রাজধানী দারুসসালাম। বিভিন্ন সূত্রে এ দেশটিতে মুসলিম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগ, ৫০ ভাগ, ৫৫ ভাগ ও ৭৮ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য দ্বীপ-প্রজাতন্ত্র যাঙ্গেবারের জনসংখ্যার শতকরা ৯৮ ভাগই মুসলমান। তবে প্রধানতঃ খৃস্টান নেতৃত্বাধীন কঠোর সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার কারণে দেশটিকে খৃস্টানপ্রধান দেশ বলে মনে করা হয়।

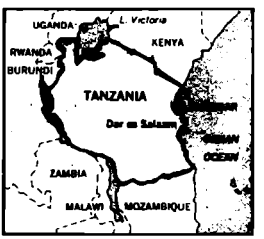


তাঞ্জানিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ারেরে ছিলেন আফ্রিকার খ্যাতনামা ও শক্তিমান শাসনকর্তাদের অন্যতম।

www.pathagar.com

তাঞ্জানিয়ার মুসলমানরা অর্থনৈতিক দিক থেকে মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে এবং সেক্যুলার শাসনব্যবস্থায় যতখানি সম্ভব ততখানি ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে। তবে সম্প্রতি যাঙ্গেবার প্রজাতন্ত্রের সরকার হিজাবের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। এছাড়া তাঞ্জানিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার জাঙ্গেবারকে ওআইসি-র সদস্য হবার অনুমতি দেয় নি।

তাঞ্জানিয়ার মুসলমানরা সেক্যুলার সংবিধানের অধীনে রাজনৈতিক তৎপরতায় এবং সরকারে অংশ নিচ্ছে। আলী হোসেন মুঈনী ছিলেন দেশটির অন্যতম স্বনামখ্যাত প্রেসিডেন্ট।

## সিয়েরা লিওন

পশ্চিম আফ্রিকার একটি ছোট মুসলিম দেশ সিয়েরা লিওন। আয়তন ৭২ হাজার ৩২৫ বর্গকিলোমিটার। শতাব্দীশেষে জনসংখ্যা সাড়ে ৫১ লাখে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলিত হয়েছে। দেশটি ছোট হলেও আটলান্টিক মহাসাগরে ৪০২ কিলোমিটার উপকূলের অধিকারী বিধায় কৌশলগত গুরুত্বের অধিকারী।

সিয়েরা লিওনে বিগত ৯ বছর যাবত গৃহযুদ্ধ চলছে। ১৯৯৯-র ৭ই জুলাই প্রেসিডেন্ট আহমদ তেজান কাব্বাহ্ ও তাঁর প্রতিপক্ষ বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট নেতা ফোদাই সান্‌কোহ্ যুদ্ধাবসানের লক্ষ্যে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অবশ্য তিন বছর আগেও একবার শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকর হয় নি। এ পর্যন্ত দেশটির গৃহযুদ্ধে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে।

১৯৯৯-র ৭ই জুলাইর শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একই বছর অক্টোবরে ও তার পরে জাতিসংঘ সিয়েরা লিওনে ৯ হাজার শান্তিরক্ষী সৈন্য পাঠায়। কিন্তু ফোদাই সাঙ্কোহ্ অভিযোগ করেন যে, জাতিসংঘ বাহিনী শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের নামে সরকারের পক্ষাবলম্বন করে তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় সাঙ্কোহ্‌র অনুসারীরা জাতিসংঘের ৫০০ সৈন্যকে পণবন্দী করে এবং ৭ই মে (২০০০) রাজধানী ফ্রিটাউন অভিমুখে অভিযান চালায়। ফলে সরকারী ও জাতিসংঘ সৈন্যদের সাথে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। অবশ্য ১৭ই মে সাঙ্কোহ্ গ্রেফতার হন। এমতাবস্থায় তাঁর অনুসারীরা পর্যায়ক্রমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী সৈন্যদের মুক্তি দিতে শুরু করে এবং উভয় পক্ষই নতুন একটি শান্তিচুক্তি

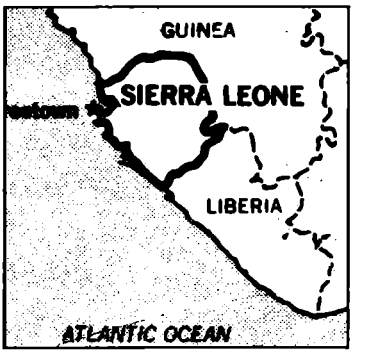


www.pathagar.com

সম্পাদনের জন্যে প্রস্তুতি ও শর্তাবলী ঘোষণা করে। সাঙ্কোহ্‌র অনুসারীরা তাঁর বিচার না করার শর্ত আরোপ করে।

যেহেতু সাঙ্কোহ্‌র বিদ্রোহী বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী এবং দেশের বৃহত্তম হীরক উৎপাদন এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে, তাই তাদেরকে কোনরূপ ছাড় না দিয়ে সিয়েরা লিওনে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা চলে না।

## ব্রুনাই

মুসলিম বিশ্বের ক্ষুদ্র দেশসমূহের অন্যতম ব্রুনাই। বোর্নিও দ্বীপের এক প্রান্তে অবস্থিত এ দেশটির আয়তন মাত্র ৫,৭৬৫ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা শতাব্দীশেষে

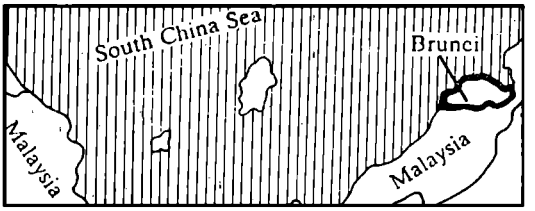


তিন লাখ ১৭ হাজারে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলিত হয়েছে। তবে দেশটি তেলসম্পদে সমৃদ্ধ। অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদও রয়েছে। ব্রুনাইর সুলতান হাসান আল্‌বালখিয়াহ্‌ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ধনীদের অন্যতম। কিন্তু জনসংখ্যাস্বল্পতা ও রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বে ব্রুনাইর তেমন গুরুত্ব নেই। তবে অনেক বাংলাদেশী সেখানে চাকরি করছে।

## আলবেনিয়া

আড্রিয়াটিক সাগরের তীরবর্তী আলবেনিয়া আশির দশকের শেষ পর্যন্ত ছিল

ইউরোপের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ। দেশটি অত্যন্ত ছোট; আয়তন মাত্র ২৭ হাজার ৭৪৮ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা শতাব্দীশেষে প্রায় ৩৩ লাখে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলিত হয়েছে।

আলবেনিয়া ছিল স্তালিনীয় ধারার একমাত্র কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র। দেশটির নেতা আনোয়ার হোজ্জা কঠোর রুদ্ধদ্বার নীতি অনুসরণ করে দেশ চালাতেন। তাঁর উত্তরসূরি রমিজ আলিয়াও সে ধারা অব্যাহত রাখেন।

নব্বই-এর দশকের শুরুতে কম্যুনিজমের পতনের পর দেশটি পুরোপুরি পাশ্চাত্য-নিয়ন্ত্রিত দেশে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

## মালদ্বীপ

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র মালদ্বীপ। দেশটির আয়তন মাত্র ২৯৮ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা শতাব্দীশেষে ২ লাখ ৯১ হাজারে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কা থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রবাল দ্বীপপুঞ্জের এ দেশটি সার্কের সদস্য। দেশটির সরকার ভারতের প্রভাবাধীন। মামুন আবদুল কাইউম ১৯৭৮ সাল থেকে দেশটির প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

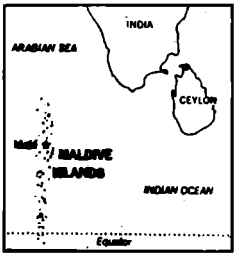


## তিউনিসিয়া

আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দেশ তিউনিসিয়া। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিগত প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল যাবত সেখানে ডিক্টেটরী স্বৈরশাসন চলছে। প্রেসিডেন্ট যয়নুল আবেদীন বিন্ আলীর সরকার আফ্রিকার নিষ্ঠুর নিপীড়ক সরকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশেষ করে ইসলামী শক্তিকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করছেন। স্বৈরশাসনকে গণতন্ত্রের লেবাস পরানোর জন্য তিনি ১৯৮৯ সালের ২রা এপ্রিল বহুদলীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী দলের কারচুপি সত্ত্বেও ইসলামী দল আন্নাহ্দাহ্ এতে শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ভোট পায়। এমতাবস্থায় তিনি আননাহ্দাহ্কে বেআইনী ঘোষণা করেন।

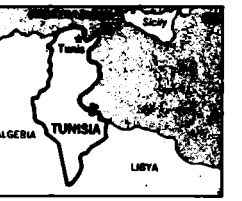


## নাইজার

আয়তনের বিচারে মুসলিম বিশ্বের নবম বৃহত্তম দেশ নাইজার। এ আফ্রিকান দেশটির আয়াতন ১২ লাখ ৬৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা শতাব্দীশেষে এক কোটি ৮ লাখে দাঁড়াবে। দেশটি ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ১৯৭৪ সাল থেকে সামরিক স্বৈরশাসন চলছে। একাধিকবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে ও ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। জনসাধারণ ইসলামী শরীআতের সমর্থক। ১৯৯৬-র শুরু থেকে ক্ষমতাসীন সামরিক প্রেসিডেন্ট ইবরাহীম মঈনসারাহ্ নিজেকে ইসলামের সমর্থক বলে দাবী করে থাকেন।

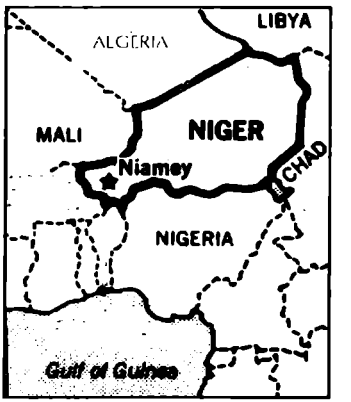


www.pathagar.com

## সেনেগাল

আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী আফ্রিকান মুসলিম দেশ সেনেগাল। দেশটির

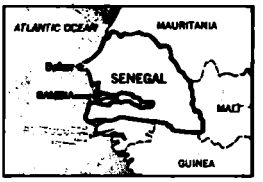


আয়তন ১ লাখ ৯৬ হাজার ১৯২ বর্গকিলোমটার। শতাব্দীশেষে জনসংখ্যা ৯৫ লাখে দাঁড়াবে। দেশটি ছোট হলেও ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র প্রথম মহাসচিব আহ্মাদু করীম জায়ে এবং দেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবদু দিউফের কারণে বিশ্বে সেনেগালের বেশ পরিচিতি ছিল। বর্তমানে সে পরিচিতি ও গুরুত্ব হারিয়ে গেছে।

## উগান্ডা

আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দেশ উগান্ডা। দেশটির জনসংখ্যার কত ভাগ মুসলমান সে ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। তবে দেশটি ওআইসি-র সদস্য। এক সময়

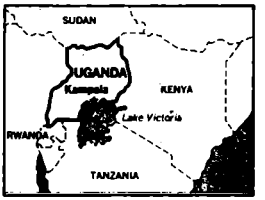


উগান্ডার মুসলিম প্রেসিডেন্ট ইদি আমীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা পালন করে, বিশেষতঃ বৃটিশদের অপমান করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য থেকে দুর্নীতির অভিযোগসহ বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হয়। তিনি ১৯৭১ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর পূর্বে ও পরে খৃস্টানরাই ক্ষমতায়। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইউরি মুসেভিনী ১৯৯৩ সালে সকল রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

## আইভরি কোস্ট

অতি সম্প্রতি আফ্রিকান দেশ আইভরি কোস্টের নাম বহুবার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-শিরোনাম হয়েছে। ওআইসি-র সদস্য-দেশ আইভরি কোস্টের জনসংখ্যা ২০০০ সালের শেষে ১ কোটি ৬৪ লাখে দাঁড়াবে। গজদন্ত (ivory) দেশটির অন্যতম প্রধান অর্থকরী রপ্তানী-পণ্য বিধায় দেশটির এ নামকরণ করা হয়েছে। এখানকার জনসংখ্যার শতকরা

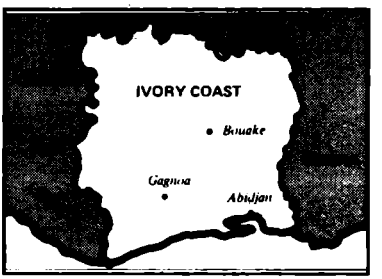


৫০ ভাগ মুসলমান। কিন্তু বর্তমানে শাসনক্ষমতা খৃস্টানদের হাতে।

গত ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৯৯) আইভরি কোস্টের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল রবার্ট গুই সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হেনরি কোনান বেদীকে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

কোনান বেদীকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করেন। তাছাড়া দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছিল এবং জাতিগত উত্তেজনা ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। একারণে বাইরের দেশগুলো নিন্দা করলেও বিরোধী দল ও সাধারণ জনগণ এ অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানায়।

জেনারেল গুই একটি অন্তর্বর্তীকালীন গণমুক্তি পরিষদ গঠন করেছেন এবং দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করে আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর, ২৯শে অক্টোবর ও ১৯শে নভেম্বর (২০০০) যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্ট ও পৌরসভাসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন।

## অন্যান্য দেশ

মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে পারস্য উপসাগরে অবস্থিত আমীর-শাসিত কাতার ও বাহরাইন।

পশ্চিম সাহারা এখনো তার স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। কারণ, দেশটির বেশীরভাগ এলাকার ওপর মরোক্কোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। (এসম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

আফ্রিকান দেশ শাদে ফ্রান্স ও লিবিয়ার প্রভাবে দীর্ঘদিন গৃহযুদ্ধ চলেছে যা মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে গেলেও আবার প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে। (এ সম্পর্কে পর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

এছাড়া আফ্রিকা মহাদেশে বুরকিনা ফাসো, জিবুতি, বেনিন, গ্যাবন, গিনি, গিনি বিসাউ, ক্যামেরুন, কমোরো, মালি, মাওরিতানিয়া, গাম্বিয়া, প্রভৃতি মুসলিম-প্রধান দেশ। বহির্বিশ্বে এসব দেশের কোন ভূমিকা নেই; পরিচিতিও কম।

## পাদটীকা ঃ

১) অত্র অধ্যায়ের পরবর্তী আলোচনাসমূহ বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্রপত্রিকার কয়েক দশকব্যাপী অধ্যয়নের ওপর ভিত্তিশীল। এখানে কেবল ন্যূনতম সাধারণ তথ্যই তুলে ধরা হয়েছে। তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র, বিশেষতঃ বিতর্কিত হতে পারে এমন প্রসঙ্গ ব্যতীত তথ্যসূত্র উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি।

২) Crescent International : 16—31 March, 1997

৩) সারা ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৩ ভাগ।

৪) " ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৩ ভাগ চীনা বংশোদ্ভূত। অথচ এদের হাতে রয়েছে দেশের মোট সম্পদের চার ভাগের তিন ভাগ।" (ইত্তেফাক ঃ ২৪-৫-১৯৯৭) অন্যদিকে "সুহার্তো পরিবার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী পরিবারগুলোর অন্যতম। কয়েকটি হিসাব মতে, এই পরিবারের বিত্তের পরিমাণ ৪ হাজার কোটি ডলার।" (এএফপি/রয়টার/বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ২২-৫-১৯৯৮)

www.pathagar.com

৫) রয়টার/ইত্তেফাক ঃ ১০-৭-১৯৯৯

৬) এপি/ইনকিলাব ঃ ১০-৭-১৯৯৯

৭) এপি/ইনকিলাব ঃ ২২-৬-১৯৯৯

৮) کشورهای جهان

৯) گیتاشناسی کشورها

১০) প্রাগুক্ত। অবশ্য সূত্রে শতকরা হার উল্লেখ নেই, বরং দুই তৃতীয়াংশ শিয়া ও এক তৃতীয়াংশ সুন্নী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১) প্রাগুক্ত

১২) Asiaweek : 30-4-1999

১৩) گیتاشناسی کشورها

১৪) AP/Independent : 19-7-1999

১৫) Asiaweek : February 9, 1996

১৬) দিনকাল ঃ ২৪-৮-১৯৯৩

১৭) রয়টার/ইনকিলাব ঃ ১৭-৭-১৯৯৮

১৮) Newsweek : 3-2-1992

১৯) International Herald Tribune : 16—17 August 1993

২০) Newsweek/মিল্লাত ঃ ৩০-৪-১৯৯৩

২১) جمهوری اسلامی ঃ ১৮-১১-১৯৯৯

২২) প্রাগুক্ত ঃ ১১-১১-১৯৯১

২৩) Time : 15-3-1993

২৪) AFP/Financial Express : 12-8-1999

২৫) AFP/New Nation : 15-5-2000

২৬) Time : 15-3-1993

২৭) Tehran Times : 28-1-1996

২৮) Kayhan International : 8-4-1992

২৯) گیتاشناسی کشورها

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# মুসলিম জাহানে গৃহযুদ্ধ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ

মুসলিম জাহানের প্রতিটি গুরুতর সমস্যার মূল অনুসন্ধান করলেই তার পিছনে ইসলামের দুশমনদের সক্রিয় হস্তের সন্ধান মিলে। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্ যেসব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন তার মধ্যে গৃহযুদ্ধ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ অন্যতম। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা ও গৃহযুদ্ধ নিকট অতীতের ব্যাপার। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও পুরোপুরি অবসান ঘটে নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে।

আফগানিস্তানে ও আলজেরিয়ায় গৃহযুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। সোমালিয়ার গৃহযুদ্ধেরও পুরোপুরি অবসান হয় নি। বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও শাদের গৃহযুদ্ধ অবশ্য সমাপ্ত হয়েছে। তাজিকিস্তানের গৃহযুদ্ধ আপাততঃ সমাপ্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তবে বিরোধের চূড়ান্ত অবসান না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না। অন্যদিকে তুরস্ক, ইরাক, সূদান, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ রক্তক্ষয়ী বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার শিকার। ইতোমধ্যেই পূর্ব তাইমুর ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ইরিয়ান জায়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে ও আচেহ্ স্বাধীনতা দাবী করছে। আযারবাইজানের একটি ভূখণ্ড হাতছাড়া হয়ে গেছে। পাকিস্তানেও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বিদ্যমান। এছাড়া পশ্চিম সাহারায় মরোক্কোর জবরদখলের কারণে যুদ্ধ চলছে।

এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা ও গৃহযুদ্ধের মধ্যে কতগুলো সরাসরি ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে। এ পর্যায়ে রয়েছে সূদান, আযারবাইজান, সোমালিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, বাংলাদেশ (পার্বত্য চট্টগ্রাম) ও ইন্দোনেশিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী ও গৃহযুদ্ধ। এ সম্পর্কে আমরা 'মুসলিম বিশ্বে ক্রুসেডারদের ক্রুর থাবা' অধ্যায়ে আলোচনা করব। বাকী বিষয়গুলো সম্বন্ধে অত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।

## পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা

মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ পাকিস্তান। পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হবার কারণে দেশটির গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্র শত্রুদেশকে আগ্রাসন থেকে বিরত রাখতে সক্ষম, কিন্তু তা গৃহযুদ্ধ বা বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রতিরোধে সক্ষম নয়। তাই পাকিস্তানের সংহতির জন্য দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে।

পাকিস্তানে বর্তমানে কোন গৃহযুদ্ধ নেই বা আপাততঃ কোন বড় ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা চোখে পড়ছে না। কিন্তু এ ধরনের একটা প্রবণতা বহু পূর্ব থেকেই সেখানে লালন করা হচ্ছে। এ প্রবণতার জন্যে পাঞ্জাবীদের প্রাধান্য যেমন অনেকাংশে দায়ী, তেমনি ইসলামের দুশমনদের পরিকল্পনা তার চেয়েও বেশী দায়ী।

www.pathagar.com

সিন্ধু প্রদেশে জি,এম, সাঈদের নেতৃত্বে "জিয়ে সিন্দ" আন্দোলন খুব একটা সুবিধা করে উঠতে না পারলেও এ আন্দোলন পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় নি, বরং মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্যে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আছে। অনেক সময়ই মুহাজিরদের সাথে সিন্ধীদের সংঘর্ষ বাধে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনদের মধ্যে এক সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা প্রবল ছিল। এখানকার নেতা খান আবদুল গাফফার খান সীমান্ত প্রদেশকে আফগানিস্তানের সাথে একীভূত করে পাখতুনিস্তান গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। এখন অবশ্য এ প্রবণতা ঝিমিয়ে পড়েছে; তবে এর মৃত্যু ঘটে নি। বেলুচিস্তানেও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা রয়েছে।

ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর ইরানী ও পাকিস্তানী বেলুচিস্তানকে এ দুই দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বৃহত্তর বেলুচিস্তান গড়ার জন্যে মার্কিন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা চলে। তবে ইরান এ ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে পাকিস্তানী বেলুচিস্তানে নতুন করে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচার শুরু হয়। বেলুচ নেতা আকবর বুগতী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শোষণ-বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন যা হয়ত অমূলক নয়। তবে প্রচারের লক্ষ্য হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা।

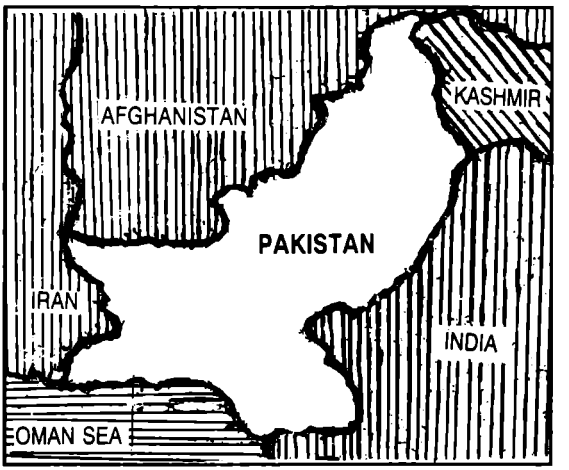


মুহাজির বনাম স্থানীয় দ্বন্দ্ব পাকিস্তানে, বিশেষ করে সিন্ধুতে একটি বড় ধরনের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। মুহাজিররা স্থানীয় মুসলমানদের সাথে একাত্ম হয়ে না গিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকায় তাদের পারস্পরিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে ও স্বার্থের দ্বন্দ্বে রূপ নিয়েছে। করাচীতে প্রায়ই মুহাজির বনাম স্থানীয় (সিন্ধী) দাঙ্গা সংঘটিত হচ্ছে।

মুহাজিররা করাচীকে একটি মুহাজির-প্রধান স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করতে চাচ্ছে যা স্থানীয়দের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। করাচীতে মুহাজিরদের নিজস্ব সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী রয়েছে। করাচীতে মুহাজির বনাম স্থানীয় দাঙ্গা ও আকস্মিক হামলার মাধ্যমে ঘটানো হত্যাকাণ্ডে এ পর্যন্ত হাজার হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে। শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

১৯৯৮ সালে সরকার সেখানে সামরিক শাসন জারী করে যদিও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পূর্ব থেকেই সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল।

এহেন একটি দেশে অবশ্যই শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজন। কিন্তু শক্তিশালী কেন্দ্রের জন্যে দেশব্যাপী অভিন্নভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব বা দল বর্তমানে পাকিস্তানে নেই। বরং প্রতিটি নেতা বা দলের প্রভাব দেশের এক এক অংশে সীমাবদ্ধ। ফলে দেশটিতে এক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিবর্তে কোয়ালিশন সরকার গঠন বা ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষণীয়।

এহেন একটি দেশে প্রেসিডেন্টের হাতে কিছু মৌলিক ক্ষমতা থাকা নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। যেমন ঃ সশস্ত্র বাহিনী, বিচারবিভাগ ও প্রচারমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ—যাতে সরকার বিরোধীদলসমূহের ওপর জুলুম করতে না পারে বা কোন প্রদেশ অন্য প্রদেশকে উপেক্ষা করতে না পারে। এ জন্যে অবশ্য প্রেসিডেন্টের দলনিরপেক্ষ হওয়া অপরিহার্য। তেমনি তিনি যাতে যখন খুশী পার্লামেন্ট বাতিল করতে না পারেন তার বিধান থাকাও প্রয়োজন।

অবশ্য পাকিস্তানের সংবিধানে ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্টের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল এবং ঐতিহ্যগতভাবে সেনাবাহিনীর কিছুটা স্বাধীন ভূমিকা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো 'ক্ষমতা পেলে সর্বময় ক্ষমতা ভোগের' মানসিকতা পোষণ করায় এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করার কথা বলে। অতঃপর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফ সংবিধান সংশোধন করে প্রেসিডেন্টের সকল ক্ষমতা কেড়ে নেন। সেই সাথে বিচারবিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনীর ওপরও প্রধানমন্ত্রীর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে একদিকে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রচারণা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এ বাড়াবাড়িই নওযায শরীফের পতন ডেকে আনে।

## ইরানকে বিভক্ত করার মার্কিন পরিকল্পনা

ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর ইরানের শক্তি ও সম্ভাবনাকে খর্ব করার লক্ষ্যে আমেরিকা দেশটিকে টুকুরো টুকরো করার সিদ্ধান্ত নেয়। মার্কিন ষড়যন্ত্রের ফলে প্রথমেই পশ্চিম ইরানের কুর্দিস্তান প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আমেরিকার নির্দেশে ইরাকের নেতা সাদ্দাম হোসেনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ইরানের কুর্দিশ ডেমোক্রেটিক পার্টি (কেডিপি) প্রদেশটির স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এরপর ইরানের বেলুচিস্তানেও বিদ্রোহ সৃষ্টি করা হয় এবং প্রদেশটিকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের সাথে যুক্ত করে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইসলামী ইরান সহজেই উভয় ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা ও বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়।

এরপর আমেরিকা ইরাকের মাধ্যমে ইরানের ওপর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। ইরাক প্রথম ধাক্কায়ই পশ্চিম ইরানের আরবীভাষী অধিবাসী অধ্যুষিত খুযিস্তান প্রদেশ

www.pathagar.com

দখল করে নেয় এবং প্রদেশটির নাম 'আরাবিস্তান' (আরবভূমি) রাখে। অবশ্য ইরাক প্রদেশটির জনগণের মধ্যে সমর্থক সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। ফলে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইরাকী বাহিনী খুযিস্তান থেকে পশ্চাদপসরণ করার পর প্রদেশটিতে তথাকথিত আরাবিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আর কোন গৃহযুদ্ধ দানা বেঁধে ওঠে নি।

এছাড়া যেসব জুলুম-বঞ্চনার ওপর ভিত্তি করে কুর্দিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ইসলামী হুকুমতে তার অবসান ঘটায় কুর্দিস্তান প্রদেশের জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদেরও অনেকেই পরে সরকারের সাথে সমঝোতাক্রমে দেশে ফিরে আসেন। এভাবে ইরানী কুর্দিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।

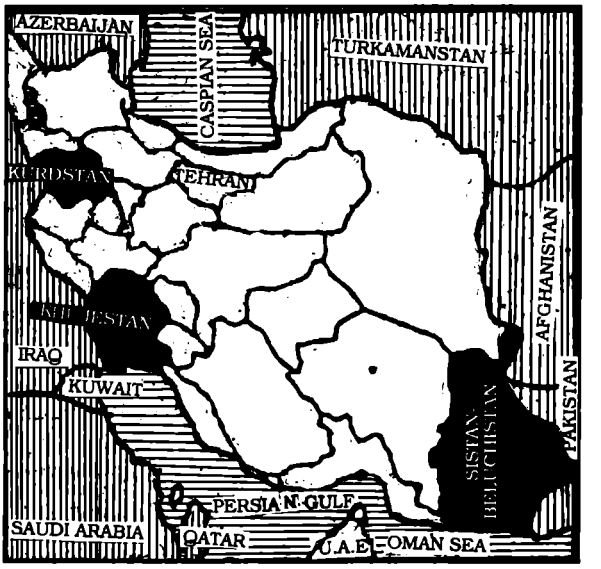


অবশ্য এখনো স্বল্পসংখ্যক ইরানী কুর্দী বিচ্ছিন্নতাবাদী ইরানের বাইরে অবস্থান করছে। ১৯৯৮ সালে তারা সিআইএ-র সহায়তায় আমেরিকা-নিয়ন্ত্রিত ইরাকী কুর্দিস্তানে অবস্থান গ্রহণ করে সেখান থেকে ইরানে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু ইরানী বাহিনী তাদের প্রচেষ্টাকে নস্যাত করে দেয়।

## কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র

ইরানের পশ্চিম অংশ, ইরাকের উত্তরাংশ, তুরস্কের পূর্ব-দক্ষিণ এলাকা এবং আর্মেনিয়া ও সিরিয়ার সামান্য অংশ জুড়ে কুর্দী জাতির বাস। লেবাননেও কিছু কুর্দী রয়েছে। ১৯৯২ সালের হিসাব অনুযায়ী তখন কুর্দীদের মোট সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৩৬ লাখের মত। এর মধ্যে তুরস্কে ১ কোটি ২০ লাখ, ইরানে ৫০ লাখ, ইরাকে ৪০ লাখ, সিরিয়ায় ১০ লাখ, আর্মেনিয়া ও আযারবাইজানে ১০ লাখ এবং লেবাননে ৬ লাখ কুর্দী বসবাস করত।[১] কোন কোন মতে শতাব্দীশেষে কুর্দীদের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৪ কোটিতে। কুর্দীদের সকলেই মুসলমান; প্রধানতঃ সুন্নী মাযহাবভুক্ত।[২]

www.pathagar.com

কুর্দীরা একটি সাহসী পার্বত্য জাতি। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিজয়ী বীর সালাহুদ্দীন এই কুর্দী জাতিরই লোক ছিলেন। কুর্দীরা হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম বড় জনসংখ্যাবিশিষ্ট

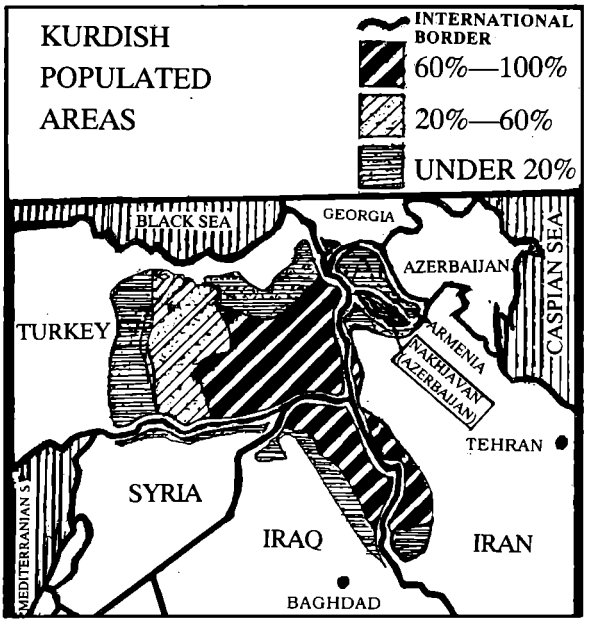


জাতি যারা ইতিহাসে কখনো স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধিকারী ছিল না।

অতীতে রাজতান্ত্রিক যুগেও মুসলমানদের মধ্যে ভাষা বা জাতিগত ভেদচিন্তা ছিল না। তখন বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহ্দেরকে কেন্দ্র করেই তাঁদের রাজত্বের সীমানা নির্ধারিত হত। রাজা বা বাদশাহ্ কোন্ বংশোদ্ভুত বা তাঁর ভাষা কি এটা বিবেচ্য বিষয় ছিল না। তেমনি তাঁরাও প্রজাদের ভাল বা মন্দ করতে গিয়ে সাধারণতঃ প্রজার জাতি বা ভাষার প্রতি লক্ষ্য রেখে আচরণ করতেন না, বরং নিজের স্বার্থ বা দেশের স্বার্থ বিবেচনা করতেন। এ কারণেই মুসলমানদের মধ্যে জাতিপূজা বা জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু পশ্চিমা উপনিবেশিক শাসকরা তাদের 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' নীতির আলোকে শাসিতদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের ও জাতিপূজার প্রচলন করে।

ওসমানী শাসনামল পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কুর্দীদের জন্যে স্বতন্ত্র কোন প্রাদেশিক শাসন গড়ে ওঠে নি। ঐ সময় প্রদেশ ভাগ হত প্রশাসনিক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে, ভাষা বা জাতীয়তা বিবেচনা করে নয়। ফলে কুর্দীদের মধ্যে এ নিয়ে কোন ক্ষোভ বা প্রতিরোধও ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে বৃটিশরা আরবদেরকে তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানি দেয়। কিন্তু যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পরে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুরো আরব ভূখণ্ডকে একটি দেশ হিসেবে হেজাযের বাদশাহ্ শরীফ হোসেনের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করার পরিবর্তে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এ সময় তারা চাইলে কুর্দীভাষী জনঅধ্যুষিত এলাকাকে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দিতে পারত এবং তাহলে পরে তা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারত। কিন্তু তারা ওয়াদা করেও তা বাস্তবায়ন করে নি। অথচ তারা কুর্দীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করতে থাকে।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে, ঐসব দেশের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী ইসলামী অনুভূতিশূন্য পশ্চিমা তাবেদার ও জাতীয়তাবাদী হবার কারণে গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু কুর্দীদের প্রতি শুধু অবহেলা প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত থাকে নি, বরং জুলুম-অত্যাচারও করেছে। অন্যদিকে শাহের ইরান ও বাথ পার্টি শাসিত ইরাক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত থাকার কারণে একে অপরের এলাকার কুর্দীদের বিদ্রোহের উস্কানি দিতে থাকে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বামপন্থী কুর্দিশ ডেমোক্রেটিক পার্টি (কেডিপি) এটাকে বিরাট সুযোগ মনে করে ইরাকের সহায়তায় ইরানে এবং ইরানের সহায়তায় ইরাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা শুরু করে। জবাবে জুলুম-অত্যাচার এবং দমননীতিও বেড়ে যায়। অন্যদিকে তুরস্কের বামপন্থী কুর্দিস্তান শ্রমিক দল (পিকেকে)-ও তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করতে থাকে।

ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর আমেরিকা এ দেশটিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার সিদ্ধান্ত নেয়। তদনুযায়ী কেডিপি-র ইরানী শাখা ইরানী কুর্দিস্তানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু ইরান সরকার এ বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়। পরে ইসলামী সরকারের সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে সেখানকার জনমন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা দূরীভূত হয়। ইরাকে ও ইউরোপে আশ্রয় গ্রহণকারী কুর্দী বিদ্রোহীদের অনেকেই দেশে ফিরে আসে।

কিন্তু ইরাকের অবস্থা হয় এর বিপরীত। সেখানে সাদ্দাম হোসেনের ডিক্টেটরী শাসনে শিয়া-সুন্নী, আরব-কুর্দী নির্বিশেষে সকলেই নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের উস্কানিতে কুর্দী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা বিষয়টিকে আরব বনাম কুর্দী সংঘাত হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন।

ইরান-ইরাক যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কিছু ইরাকী কুর্দী এলাকা ইরানের দখলে এলে সেখানকার কুর্দী জনগণ ইরানী বাহিনীকে স্বাগত জানায়। জবাবে ইরাকী বাহিনী তাদের ওপর রাসায়নিক বোমা নিক্ষেপ করে। এতে শুধু হালাব্‌জা শহরেই কমপক্ষে পাঁচ হাজার নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নিহত হয়।

ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধ হলে সাদ্দাম সরকার সর্বশক্তি নিয়োগে কুর্দীদের দমনের চেষ্টা করে। এমন কি তাদের অনেককে জোরপূর্বক অন্যত্র স্থানান্তর করে। এমতাবস্থায় ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধে ইরাক পরাজিত হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাকী জনগণকে সাদ্দামের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ডাক দেন। এতে দক্ষিণ ইরাকের শিয়া ও উত্তর ইরাকের কুর্দী জনগণ সাড়া দেয়। তারা মনে করে যে, আমেরিকা সাদ্দামকে উৎখাতের জন্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু। সাদ্দাম উভয় জনগোষ্ঠীকে নির্মমভাবে দমনের পদক্ষেপ নেন। দক্ষিণ ইরাকের শিয়াদেরকে

www.pathagar.com

তিনি মার্কিন অনুমতিক্রমে পুরোপুরি দমন করেন। কিন্তু উত্তর ইরাকের পশ্চিমাপন্থী কুর্দী নেতারা আমেরিকার সাহায্য চাইলে আমেরিকা সাদ্দামের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে উত্তর ইরাককে কুর্দীদের জন্যে নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে কার্যতঃ ঐ এলাকার ওপরে ইরাকের সার্বভৌমত্ব নেই।

ইতিমধ্যে কুর্দী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ইরাকী কুর্দিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং আমেরিকার ছত্রছায়ায় থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজস্ব সরকারও গঠন করেছে। কিন্তু কোন প্রতিবেশী দেশের স্বীকৃতি না থাকায় তারা বাইরের কোন দেশের স্বীকৃতি পায় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরান-ইরাকের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইরানের প্রতি কুর্দিস্তানের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতিদানের অনুরোধ জানায় এবং বিনিময়ে দক্ষিণ ইরাকের শিয়া অধ্যুষিত এলাকার জন্যে অনুরূপ সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার করে। কিন্তু ইরান সরকার ও ইরাকের শিয়া নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরে ইরান, তুরস্ক ও সিরিয়া যৌথভাবে ইরাকের ভৌগালিক অখণ্ডতা বিরোধী যে কোন উদ্যোগের বিরোধিতা ঘোষণা করে।

কিন্তু কার্যতঃ ইরাকী কুর্দিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে দুই বিচ্ছিন্নতাবাদী দল কেডিপি ও পিকেকে-র মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে কয়েক দফা গৃহযুদ্ধও হয়েছে; এতে হাজার হাজার লোক নিহত হয়।[৩] এখানে পরিহাসের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কুর্দিস্তানে ইরাকী সেনাবাহিনী ও ইরাকী বিমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও মাসউদ বারজানীর নেতৃত্বাধীন কেডিপি একাধিক বার প্রতিদ্বন্দ্বী পিকেকে-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইরাকী সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়েছে এবং ইরাকী বাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে জালাল তালেবানীর নেতৃত্বাধীন পিকেকে-র গেরিলারা ও তাদের সমর্থক বেসামরিক কুর্দীরা প্রতিবেশী দেশ ইরানে আশ্রয় নিয়েছে।

অন্যদিকে গোঁড়া ধর্মবিরোধী কামালবাদী সেনাবাহিনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত তুরস্কের সেক্যুলার সরকার দীর্ঘদিন থেকে তুরস্কের কুর্দী জনগণকে চরমভাবে বঞ্চিত করে আসছিল। তথাকথিত গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তুরস্ক সরকার কুর্দীদের প্রতি বঞ্চনা ও উপেক্ষা প্রদর্শন অব্যাহত রাখে। এমতাবস্থায় তুরস্কের কুর্দিস্তান শ্রমিক দল (পিকেকে) ১৯৮৪ সালের ১৫ই আগস্ট তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে।[৪]

এ গৃহযুদ্ধে সৈন্য, কুর্দী গেরিলা ও বেসামরিক কুর্দী জনগণের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। কেবল ১৯৯৩ সালের ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত নয় বছর আড়াই মাসে দশ হাজার লোক নিহত হয়। এদের মধ্যে ৪ হাজার ৫১৭ জন ছিল পিকেকে গেরিলা, ২ হাজার ২৭০ জন সরকারী সৈন্য এবং ৩ হাজার ১৪৪ জন বেসামরিক নাগরিক। এটা ছিল সরকারী সূত্রের হিসাব।[৫] এ সময় পর্যন্ত এ গৃহযুদ্ধে আর্থিক ক্ষতি হয় ৪২ কোটি ৭০ লাখ ডলার এবং ১৫ লাখ লোক গৃহহারা ও স্থানচ্যুত হয়। ৬০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

www.pathagar.com

হয়ে যায়।[৬] এ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে যুদ্ধজনিত বেসামরিক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি। এ গৃহযুদ্ধের সামরিক ব্যয়ের অঙ্ক বিস্ময়কর। শুধু ১৯৯২ সালে এ খাতে তুরস্ক সরকারের ব্যয় হয় ৪৪০ কোটি ডলার এবং ১৯৯৩ সালে ব্যয় হয় ৭৫০ কোটি ডলার।[৭]

যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে প্রায়শঃই তুরস্কের কুর্দী গেরিলারা ইরাকী কুর্দিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ১৯৯৫ সালের শুরুর দিকে তুর্কী সেনাবাহিনীর ব্যাপক হামলার মুখে কমপক্ষে ২ হাজার ৮শ' কুর্দী গেরিলা ইরাকী কুর্দিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নেয়।[৮] এমতাবস্থায় তুর্কী সেনাবাহিনীর ৩৫ হাজার সৈন্য ইরাকী ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়।[৯] এ অভিযানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানায়।[১০] অথচ ইরাকী কুর্দীদের জন্যে স্বাধীন কুর্দিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে আমেরিকা ইরান সরকার ও ইরাকী শিয়াদেরকে উৎকোচ দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। তুরস্ক সরকার তার এ অভিযানে সাফল্য দাবী করে। কিন্তু এ অভিযানের ফলে ১৯৯৯-র মাঝামাঝি পর্যন্ত তুরস্কের কুর্দী বিদ্রোহে নিহতের মোট সংখ্যা ৩১ হাজারে দাঁড়ালেও[১১] পিকেকে-র দশ হাজার গেরিলার মধ্যে[১২] অর্ধেকও মারা পড়েছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া নতুন রিক্রুটমেন্ট অব্যাহত রয়েছে।

১৯৯৯-র শুরুর দিকে বিদ্রোহী কুর্দী নেতা ওসালান গ্রেফতার হওয়া সত্ত্বেও তুরস্কের পক্ষে এ বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য ওসালানের অনুসারীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ পুরোপুরি পরিত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে। তবে এ ঘোষণার কার্যকারিতা স্থায়িত্ব লাভ করবে কি না তা এখনি বলা যাচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে কুর্দী বিদ্রোহ দমনে তুর্কী সেনাবাহিনীর অভিযানের প্রতি মার্কিন সমর্থন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রকাশ্যেই তার বন্ধুরাষ্ট্র (?) তুরস্ককে এ অভিযানে নিষেধ করা সম্ভব নয়। বরং মার্কিন সমর্থনের ফলে তুর্কী বাহিনীর নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কুর্দী জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে

এ প্রসঙ্গে আরো স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৯৩ সালে ইউরোপে প্রবাসী কুর্দীরা তুরস্কের দূতাবাসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়।[১৩] এ থেকে কুর্দী সমস্যার ব্যাপকতা সহজেই অনুমান করা চলে। কিন্তু ইরান ও ইরাক, ইরাক ও সিরিয়া, ইরান ও তুরস্ক এবং ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিরোধ থাকলেও কুর্দী বিদ্রোহকে কেউই প্রশ্রয় দিতে নারাজ,[১৪] বরং এতে সবাই-ই শঙ্কিত। কারণ, এর কোন একটি দেশে স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তা অন্য দেশগুলোর কুর্দী এলাকার জন্যে বিপদের কারণ হবে। কিন্তু বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে এ দেশগুলোর ভৌগলিক অখণ্ডতা বিনষ্ট করার জন্যে কুর্দী বিদ্রোহকে উস্কানি দিয়ে চলেছে।

এমতাবস্থায় তুরস্ক ও ইরাকের সরকারদ্বয় নিজ নিজ কুর্দী জনগণকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানসহ রাজনৈতিক সমাধানের পথ বেছে না নিলে কুর্দী বিদ্রোহ ঐ এলাকায় এক ভয়াবহ যুদ্ধের সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

www.pathagar.com

# আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ

আফগানিস্তানের জনগণের স্বাধীনচেতা হিসেবে খ্যাতি আছে। এভাবে স্বাধীনচেতা হবার কারণেই ইতিহাসে সরাসরি কোন উপনিবেশবাদী শক্তি আফগানিস্তানে দখল ও শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তীব্র গোত্রীয় অনুভূতি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্রের কারণে দেশটি এখন রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে ক্ষমতাসীন কম্যুনিস্ট সরকারের আহ্বানে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করলে সেখানকার বিভিন্ন ইসলামী দল, গোষ্ঠী, গোত্র, ওলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখ দখলদার বাহিনী ও তার তাবেদার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। দীর্ঘ প্রায় তের বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আফগান জাতি প্রথমে সোভিয়েত বাহিনীকে বিতাড়িত করতে ও পরে কম্যুনিস্ট সরকারকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধে কমপক্ষে দশ লাখ লোক নিহত হয়, ২০ লাখ আহত হয়ে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যায়, ৬০ লাখ ইরানে ও পাকিস্তানে শরণার্থী হয় এবং আরো ২০ লাখ দেশের ভিতরেই উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।[১৫] এছাড়া যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অপুষ্টিতে ও অপুষ্টিজনিত রোগে ৩০ থেকে ৪০ লাখ শিশুর মৃত্যু ঘটে।[১৬]

কিন্তু আফগানিস্তানের মুজাহিদ গ্রুপগুলো এ বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত মুক্তিকে অর্থহীন করে দিয়ে অচিরেই ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এর পিছনে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সুস্পষ্ট ভূমিকা কাজ করেছে। সোভিয়েত বাহিনী ও কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগান মুজাহিদদেরকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য দেয়। এছাড়া আমেরিকান অফিসাররা পাকিস্তানে অবস্থানরত মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণও প্রদান করে। অবশ্য ইরান সরকার তার ভূখণ্ডে অবস্থানরত আফগানদের জন্য মার্কিন অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষক গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং সেখানে অবস্থানরত আফগান মুজাহিদরাও তা মেনে নেয়। কিন্তু পাকিস্তানকেন্দ্রিক মুজাহিদ গ্রুপগুলো এ সাহায্যকে স্বাগত জানায়। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের অসহায়ত্বের যুক্তি দেখায়।

www.pathagar.com

মার্কিন সাহায্যের বেশীরভাগই গুলবাদিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন মুজাহিদ গ্রুপকে দেয়া হয়। 'পাকিস্তানের আন্তঃসার্ভিস গোয়েন্দাসংস্থা (আইএসআই)-এর মাধ্যমে মুজাহিদরা ৯শ' কোটি ডলারের সাহায্য পায়। এই সুযোগে হেকমতিয়ার আফগানিস্তানে বিপুল অস্ত্রের মজুত গড়ে তোলেন। তাঁর বাহিনী কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বী মুজাহিদদের ওপর হামলা চালানো সত্ত্বেও আইএসআই তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করতে থাকে।'[১৭]

এটা অনস্বীকার্য যে, আমেরিকা চাচ্ছিল, কম্যুনিস্ট সরকারের পতনের পর ক্ষমতাচ্যুত জহীর শাহ্‌কে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হোক। এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে ও গোপনে প্রস্তাব প্রদান ও আলোচনা হয়। কিন্তু মুজাহিদ গ্রুপগুলো তাতে সম্মত ছিল না। এমতাবস্থায় আমেরিকা বিকল্প হিসেবে কোন বিশেষ মুজাহিদ গ্রুপকে এগিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে আমেরিকার স্বার্থকে পুরোপুরি নিশ্চিত করবে। বলা বাহুল্য যে, হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন গ্রুপটিই ছিল সেই গ্রুপ। কিন্তু কম্যুনিস্ট সরকারের পতনের পর হেকমতিয়ার ক্ষমতা দখলে ব্যর্থ হন। প্রথমে সিবগাতুল্লাহ্ মুজাদ্দেদী ও পরে বুরহানুদ্দীন রাব্বানী প্রেসিডেন্ট হন। এ অবস্থায় রাব্বানীর সাথে হেকমতিয়ারের ক্ষমতাদ্বন্দ্ব শুরু হয়। কিন্তু হেকমতিয়ার এতে সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। এ প্রেক্ষাপটে নবসৃষ্ট তালেবান বাহিনী ময়দানে অবতীর্ণ হয়।

আফগানিস্তানের মুজাহিদ গোষ্ঠীগুলো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিন্ন শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগান কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে পরস্পরকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা ভালভাবেই জানত যে, মুজাহিদ গ্রুপগুলো আমেরিকার বন্ধু নয়; আমেরিকাকে ব্যবহার করছে মাত্র। এ কারণে আমেরিকা তাদের ওপর আস্থা স্থাপন না করে বিকল্প আয়োজনও করে রাখে। তা হচ্ছে তালেবান বাহিনী।

তালেবান বাহিনী হঠাত করে আত্মপ্রকাশ করলেও তা পুর্বআয়োজনবিহীন ছিল না। সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধের সময় এবং রুশ ও কম্যুনিস্টদের হাত থেকে আফগানিস্তান মুক্ত হবার পরে—যখন মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ছিল না, তখনই আফগানিস্তানের কান্দাহারে এবং পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে আফগান মাদ্রাসা-ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু তখন তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র বাহিনীরূপে সংগঠিত না করে বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট দল বা সংগঠনে থেকেও তারা তালেবান-সত্তা বা পরিচিতি অটুট রাখতে সক্ষম হয়। পরে উপদলগুলোর মধ্যকার বিভিন্ন তালেবান ইউনিট একত্রিত হয়ে একটি একক বা অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়।'[১৮]

www.pathagar.com

পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় বিভিন্ন ব্যক্তি তালেবানের প্রশিক্ষণ ও তার পিছনে আমেরিকার হাত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। যেমন ঃ গওহর আইয়ুব খান ও মীর্যা আসলাম বেগ।[১৯] মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরও তালেবানের সাথে নিম্ন পর্যায়ে শুরু থেকেই যোগাযোগ থাকার কথা স্বীকার করে।[২০]

তালেবান বাহিনী ১৯৯৪-র নভেম্বরে কান্দাহার দখল করে এবং মার্কিন পরিকল্পনা, সউদী অর্থ ও পাকিস্তানী ব্যবস্থাপনায় দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৯৬-র সেপ্টেম্বরে মাত্র দুই বছরের মাথায় তারা কাবুল দখল করতে সক্ষম হয়। পাখতুন বংশোদ্ভুতদের নিয়ে গঠিত এ তালেবান বাহিনী চরম নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়ে তাদের বিরোধী ও সম্ভাব্য বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরপর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তারা একের পর এক এলাকা দখল করতে থাকে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বন্ধের জন্য আলোচনার প্রস্তাব দেয়া হয়। তালেবান এ প্রস্তাব বাহ্যতঃ গ্রহণ করে। কিন্তু সহসাই হামলা চালিয়ে ১৯৯৮-র আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে যথাক্রমে মাযারে শরীফ ও বামিয়ান দখল করে নেয়। মাযারে শরীফ দখলকালে তারা আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে ৮ জন ইরানী কূটনীতিক ও একজন সাংবাদিককে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে। এ নিয়ে ইরানের সাথে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। তবে ইরানী নেতৃবৃন্দের ধৈর্য ও দূরদর্শিতার কারণে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধে নি।

১৯৯৮-র শেষ নাগাদ তালেবান আফগানিস্তানের শতকরা ৯০ ভাগ এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তাজিক ও উজবেক অধ্যুষিত এলাকার বেশীর ভাগ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যায়। এমন কি তালেবান যদি বাকী এলাকা দখলে সক্ষমও হয় তথাপি আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের পরিপূর্ণ অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কারণ আফগানিস্তান বহু জাতি, ভাষা ও মাযহাব বিশিষ্ট একটি দেশ এবং দেশটিতে জাতিগত সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ব্যবধান অল্প। আফগান জনগণের শতকরা সাড়ে ৫৩ ভাগ পাখতুন বা পশতুভাষী। তাজিক বা ফার্সী দারী ভাষী ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ, ফার্সীভাষী হাজারাদের সংখ্যা ৩ শতাংশ এবং উজবেক তুর্কীরা ৬ শতাংশ।[২১]

তালেবান পাখতুন গোত্রের শাসন প্রতিষ্ঠা করছে যদিও মুখে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। অন্যদিকে আফগানিস্তানের সকল মুজাহিদ গোষ্ঠীই ইসলামের অনুসারী এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

তালেবান সরকার ইসলামের নামে এমন কতক বাড়াবাড়ি করছে যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন ঃ কেবল রাজনৈতিক বিরোধী ও অন্য মাযহাবের অনুসারী হওয়ার কারণেই বেসামরিক লোকদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করা, মেয়েদের লেখাপড়া ও তাদের স্কুল বন্ধ করে দেয়া এবং পর্দা সহকারেও তাদেরকে

www.pathagar.com

চলাফেরা করতে না দেয়া, পুরুষদেরকে দাড়ি ছোট করা বা পাগড়ী না পরার দায়ে শাস্তি দেয়া ইত্যাদি। তাছাড়া তারা আফিম পাচারের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করছে। এভাবে তারা ইসলাম সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তালেবান সরকার তার বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থী আচরণের দ্বারা ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে এক বীভৎস চিত্র তুলে ধরছে যা ইসলামের দুশমনদের হাতে ইসলাম বিরোধী প্রচারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আফগানিস্তানের মত দেশে সংখ্যাগুরু গোত্রের শাসন চাপিয়ে দেয়া (তা-ও ভোটের মাধ্যমে নয়, অস্ত্রের মুখে) মানে স্থায়ী অশান্তি লালন করা। প্রাদেশিক ও গোত্রীয় স্বায়ত্তশাসনসহ কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গঠনই আফগানিস্তান সমস্যার একমাত্র সমাধান।

বর্তমানে তালেবান ও তার বিরোধীদের মধ্যে শান্তিআলোচনা চলছে। তবে তাতে তেমন কোন অগ্রগতি নেই।

## শাদের গৃহযুদ্ধ

মধ্য-উত্তর আফ্রিকার মুসলিম-প্রধান দেশ শাদে ফরাসী-মার্কিন ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধের কারণে দীর্ঘ বহু বছর যাবত রক্ত ঝরেছে। দেশটির জনসংখ্যার শতকরা ৪৪ ভাগ মুসলমান, ৩৩ ভাগ খৃষ্টান ও বাকী ২৩ ভাগ বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মের অনুসারী।[২২] মতান্তরে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ। প্রাচীন ধর্মসমূহের অনুসারীরা সাধারণতঃ প্রকৃতিপূজারী হিসেবে পরিচিত। মুসলমানরা প্রধানতঃ উত্তর এলাকায় এবং খৃষ্টানরা প্রধানতঃ দক্ষিণ এলাকায় বসবাস করছে।

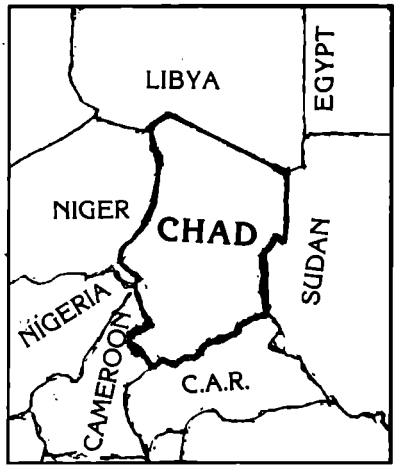


সাবেক ফরাসী উপনিবেশ এ দেশটি ১৯৬০ সালে নামেমাত্র স্বাধীনতা লাভ করে। কারণ, ঐ সময় একজন খৃষ্টানকে প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হয়। দেশের সেনাবাহিনীর শতকরা ৯৯ ভাগ সদস্য ছিল খৃষ্টান। ১৯৭৫ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অপর একজন খৃষ্টান ক্ষমতা দখল করেন।

মুসলমানরা ১৯৬৬ সালে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। ১৯৭৯ সালে গোকুনী ওয়াদায়ীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সফল হয় এবং গোকুনী প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। অতঃপর ১৯৮১ সালে ফরাসী সৈন্যরা শাদ থেকে পুরোপুরি সরে যেতে

www.pathagar.com

ধ্য হয়। কিন্তু তাদের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের খৃস্টান সম্প্রদায় ও ফ্রান্সের সাথে আঁতাত করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হাসান হাব্রে বিদ্রোহ করেন।

প্রতিবেশী মুসলিম দেশ লিবিয়া গোকুনীকে ক্ষমতায় টিকে থাকার ব্যাপারে সাহায্য করে এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে লিবীয় সৈন্যরা প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা ও ফ্রান্সের চাপে লিবিয়া তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সাথে সাথে ফ্রান্স, খৃস্টান প্রতিবেশী জায়ের (বর্তমান নাম কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) এবং ডিক্টেটর জাফর নিমেরীর শাসনাধীন তৎকালীন সূদানের সক্রিয় সমর্থনে হাব্রে রাজধানী এন্‌জামেনা দখল করে নিয়ে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করেন। এমতাবস্থায় ১৯৮১-র জুনের শেষ দিকে গোকুনী ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্যে নতুন করে অভিযান শুরু করেন। তিনি তাঁর উত্তরাঞ্চলীয় ঘাঁটি ফায়া লার্‌জু থেকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর আবাশী দখল করেন। এ সময় আমেরিকা হাব্রেকে সামরিক সাহায্য দেয়ার কথা ঘোষণা করে। অতঃপর ১৯৮১-র নভেম্বরে হাব্রে আবাশী পুনর্দখল করতে সক্ষম হন। এখান থেকে তিনি উত্তরে অভিযান শুরু করেন। কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চলীয় কিছু জায়গা গোকুনী ওয়াদায়ীর দখলেই থেকে যায় এবং গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে।[২৩]

আমেরিকা ও ফ্রান্স হাব্রেকে প্রচুর সামরিক সাহায্য প্রদান করে এবং জায়ের সৈন্য সাহায্য দেয়।[২৪] ফলে হাব্রে আট বছরের বেশীকাল গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সক্ষম হন। কিন্তু ১৯৯০ সালে একই সাথে গণঅভ্যুত্থান ও যুদ্ধে লিবিয়ার রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ইদরীস দেবীর নিকট হাব্রে পরাজিত হন এবং ইদরীস দেবী প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। তা সত্ত্বেও গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে।[২৫] তবে এবার উত্তরাঞ্চলের পরিবর্তে দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে। দক্ষিণাঞ্চলীয় খৃস্টান সম্প্রদায় এবং ফ্রান্স ও আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট হাসান হাব্রে ইদরীস দেবীর সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ অব্যাহত রাখেন।

সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, এ গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে। খৃস্টানদের ও বাইরের শক্তির ষড়যন্ত্রে মুসলমানরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে অবশ্য শাদের গৃহযুদ্ধ স্তিমিত হয়ে আসে। তবে এর পুরোপুরি অবসান হয়েছে বলে জানা যায় নি।

## তাজিকিস্তানের গৃহযুদ্ধ

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম দেশ তাজিকিস্তানে কম্যুনিস্টদের ক্ষমতালিপ্সা এবং পুঁজিবাদী রাশিয়ার আধিপত্যলিপ্সার কারণে মুসলমানদের প্রচুর রক্ত ঝরেছে।

www.pathagar.com

তাজিকিস্তানের জনসংখ্যা ২০০০ খৃষ্টাব্দের শেষে ৭০ লাখে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলি হয়েছে। এ দেশটির মোট জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে ৯২ জন মুসলমান। এখানে ঐতিহাসিক কারণে কম্যুনিস্ট যুগ থেকেই ইসলামের প্রভাব অনেক বেশী। তাজিকিস্তানের বেশীর ভাগ জনগণই তাজিক বংশোদ্ভুত; উত্তর আফগানিস্তানের জনগণও তাজিক বংশোদ্ভুত। অন্যদিকে এদের মধ্যে অনেকেই ফার্সীভাষী। ফলে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর তার প্রভাব এখানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পরেও তাজিকিস্তানে কমুনিস্টরাই ক্ষমতা দখল করে রাখে। এর বিরুদ্ধে ইসলামী জনতার গণঅসন্তোষ শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ১৯৯২-র শুরুর দিকে ইসলামপন্থীরা গণতন্ত্রপন্থীদের সহায়তায় রাজধানী দোশাম্বে সহ দেশের বেশীরভাগ এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। একই বছর সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে ইসলামী সরকার কম্যুনিস্ট প্রেসিডেন্ট রহমান নবীয়েভকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। ১৯৯২-র জুন মাস থেকে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা পুনর্দখলের জন্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে এবং নভেম্বরের শেষ নাগাদ এ গৃহযুদ্ধে কমপক্ষে ৫০ হাজার লোক নিহত হয়।[২৬]

কম্যুনিস্টরা গৃহযুদ্ধের সূচনা থেকেই দেশের উত্তর এলাকার শক্ত কম্যুনিস্ট ঘাঁটি হোজান্দ্‌কে কেন্দ্র করে পাল্টা সরকার গঠন করে এবং উজবেকিস্তানের সাবেক কম্যুনিস্ট সরকারের সহায়তায় দোশাম্বের ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। ইসলামী ও গণতন্ত্রী দলের কোয়ালিশন মাত্র দশ মাস দেশটি শাসন করতে সক্ষম হয়। ১৯৯২-র ডিসেম্বরে কম্যুনিস্টরা দেশটির ক্ষমতা পুরোপুরি পুনর্দখল এবং ইমাম আলী রহমানোভকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মনোনীত করে।

ক্ষমতা দখলের পর কম্যুনিস্টরা ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে হত্যা, নির্যাতন ও গ্রেফতারের অভিযান শুরু করে। ফলে ৯০ হাজার ইসলামপন্থী দেশ ত্যাগ করে আফগানিস্তানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ইসলামপন্থীরা আফগান ভূখণ্ড থেকে দেশের মধ্যে প্রবেশ করে সরকারী সৈন্যদের ওপর হামলা চালাতে থাকে। জনসমর্থনহীন সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে রাশিয়ার সাহায্য নেয়। রাশিয়া

www.pathagar.com

খানে ২৫ হাজার সৈন্য পাঠায়।[২৭] এর মধ্যে সাড়ে তিন হাজার সৈন্যকে আফগান মান্তে মোতায়েন করা হয়।[২৮] রুশ সৈন্যরা অনেক সময় আফগান ভূখণ্ডে প্রবেশ করে াজিক মুজাহিদদের ওপর হামলা চালায়। এতে শুধু তাজিক মুজাহিদ ও শরণার্থীরাই হতাহত হয় নি, বরং অনেক আফগান নাগরিকও হতাহত হয়। এর ফলে তাজিকিস্তানের গৃহযুদ্ধ আঞ্চলিক রূপ নেয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

তাজিকিস্তানে সৈন্য পাঠানোর কারণে আধিপত্যবাদী হবার দুর্নাম এড়াবার লক্ষ্যে রাশিয়া কিরগিজিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কামানিস্তানকেও সেখানে সৈন্য পাঠাতে রাযী করায় এবং ঐ তিনটি দেশও কিছু কিছু সৈন্য প্রেরণ করে। এটা রাশিয়ার জন্য রাজনৈতিক ফায়দা বয়ে আনলেও এ যুদ্ধের আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপান্তরিত হবার আশংকা বেড়ে যায়। বিশেষ করে দোশাম্বের কম্যুনিস্ট সরকার ইরানের বিরুদ্ধে তাজিক মুজাহিদদের সাহায্য করার অভিযোগ তোলে যা অবশ্য ইরানের পক্ষ থেকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করা হয়। এ অবস্থায় আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে রুশ সৈন্যদের হামলার পর তৎকালীন আফগান সরকার কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে। ইরান ও তৎকালীন আফগান সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার কারণে তখন পরিস্থিতির অধিকতর অবনতি হলে ইরান ও আফগানিস্তান তাজিক মুজাহিদদের পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হত। কিন্তু ইরানের সংযত আচরণ এবং রুশ বাহিনীর আফগান সীমান্তে হামলার তীব্রতা হ্রাসের ফলে যুদ্ধ আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করে নি।

এদিকে রাজধানী দোশাম্বের ওপর কম্যুনিস্ট সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও আফগান সীমান্তবর্তী স্বায়ত্তশাসিত এলাকা বাদাখশানের ওপর—যার আয়তন দেশের মোট আয়তনের শতকরা ৪৫ ভাগ—দোশাম্বের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।[২৯] এমতাবস্থায় ইরান ও আফগানিস্তানের সমর্থন পেলে তাজিক মুজাহিদরা বাদাখশানে নিজস্ব ইসলামী সরকার গঠন করতে পারত এবং তাতে দেশটি বিভক্ত হয়ে যেত। কিন্তু ইরান, আফগানিস্তান ও তাজিক মুজাহিদগণ তাজিকিস্তানের বিভক্তির পক্ষপাতী ছিল না। এমতাবস্থায় দু'পক্ষের দুই এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। আর এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার মানেও ছিল দেশের দ্বিধাবিভক্তি।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের মাধ্যমে ফয়সালা অসম্ভব জেনে তাজিকিস্তান-সরকার আলোচনায় রাযী হয়। তবে রাশিয়া ও তাজিকিস্তান ইরানকে বাদ দিয়ে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকে এবং জাতিসংঘের নিকটও সাহায্য চায়। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে ইরানের পক্ষে মুজাহিদদেরকে সাহায্য করে বাদাখশান-কেন্দ্রিক স্বতন্ত্র সরকার গঠনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ইরান তা না করায় ইরান সম্পর্কে দোশাম্বে-সরকারের ভুল ধারণা ভেঙ্গে যায়।

www.pathagar.com

তাজিকিস্তানের কম্যুনিস্ট সরকার ইরানের নিরপেক্ষতার ব্যাপারে আস্থাশীল হবা পরে তার মধ্যস্থতা মেনে নেয়। তেহরান ও মস্কোতে ইরানের মধ্যস্থতায় দু'পক্ষে প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হয়। তাজিক প্রেসিডেন্ট ইমাম আলী রাহ্মানোভ এবং মুজাহিদ-নেতা সাইয়েদ আাবদুল্লাহ্ নূরী তেহরানে সামনাসামনি বৈঠকেও মিলিত হন। ১৯৯৭-র জানুয়ারীতে তেহরানে দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধনিরসন এবং পরবর্তীতে গণভোট ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি যৌথ কমিশন গঠনের ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এ চুক্তি অনুযায়ী পরে সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ নূরীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় ঐকমত্যপরিষদ গঠিত হয় এবং এ পরিষদের তত্ত্বাবধানে দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি ফরমূলা গণভোটে গৃহীত হয়। তবে ইতিমধ্যে ১৯৯৯-র নভেম্বরে দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইসলামপন্থীরা নির্বাচন বয়কট করে। ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ইমাম আলী রাহমানোভ শতকরা ৯৬ ভাগ ভোট পেয়ে পুনঃনির্বাচিত হন। অতঃপর গত ২রা মার্চ (২০০০) পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতেও ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করতে সক্ষম হয়।

তাজিকিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থী ও গণতন্ত্রপন্থীদের বহু অভিযোগ থাকলেও সেখানে গৃহযুদ্ধের অবসান ও মোটামুটি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

## আলজেরিয়ার জিহাদ

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আলজেরিয়া ফরাসীদের নিকট থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশটিতে একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরপর ১৯৮৮ সালের শেষের দিকে ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে এক গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এর ফলে ক্ষমতাসীন সরকার এক সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধ্য হয় যা ১৯৮৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত গণভোটে অনুমোদিত হয়।

সংশোধিত সংবিধানের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর আলজেরিয়ার ইতিহাসে প্রথম বহুদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নবগঠিত ইসলামী মুক্তিফ্রন্ট (এফআইএস) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পার্লামেন্টের ৪৩০টি আসনের মধ্যে ২৩১টি আসনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত হয়। এতে এফআইএস মনোনীত প্রার্থীগণ ১৮৯টি আসনে শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন এবং বাকী ১৯৯-টিতে ১৬ই জানুয়ারী ১৯৯২ তারিখে দ্বিতীয় দফা ভোট অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ইসলামপন্থীদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে পাশ্চাত্যপন্থী সামরিক অফিসাররা এ নির্বাচনকে বাতিল করে দেয় এবং প্রেসিডন্ট শায্লী বিন্ জাদীদকে পদত্যাগে বাধ্য করে।

www.pathagar.com

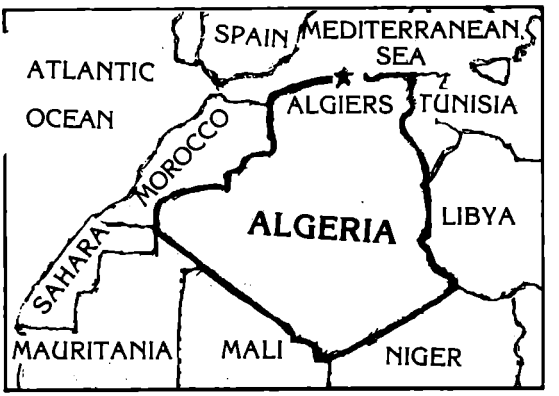


নবগঠিত সামরিক জান্তা অচিরেই এফআইএস-কে বেআইনী ঘোষণা করে এবং তার নেতা আব্বাসী মাদানী, আলী বেল্‌হাজ ও অন্যান্যকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এমতাবস্থায় এফআইএস-এর নেতৃবৃন্দের একাংশ ক্ষমতাসীন পাশ্চাত্যপন্থী (ফরাসীপন্থী) সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করে। এভাবে আলজেরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমরিকা ও ফ্রান্স সহ গোটা পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের মার্কিন-তাবেদাররা আলজেরিয়ার সামরিক জান্তাকে সমর্থন করে ও সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে।

আলজেরিয়ার গৃহযুদ্ধে ১৯৯৯-র শেষ পর্যন্ত এক লাখ লোক নিহত হয়।[৩০] এতে একজন প্রেসিডেন্ট (বুদীয়াফ), একজন গভর্নর, কয়েকজন মন্ত্রী, বহু উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার এবং হাজার হাজার সৈন্য, মুজাহিদ ও সাধারণ মানুষ প্রাণ হারায়। এর জন্য গণবিরোধী আলজিয়ার্স সরকারের প্রতি পাশ্চাত্যের সহযোগিতাই দায়ী।

বুদিয়াফ নিহত হবার পর সামরিক জান্তার আরেকজন হাতের পুতুল প্রেসিডেন্ট লিয়ামিন জেরুয়াল গণভোট-প্রহসনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের তথা সামরিক জান্তার ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্যে সংবিধান সংশোধন করেন এবং ইসলামপন্থীদের শতকরা ৯০ জনের বর্জনের মধ্য দিয়ে পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রহসন করেন। এ কারণে সশস্ত্র ইসলামী গ্রুপ (জিআইএ) তার জিহাদ অব্যাহত রেখেছে।

১৯৯৭-র শেষ দিকে ও ১৯৯৮-র শুরুর দিকে আলজেরিয়ায় কয়েক হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়। সরকার জিআইএ-কে হত্যাকারী বলে প্রচার করে। কিন্তু জনগণকে তা বিশ্বাস করাতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে, জনমনে জিআইএ-র বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারসমর্থকরা ও সরকারী মিলিশিয়ারাই এসব হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদুল আজিজ বুতেফ্‌লিকা তাঁর পূর্বসূরির অনুসরণ অব্যাহত রেখেছেন। ১৯৯৯-র ২৬শে নভেম্বর এফআইএস-এর তিন নম্বর নেতা আবদুল কাদের হাশানী অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীদের গুলীতে শহীদ হয়েছেন।[৩১] তবে হত্যাকারীরা যে সরকারের ভাড়াটে এজেন্ট ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই বর্তমানে গৃহযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পেলেও অব্যাহত রয়েছে।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট বুতেফ্লিকা একটি নতুন শান্তিপরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু ইসলামপন্থীদের একাংশ তা গ্রহণ করলেও অপর অংশ তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

## পশ্চিম সাহারার মুক্তিযুদ্ধ

পশ্চিম সাহারা মুসলিম জাহানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ সমস্যা। পশ্চিম সাহারা উত্তর আফ্রিকার একটি মরুময় দেশ, ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। এর উত্তরে মরোক্কো, উত্তর-পূর্বে আলজেরিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্বে মাওরিতানিয়া অবস্থিত। দেশটির আয়তন দুই লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গকিলোমিটার। কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র ১২ লাখ।[৩২] এরা আরবীভাষী মুসলমান। কিছুসংখ্যক ফরাসীভাষী এবং তুর্কীভাষীও রয়েছে। পশ্চিম সাহারা মরুময় দেশ হলেও এখানে ফসফেটের খনি রয়েছে।

উপনিবেশিক যুগে সাহারা স্পেনের শাসনাধীনে ছিল। ১৯৭৬ সালে স্পেনীয়রা দেশটি থেকে চলে যাবার সাথে সাথেই সেখানকার জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী মুক্তিযোদ্ধা-সংগঠন পোলিসারিও দেশটির সাহারান আরব গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (এসএডিআর) নাম দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, মোহাম্মাদ আবদুল আজিজকে প্রেসিডেন্ট ও মাহ্ফুয আ'লা বিবাহ্কে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে এবং দেশের জন্যে সংবিধান রচনা করে। কিন্তু এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দেশটির একাংশ মরোক্কো ও অপর অংশ মাওরিতানিয়া দখল করে নেয়। তখন থেকে ব্যাপকভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৭৯ সালে এক চুক্তির মাধ্যমে মাওরিতানিয়া তার দখলকৃত এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে। কিন্তু রাজতান্ত্রিক মরোক্কো দেশটির রাজধানী আল-উইউন সহ বিশাল এলাকায়, বিশেষ করে ফসফেট-সমৃদ্ধ এলাকায় নিজ দখল অব্যাহত রেখেছে এবং খনি থেকে ফসফেট উত্তোলন করে চলেছে। অন্যদিকে পোলিসারিও ক্ষুদ্র শহর হাউজাহ্কে অস্থায়ী রাজধানী ও সামরিক কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে।

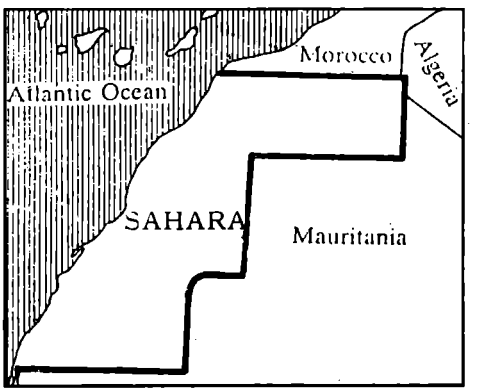


মরোক্কো শুধু পশ্চিম সাহারার বিশাল এলাকা দখল করেই ক্ষান্ত থাকে নি, বরং মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত থাকায় সাহারাবাসীদের ওপর সন্দেহের কারণে জুলুম-অত্যাচারও চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে অনেক সাহারাবাসীই দেশত্যাগ করে

www.pathagar.com

আশেপাশের দেশে আশ্রয় নিয়েছে। অন্যদিকে অনেক মরোক্কোবাসীকে এনে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। জাতিসংঘ গণভোটের মাধ্যমে পশ্চিম সাহারার ভাগ্যনির্ধারণের সমাধান দিয়েছে। কিন্তু মরোক্কো প্রথমে নানা রকমের টালবাহানা করে এড়িয়ে যায়। পরে গণভোটে রাজী হলেও দেশত্যাগীদের ভোটাধিকার এবং, পুনর্বাসিত মরোক্কান বংশোদ্ভুতদের ভোটাধিকার প্রশ্নে মরোক্কো সরকার ও পোলিসারিও-র মধ্যে মতানৈক্য অব্যাহত থাকায় এখনো গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। ফলে মরোক্কো বাহিনীর বিরুদ্ধে পোলিসারিও-র গেরিলা হামলা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে মুসলমানদের পারস্পরিক রক্ত ঝরছে।

মরোক্কো তিন কোটি মানুষের একটি বড় দেশ যার জনগণের ভাষা, জাতি ও ধর্ম সাহারাবাসীদের সাথে অভিন্ন। এ কারণে হয়ত সাহারাবাসীদের মরোক্কোবাসী হিসেবে পরিচিত হতে আপত্তি হত না। কিন্তু মরোক্কোয় স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকায় স্বাধীনতাপ্রিয় সাহারাবাসীদের পক্ষে মরোক্কোভুক্ত হয়ে স্বৈরতন্ত্রের গোলামী বরণ করে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

## পাদটীকা ঃ

১) Daily Star : 30-7-1993

২) প্রাগুক্ত

৩) শুধু ১৯৯৪-র মে মাসে চার হাজার লোক নিহত হয়। (IRNA/AFP : 5-6-1994)

৪) সিনহুয়া ঃ ১৬-৮-১৯৯৩

৫) The Daily Star : 29-10-1993

৬) সিনহুয়া ঃ ১৬-৮-১৯৯৩

৭) রয়টার ঃ ১০-১১-১৯৯৩

৮) রয়টার/এএফপি/বিবিসি/ইনকিলাব ঃ ২১-৩-১৯৯৫

৯) প্রাগুক্ত

১০) ইউএসআইএ/ইনকিলাব ঃ ১২-৭-১৯৯৫। এছাড়া আমেরিকার ছত্রছায়াপ্রাপ্ত ইরাকী কুর্দিস্তানের কেডিপি তুরস্ককে এ অভিযানে সহায়তা করে। (ইত্তেফাক ঃ ১৭-৭-১৯৯৯)

১১) ইত্তেফাক ঃ ১৭-৭-১৯৯৯

১২) রয়টার/এফপি/বিবিসি/ইনকিলাব ঃ ২১-৩-১৯৯৫

১৩) রয়টার/এএফপি/মিল্লাত ঃ ২৫-৬-১৯৯৩

www.pathagar.com

১৪) ১৫ই নভেম্বর ১৯৯২ তারিখে আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত ইরান, সিরিয়া ও তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকে উত্তর ইরাকে স্বঘোষিত কুর্দী সরকারকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং ইরাকের বিভক্তি প্রতিরোধে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। (ইনকিলাব ঃ ১৬-১১-১৯৯২)

১৫) International Herald Tribune : 7-2-1996

১৬) এপি/ইনকিলাব ঃ ১৪-১০-১৯৯৪

১৭) নিউজউইক/ ইনকিলাব ঃ ২৩-২-১৯৯২

১৮) রয়টার/এসিয়াউইক /দ্য নেশন/আলমুজাদ্দেদ ঃ ৩০-৯-১৯৯৬

১৯) প্রাগুক্ত

২০) প্রাগুক্ত

২১) জনকণ্ঠ ঃ ১৬-১১-১৯৯৮

২২) كشورهای جهان - সূত্রান্তরে (The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World) শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩) Bangladesh Today : Vol. 1, issue 9, July 16—31, 1983

২৪) প্রাগুক্ত

২৫) মিল্লাত ঃ ৫-৯-১৯৯৩

২৬) ইনকিলাব ঃ ২৬-১১-১৯৯৩

২৭) Crescent International : Nov. 1—15, 1997

২৮) IPS : 16-8-1993

২৯) প্রাগুক্ত

৩০) AP/Daily Star : 3-8-1999

৩১) এপি/সংগ্রাম ঃ ২৭-১১-১৯৯৯

৩২) পশ্চিম সাহারার জনসংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সূত্রের তথ্য বিশ্লেষণে সর্বনিম্ন ৩ লাখ এবং সর্বোর্ধ ১২ লাখ বলে অনুমিত হয়। যেসব সূত্রে জনসংখ্যা কম দেখানো হয়েছে তাতে সম্ভবতঃ দেশত্যাগীদের হিসাব ধরা হয় নি।

www.pathagar.com

# মুসলিম বিশ্বে ক্রুসেডারদের ক্রূর থাবা

ইহূদী ও খৃষ্টানরা ইসলাম ও মুসলমানের চিরদুশমন। হযরত রসূলে আকরামের (সঃ) যুগ থেকেই তাদের এ দুশমনী চলে এসেছে। মদীনার চুক্তিবদ্ধ ইহূদীদের মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং নাজরানের খৃষ্টানদের দুশমনী ও মুবাহালার মুখে পরাজয় স্বীকার ইসলামের ইতিহাসে ইসলাম বনাম ইহূদী-খৃস্টান সংঘাতের সূচনা নির্দেশ করে। পরে বিশ্বের অনেকগুলো দেশেই খৃষ্টানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করায় ইঞ্জিল বিকৃতকারী খৃষ্টান যাজকগোষ্ঠী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক স্বৈরাচারী নিপীড়ক শাসকবর্গ সব সময়ই ইসলাম-বিদ্বেষ পোষণ করে আসছিল। অন্যদিকে তৃতীয় যেসব দেশে খৃষ্টান ও মুসলমানরা পাশাপাশি দ্বীন প্রচারের জন্যে গিয়েছে সেসব দেশে ইসলামের মোকাবিলায় খৃস্টবাদ পাত্তা পায় নি। কেবল রুশ সম্রাট ক্যাথলিক খৃস্টবাদে মদপানের অনুমতি থাকায় ইসলাম গ্রহণ না করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেন। আর ইহূদীদের যেহেতু কোন শক্তি ও রাজত্ব ছিল না সেহেতু তারা ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনী চরিতার্থ করতে গিয়ে হয় খৃস্টানদের সাহায্য নিয়েছে, নয়ত খৃস্টবাদকে সাহায্য করেছে।

এরপর ৪৯১ হিজরীতে ইউরোপের খৃস্টান ধর্মনেতারা সেখানকার শাসকদের সহায়তায় বায়তুল মুকাদ্দাস দখলের লক্ষ্যে প্রথম ক্রুসেড-যুদ্ধ শুরু করেন। এ অভিযানে তারা পথে পথে অসংখ্য বেসামরিক মুসলমানকে হত্যা করে, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে, বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করে, গাছপালা, ফল-ফসল ধ্বংস করে। ধর্মের নামে তারা চরম নারকীয় কাণ্ড ঘটিয়ে ৪৯২ হিজরীতে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে। এ সময় তারা মুসলমানদের কোন কোন মসজিদকে গীর্জায় পরিণত করতেও দ্বিধা করে নি।

ক্রুসেডাররা একানব্বই বছর বায়তুল মুকাদ্দাস সহ ফিলিস্তিন জবরদখল করে রাখে এবং মুসলমানদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। এরপর বীর সালাহুদ্দীন ৫৮৩ হিজরীতে বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধার করেন। কিন্তু ক্রুসেডাররা থামে নি। বরং এরপর দ্বিতীয় থেকে সপ্তম ক্রুসেড পর্যন্ত খৃস্টানদের বায়তুল মুকাদ্দাস দখল অভিযান চলে এবং প্রতিটি অভিযানেই তারা কমবেশী পৈশাচিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে।

সর্বশেষ ক্রুসেড-যুদ্ধের পর ১৪৯২ খৃস্টাব্দে স্পেনে খৃস্টানরা মুসলমানদেরকে নির্মূলকরণের অভিযান চালায়। তারা মুসলমানদের পাইকারী হারে হত্যা করে, এমন কি অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। অনেক দুর্বল-ঈমান মুসলমান প্রাণ বাঁচাতে খৃস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়। অনেকে ঈমানসহ পালিয়ে বাঁচতে আটলান্টিক মহাসাগরে জাহাজ

www.pathagar.com

ভাসিয়ে কলম্বাসের আগেই আমেরিকায় (মধ্য আমেরিকায়) পৌঁছে। পরবর্তীকালে ফিলিপাইনের মুসলমানদের বিরুদ্ধেও ক্রুসেডাররা একই পন্থার অর্থাৎ হত্যা, নির্যাতন ও জোর করে খৃস্টানকরণের পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে স্পেন যেমন মুসলিমশূন্য হয় তেমনি ফিলিপাইনে সংখ্যাগুরু মুসলমানরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপীয় খৃস্টানরা বণিকের বেশে মুসলিম দেশসমূহে আগমন করে এবং খুব শ্রীঘ্রই এসব দেশকে দখল করে নেয়। খৃস্টানদের রাজনৈতিক-সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার আগে বা পরে খৃস্টান মিশনারীরা ঐসব দেশে এসে খৃস্টধর্ম প্রচার করতে কাজে লেগে যায়। কিন্তু ইসলামের বিচারবুদ্ধিভিত্তিক আদর্শের মোকাবিলায় খৃস্টবাদের অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকিদা পাত্তা পায় নি। এমতাবস্থায় তারা একদিকে অমুসলিমদের, বিশেষ করে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও যোগাযোগে অনগ্রসর উপজাতীয়দের খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াস পেতে থাকে, অন্যদিকে উপনিবেশিক সরকারের সাথে সহযোগিতাক্রমে পশ্চিমা অনৈতিক ও নগ্ন সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়ে উপনিবেশসমূহের মুসলমানদেরকে (এবং অমুসলমানদেরকেও) পশ্চিমা সংস্কৃতির মানসিক সেবাদাসে পরিণত করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালায় এবং এতে বহুলাংশে সফল হয়।

কিছু সংখ্যক উপনিবেশিক সৈনিকের পক্ষে বিরাট সংখ্যক মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানো সম্ভব ছিল না বিধায়ই খৃস্টান শাসকগোষ্ঠী ও মিশনারীরা মুসলমান ও উপনিবেশসমূহের অন্যান্য জনগণকে 'খৃস্টীয়করণ বা পাশ্চাত্যকরণ' নীতি গ্রহণ করে তাদেরকে চিরতরে খৃস্টশক্তির গোলামে পরিণত করে রাখার ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে।

উপনিবেশিক শক্তি এক্ষেত্রে তাদের 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' পলিসিও কার্যকরী করে। তারা মুসলিম শাসকদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে বা মুসলিম-অমুসলিম শাসকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তাদের সকলকেই নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং তাদের রাজত্ব গ্রাস করে নেয়। এ নীতিরই প্রয়োগ করে তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইহুদীদের সহায়তায় তুর্কী জাতির মধ্যে নব্য তুর্কী আন্দোলনের সৃষ্টি করে। (তুর্কীরা যে ক্ষেত্রবিশেষে অ-তুর্কীদের বিরুদ্ধে অন্যায়-অত্যাচার শুরু করে সম্ভবতঃ তার পিছনেও উপনিবেশবাদী খৃস্টান ইংরেজদের হাত ছিল।) এই প্রথম বার মুসলমানদের মধ্যে ভাষা ও বংশভিত্তিক জাতীয়তাবোধ অনুপ্রবেশ করে মুসলিম উম্মাহ্‌র বৃহত্তর ঐক্যে চিড় ধরাতে সক্ষম হয়। এই নব্য তুর্কীরা একদিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দাবী তুলে মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিকে দুর্বল করে ফেলে, অন্যদিকে ফিলিস্তিনে বহিরাগত ইহুদীদের পুনর্বাসনসুবিধা প্রদানের জন্যে দালালী করতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আরবদের মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদের বিস্তার ঘটায় যার ফলে মক্কার শাসক শরীফ হোসেনের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

আরবরা তুর্কী ওসমানী খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এভাবে আরব মুসলমানদের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের সর্বশেষ ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যুদ্ধশেষে তারা গোটা আরবের কর্তৃত্ব শরীফ হোসেনকে প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, বরং আরব জাহানকে বহু ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করে প্রতিটিতে তাবেদার শাসক বসিয়ে দেয়। এভাবেই ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, কুয়েত, সউদী আরব ও মিসর স্বতন্ত্র বৃটিশ তাবেদার দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য এক চুক্তিবলে বৃটেন ঐ সময় সিরিয়া ও লেবাননকে ফ্রান্সের অছিগিরিতে অর্পণ করে। আর ফিলিস্তিনকে নিজেদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রেখে সেখানে একটি ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সারা দুনিয়ার ইহূদীদের সেখানে এনে জড়ো করার ব্যবস্থা করে।

মক্কার শরীফ হোসেন আরব জাহানকে টুকরো টুকরো করার বিরোধিতা করলে বৃটিশরা আবদুল আজিজকে সহায়তা দিয়ে শরীফকে উৎখাত করে। এরপর নব্য তুর্কী আন্দোলনের সদস্য মোস্তফা কামাল পাশার মাধ্যমে তুর্কী খেলাফত উৎখাত করে তুরস্কে ধর্মবিরোধী (সেক্যুলার) রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করে। কামাল পাশা শুধু ইসলামকে উৎখাত করার জন্যেই পদক্ষেপ নেন নি, বরং তুর্কীদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কহীন করার লক্ষ্যে আরবী বর্ণমালাকে পর্যন্ত বিদায় করে দেন। অন্যদিকে বৃটিশরা ইরানে তাদের দালাল রেযা খানকে ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত করে।

এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর দেখা গেল ক্রুসেডার-শক্তি তৎকালীন বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী মুসলমানদেরকে বহুধাবিভক্ত করে উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে তাদেরকে বিলুপ্ত করে ফেলতে সক্ষম হয়।

খৃস্টান ক্রুসেডাররা তাদের শাসিত উপনিবেশসমূহের মুসলিম ও অমুসলিম জনগণের শক্তির ধ্বংসসাধন ও তাদের সম্ভাব্য উত্থান প্রতিহত করার লক্ষ্যে 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' পলিসির আওতায় অন্য যে কাজটি করে তা হচ্ছে এসব দেশে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি।

একটি পূর্ণ বা সমগ্র বস্তুকে বিভিন্ন অংশে (Part) বিভক্ত করার পর যেমন আর ঐ বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, বরং ঐ বস্তু হিসেবে তার ধ্বংস ও বিলুপ্তি ঘটে, তেমনি একটি জাতিকে যখন পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন পার্টিতে বিভক্ত করা হয় তখন ঐ জাতির আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। তাই উপনিবেশিক শক্তিসমূহ তাদের দ্বারা শাসিত জাতিসমূহকে দুর্বল ও ধ্বংস করার জন্যেই ঐ সব জাতির মধ্যে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের বিস্তার সাধনের ন্যায় রাজনেতিক দলের প্রবর্তন করে। আর ইসলাম ও মুসলমানের শক্তি যেহেতু ঐক্যে নিহিত, এভাবে তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ফেলায় জাতি হিসেবে তারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, তাদের চিরদুশমন সাম্রাজ্যবাদী খৃস্টান ক্রুসেডারদের সেবায় নিয়োজিত থাকতে ও তাদের তাবেদারীকে মাথা পেতে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করলেও আমেরিকা ছাড়া মিত্রশক্তির অন্যান্য সদস্য অর্থাৎ বৃটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন ইত্যাদি উপনিবেশবাদী শক্তি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যুদ্ধে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্যে তারা উপনিবেশবাদকবলিত জাতিসমূহকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তুলেছিল এবং প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রতিপাদনের জন্যে ইতিমধ্যেই স্থানীয় প্রশাসন দেশী লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, স্বাধীনতা দেয়া না হলে উপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক শাসিত জনগণ সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিত।

এমনি এক পরিস্থিতিতে আমেরিকা বিশ্ববাসীর সামনে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শ্লোগান নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দানের জন্যে উপনিবেশিক শক্তিগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, যদিও উপনিবেশিক শক্তিগুলো ইতিমধ্যেই অনন্যোপায় হয়ে স্বাধীনতা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আমেরিকা তার কৃত্রিম শ্লোগানের দ্বারা বিশ্ববাসীর সামনে কপট মুক্তিদাতার ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা লাভের পর আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

উপনিবেশিক শাসকরা উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা-সনদ ঐসব লোকদের নিকট হস্তান্তর করে যারা নামে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ বা ভারতীয়, ইন্দোচীনী, আরব ইত্যাদি হলেও চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র-আচরণে তথা সংস্কৃতিতে ও মন-মানসে ছিল খৃস্টান ও ইউরোপীয়। ফলতঃ এসব দেশে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হলেও পরোক্ষভাবে ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণই অব্যাহত থাকে। তবে এবার নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্র হয় আমেরিকা। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা বিগত যুগের সামরিক উপনিবেশবাদের পরিবর্তে অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে এগিয়ে আসে—যার সাথে বিশ্ববাসী ইতিপূর্বে পরিচিত ছিল না।

আমেরিকা এসব দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্যে কৃত্রিম দরদ দেখিয়ে নতুনরূপে মহাজনী কায়দায় ঋণের ডালি নিয়ে হাজির হয়। উন্নয়নের মোহে এসব দেশের সরকারগুলো আমেরিকার নিকট স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বন্ধক দিয়ে বসে এবং নিজ নিজ দেশকে মার্কিন পণ্যের বাজারে পরিণত করে। একই সাথে পশ্চিমা সংস্কৃতির তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা সম্বলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উপাদানে এসব দেশে সয়লাব বয়ে যায়। এ কারণে সদ্যস্বাধীন মুসলিম দেশসমূহে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মবিরোধিতা তথা ইসলাম-বিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করে। গোটা সমাজের

www.pathagar.com

সাধারণ শিক্ষা-সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায় ইসলাম-বিরোধী। সাধারণভাবে ধর্মকে এবং বিশেষভাবে ইসলামকে, আরো বিশেষভাবে আলেম সমাজ ও দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার জন্যে দায়ী করা হতে থাকে।

এতসব সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে-পরে মুসলিম জাহানের বেশীর ভাগ অংশেই অতীত প্রক্রিয়ার বরখেলাফে রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। মুসলিম জনগণের মধ্যে গণজাগরণ সৃষ্টিতে এসব আন্দোলন বিরাট ভূমিকা পালন করলেও সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা এসব আন্দোলনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহারের ষড়যন্ত্রে সফল হয়। যদিও আমেরিকার শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি বস্তুবাদ, নাস্তিক্য এবং মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর ভিত্তিশীল, তথাপি তারা নিজেদের খৃস্ট ধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিচয় দিয়ে কম্যুনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে এসব আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। ফলতঃ এসব ইসলামী আন্দোলনের প্রধান রাজনৈতিক ভূমিকা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে হয়ে দাঁড়ায় কম্যুনিজম ঠেকানো।

এর পাশাপাশি আমেরিকান আধিপত্যের এ যুগে বিশ্বের অ-খৃস্টান দেশসমূহে, বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশে লোকদেরকে খৃস্টধর্মে দীক্ষাদান, অন্ততঃ ইসলামের প্রতি বিরূপ করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়। এ যুগে এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। সেই সাথে প্রকাশ্যে খৃস্টান মিশনারী তৎপরতাও চলতে থাকে। এভাবে ক্রুসেডার-শক্তি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে নবরূপে ক্রুসেডে অবতীর্ণ হয়ে সাফল্য অর্জন করে।

এভাবে ক্রুসেডার-শক্তি মূলতঃ মুসলমানদের ওপর সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু মার্কিন নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডাররা মুসলিম-সন্তান মানসিক খৃস্টানদের ওপরও আস্থা রাখতে পারে নি অর্থাৎ ক্রুসেডাররা তাদের তাবেদারীকে গ্রহণ করলেও স্বয়ং তাবেদারকে গ্রহণ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। এ কারণে মুলমানরা—তা ধর্মপ্রাণ হোক বা না-ই হোক—যাতে শক্তির অধিকারী হতে না পারে সে লক্ষ্যে তারা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে।

তারা বিভিন্ন মুসলিম দেশে পরিস্থিতি অনুযায়ী কোথাও জনগণকে দমনের পদক্ষেপ নেয়, আবার কোথাও তাদের ঐক্য ধ্বংসের পদক্ষেপ নেয়। কতগুলো রাজতান্ত্রিক সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন দিতে আমেরিকার বিবেকে বাধে নি। তেমনি অনেক দেশে আমেরিকা তার তাবেদারদের মাধ্যমে ক্যু-দেতা ঘটিয়ে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করায়, আবার কোথাও বা গণতন্ত্রের নামে বিভিন্ন দল সৃষ্টি ও তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে।

www.pathagar.com

আমেরিকা একদিকে এসব দেশকে তার বাজারে পরিণত করে, অন্যদিকে এরূপ কোন দেশ যাতে বড় ধরনের সামরিক শক্তিতে পরিণত হতে না পারে তার ব্যবস্থা করে। বিশ্বের বুকে বহু পারমাণবিক শক্তি গড়ে উঠলেও কোন মুসলিম দেশ যাতে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে না পারে আমেরিকা সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। ফলে ভারত, ইসরাইল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, চীন ইত্যাদি বহু দেশ সত্তরের দশকের মধ্যেই পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হলেও পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, লিবিয়া বা সিরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হবার দূরতম সম্ভাবনাকেও আমেরিকা গলা টিপে হত্যা করার প্রয়াস পায়।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' পলিসির সাহায্যে ভারতবাসীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করে গোটা ভারত দখল করে নির্বিঘ্নে শাসন করে। বিদায়বেলা, ভারতীয় উপমহাদেশ যাতে একটি পরাশক্তিতে পরিণত হতে না পারে সে লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত সৃষ্টি করে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মধ্যকার একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর মাধ্যমে মুসলমানদের ওপর বঞ্চনা চাপিয়ে দিয়ে ভারত-বিভাগের পথ প্রশস্ত করে। ভারত-বিভাগের পর স্বাধীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে—যারা নামে মুসলমান হলেও মনে-মগজে ছিল কালো ইংরেজ—তারা এমনভাবে পরিচালনা করে যে, পাকিস্তান একটি শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার পূর্বেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে বাধ্য হয়। বর্তমান ক্ষুদ্রতর পাকিস্তানকেও ক্রুসেডাররা চার খণ্ডে বিভক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

তারা ইরানের ওপর আমেরিকার পদলেহী রেযা শাহ্ পাহলভীকে চাপিয়ে রেখেছিল। কিন্তু শাহের পতন ও ইসলামী বিপ্লব সফল হবার পর পরই তারা ইরান থেকে বেলুচিস্তান, কুর্দিস্তান ও খুযিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করে যদিও তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা ইরাককে ইরানের ওপর হামলা করতে প্ররোচিত করে এবং ইরানকে ধ্বংস করার জন্যে ইরাককে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু যুদ্ধ জয়-পরাজয়বিহীনভাবে শেষ হলে ইরাকের হাতে পুঞ্জিভূত বিপুল সমরাস্ত্রের ভাণ্ডার এবং বিশাল সেনাবাহিনী দেখে ক্রুসেডাররা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই আমেরিকা ইরাককে কুয়েত দখলের উস্কানি দেয় এবং কুয়েত দখল হবার পর কুয়েত উদ্ধারের ছুতায় ইরাকের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

আমেরিকা ইরাকের শিয়া ও কুর্দীদেরকে তারই পোষা সাদ্দাম-সরকারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের উস্কানি দেয়, কিন্তু গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হবার পর আমেরিকারই সবুজ সংকেতক্রমে সাদ্দাম সরকার তা দমন করে। বৃটিশরা মধ্যপ্রাচ্যকে স্বাধীনতা দেয়ার সময় কুর্দীদের জন্যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে দেয় নি। কিন্তু পরে বৃটেন, ফ্রান্স ও

www.pathagar.com

আমেরিকার ষড়যন্ত্রে স্বাধীন কুর্দিস্তানের আন্দোলন গড়ে উঠে ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্ক—এই চারটি মুসলিম দেশের ভৌগলিক অখণ্ডত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে।

সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও তার মিত্ররা কুয়েত উদ্ধারের নামে কুয়েত ও সউদী আরবের হাজার হাজার কোটি ডলার অর্থ আত্মসাত করে এসব ধনী দেশকে ঋণগ্রস্ত দেশে পরিণত করেছে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার আধিপত্য মেনে না নেয়ার অপরাধে, ক্রুসেডারকুলশিরোমণি আমেরিকা ইরান, লিবিয়া ও সূদানের নাম সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক দেশের তালিকাভুক্ত করেছে এবং এ তিনটি দেশের ওপর নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে চলেছে। পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, লিবিয়া ও সুদানের বিরুদ্ধে আমেরিকা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেশগুলোর অগ্রগতি রোধ করার অপপ্রয়াস পাচ্ছে।

## ক্রুসেডারদের 'ইসলাম ঠেকাও' অভিযান

হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ)-এর নেতৃত্বে ইরানের ইসলামী বিপ্লব বিগত চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় যুগান্তকারী ঘটনা। হযরত রসূলে আকরামের (সঃ) বিপ্লবের পর ইসলামের ইতিহাসে তো দূরের কথা, মানব জাতির ইতিহাসেও এত বড় বিপ্লব সংঘটিত হয় নি। কারণ, এ বিপ্লব সমকালীন বিশ্বের বৃহত্তম পরাশক্তি আমেরিকাকে ইরান থেকে উৎখাত করেছে। তাই ক্রুসেডারদের নেতা আমেরিকা কয়েক পর্যায়ে এ বিপ্লবকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী হুকুমতকে ধ্বংস করার জন্য আমেরিকা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে সংক্ষেপে তা হচ্ছে ঃ (১) বিপ্লব সফল হবার পূর্বে শাহের মাধ্যমে বিপ্লবীদের হত্যা, নির্বাসন ও কারাগারে নিক্ষেপ এবং দেশকে পশ্চিমা নগ্ন, অশ্লীল ও ভোগবাদী সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত করে তরুণ সমাজকে ইসলাম-বিরোধী করণের প্রয়াস, (২) বিপ্লব সফল হবার পরে বিপ্লবীদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে দিয়ে ক্ষমতা হস্তগতকরণের প্রয়াস, (৩) বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মুজাহিদিনে খালক্-এর মাধ্যমে হত্যা-অভিযান পরিচালনা, (৪) কুর্দিস্তান, বেলুচিস্তান ও খুযিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র, (৫) চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের মাধ্যমে ইরানের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার প্রয়াস, (৬) আমেরিকাস্থ ইরানী সম্পদ আটক করণ ও ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক-অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ, (৭) ইরানের বাইরে এ বিপ্লবের প্রভাববিস্তার রোধকল্পে এ বিপ্লবকে একটি আগ্রাসী বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করে প্রতিবেশী আরব ও মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টিকরণ এবং (৮) শিয়া-সুন্নী বিতর্ক উস্কে দিয়ে সুন্নী জগতকে এ বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবার পথে বাধা সৃষ্টির প্রয়াস।

এ যুগে অর্থাৎ ১৯৮০-র দশকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে আগ্রাসী সর্বাত্মক অভিযান চালায় তাকে

www.pathagar.com

আমরা মোটামুটি নয় ভাগে ভাগ করতে পারি। তা হচ্ছে ঃ (১) ইরান বিরোধী প্রচার ও শিয়া-সুন্নী বিরোধ সৃষ্টি, (২) ইসলামী আন্দোলন বিরোধী প্রচার, (৩) মুসলিম শক্তিসমূহের উত্থান রোধ ও দমন, (৪) মুসলিম জাহানে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও গৃহযুদ্ধ উস্কে দেয়া, (৫) মুসলিম জাহানে খৃস্টান অভিযান, (৬) মুসলিম জাহানে খৃস্টীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অভিযান, (৭) ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিমূলক সাংস্কৃতিক অভিযান, (৮) ইসলামী আন্দোলন দমন ও নিশ্চিহ্নকরণ অভিযান, (৯) মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও গণহত্যার অভিযান।

রাষ্ট্রীয়ভাবে আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স সরাসরি ও বিশ্বব্যাপী তাদের তাবেদার সরকার, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহল এবং প্রচারযন্ত্রসমূহ ইরান-বিরোধী ও শিয়া-সুন্নী বিরোধ সৃষ্টিমূলক প্রচারাভিযান চালিয়ে যায়। তবে আমেরিকা কিছু সংখ্যক ইসলামী আন্দোলনকে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে এবং পরে কম্যুনিজম ও ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবহারের লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনসমূহের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রচারাভিযান না চালিযে বরং তার তাবেদার সরকার, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং একাজে ব্যবহার করতে থাকে।

মুসলিম শক্তির উত্থান রোধকল্পে আমেরিকা এবং অপর কতক ক্রুসেডার –শক্তি ইরান, পাকিস্তান ও লিবিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বিশেষ করে এ তিনটি দেশ যাতে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে না পারে সে লক্ষ্যে সর্বাত্মক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এমন কি এ চাপ অন্যান্য দেশের ওপরও সৃষ্টি করতে থাকে অর্থাৎ কেউ যেন এ ব্যাপারে মুসলিম দেশসমূহকে সহায়তা না করে। যেমন ঃ ইরানের নিকট পারমাণবিক রিএ্যাক্টর বিক্রি থেকে ভারত ও চীনকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। আর এ পর্যায়ে আমেরিকা তারই পোষা ইরাকের বাথপন্থী সরকারের সাথে যোগসাজশ করে কুয়েত-দখল নাটক মঞ্চস্থ করে ইরাকের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

ক্রুসেডাররা পাকিস্তান ও ইরানে বিচ্ছিন্নতাবাদের উস্কানিদান ছাড়াও কুর্দিস্তান ইস্যু সৃষ্টি করেছে, দক্ষিণ সূদানের খৃস্টান বিদ্রোহে মদদ দিচ্ছে, শাদে ও সোমালিয়ায় গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করেছে, ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তাইমুর ও ইরিয়ান জায়ায় এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। ক্রুসেডাররা আফগানিস্তানে কম্যুনিস্ট সরকারের পতনের পর সেখানকার মুজাহিদ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করে এবং বর্তমানে যে গৃহযুদ্ধ চলছে তাও তাদেরই ষড়যন্ত্রের ফল।

ক্রুসেডাররা মুসলিম জাহানে ও অন্যত্র খৃস্টধর্মের ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে এবং এ জন্যে বহুবিধ জঘন্য প্রলোভনেরও আশ্রয় নিচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা আর্থিক সাহায্য,

www.pathagar.com

স্থানীয়ভাবে চাকরি প্রদান, চাকরি দিয়ে বিদেশে প্রেরণ, সন্তানদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাকরণ এবং নারী উপঢৌকনসহ বিভিন্ন ধরনের ঘৃণ্য ও নোংরা প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিচ্ছে। ক্রুসেডাররা লেবাননকে খৃস্টান-সংখ্যাগুরু দেশে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে ইথিওপিয়া ও নাইজেরিয়াকে খৃস্টান সংখ্যাগুরু দেশে পরিণত করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস পাচ্ছে।

বিভিন্ন মুসলিম দেশের সরকারকে ইসলাম-বিরোধী ও ক্রুসেডারদের তাবেদার বানিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তারা বহুবিধ জঘন্য পন্থার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করছে না। এক্ষেত্রে তারা মিসর, ইরাক, মরোক্কো, তিউনিসিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে বিশেষভাবে সফল হয়েছে। আর জনগণকে খৃস্টান নেটওয়ার্কের কবলে বন্দী করার মাধ্যমে গোটা জাতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে তারা ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশেরই কোন এক প্রত্যন্ত গ্রামের একটি ঘটনার বিরুদ্ধে সেখানে কর্মরত '১৯টি এনজিও' যৌথভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে বলে সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ। একটি গ্রামে যদি ১৯টি এনজিও-র শাখা থাকতে পারে সেক্ষেত্রে দেশ যে এনজিওসমূহের দ্বারা দখল হয়ে গেছে তা বলাই বাহুল্য।

ইসলামের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচার কোন নতুন বিষয় নয়। বরং ইসলামের সোনালী যুগের পর থেকেই খৃস্টান ধর্মনেতারা ইসলামের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত প্রচারাভিযান চালিয়ে আসছে। এ পর্যাযে অসংখ্য বই-পুস্তক লেখা হয়েছে। সে সবের যথাযথ জবাবও দেয়া হয়েছে। তথাপি প্রচারাভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এ পর্যন্ত এসব প্রচার একাডেমিক পর্যায়ে ছিল, তাই তার জবাব দানও সহজ ছিল। কিন্তু আশির দশকের শেষের দিকে এসে ব্যাপক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু হয়। ইতিমধ্যে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় এবং ইরানে ইসলামী বিপ্লব সকল বাধা পায়ে দলে টিকে যাওয়ায় বিশ্বব্যাপী ইসলামী গণজাগরণ আসে এবং ইসলামের বিজ্ঞানসম্মত প্রচার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় যার মোকাবিলা করা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম খৃস্টবাদের পক্ষে তো সম্ভব নয়ই, বরং বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ, মার্ক্সবাদ ও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় স্বয়ং পাশ্চাত্য জগতে খৃস্টানদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে যায়। তাই ক্রুসেডাররা এবার নতুন অস্ত্রের আশ্রয় নেয়। তারা ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র ব্যক্তিত্বগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের উপকরণে পরিণত করার লক্ষ্যে গল্প, উপন্যাস ও সিনেমা ফিল্ম তৈরিতে হাত দেয়।

এ পর্যায়ে তাদের জঘন্যতম সৃষ্টি হচ্ছে কুখ্যাত সালমান রুশদীর উপন্যাস 'স্যাটানিক ভার্সেস'। এটি মূল ভাষা ইংরেজীতে ছেপে বের হবার আগেই অন্ততঃ

www.pathagar.com

আশিটি ভাষায় এর অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয় এবং ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কপি অগ্রিম অর্ডারের ব্যবস্থা করা হয়। তাকে বৃটেনে সর্বোচ্চ সাহিত্যপুরস্কারও দেয়া হয়। তবে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ)-এর ফতোয়া এবং বিশ্বের ঈমানদীপ্ত মুসলমানদের প্রতিরোধের ফলে ক্রুসেডারদের এ মোক্ষম হাতিয়ার লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়।

এ পর্যায়ে, ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণে ইরান ক্রুসেডারদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিশেষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। একদিকে ইরানী জনগণকে এ বিপ্লব থেকে ফিরানোর লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় দেড়শ' রেডিও স্টেশন থেকে ফারসী ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করে বিপ্রব, তার নেতা ইমাম খোমেনী (রঃ) ও ইরান সরকারের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। অন্যদিকে ইউরোপে গড়ে অন্ততঃ সপ্তাহে একটি করে ইরান-বিরোধী বই প্রকাশিত হয়। আর সর্বোপরি 'নট্ উইদাউট্ মাই ডটার'সহ অনেকগুলো বিভ্রান্তিকর সিনেমা ফিল্ম তৈরী করে ইরান ও ইরানীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও জিঘাংসা সৃষ্টির চেষ্টা চলে।

ইসলামী আন্দোলন দমন ও নিশ্চিহ্নকরণ অভিযানের দু'টি পর্যায়ঃ (১) ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর প্রচারের মাধ্যমে জনমনে এ সম্পর্কে ভীতির সৃষ্টিকরণ এবং (২) শক্তিপ্রয়োগে আন্দোলনের উৎখাত।

ইসলামী আন্দোলনসমূহের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার গতানুগতিক দিকগুলো হচ্ছেঃ চৌদ্দশ' বছর আগের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, বৈজ্ঞানিক উপায়-উপকরণ বর্জন, অমুসলিমদের হত্যা-নির্যাতন ও বিতাড়ন, নারীকে চার দেয়ালের অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখা ও অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ ইত্যাদি কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন। এই সাথে আশির দশকে সন্ত্রাসবাদের কল্পিত অভিযোগ যোগ হয়েছে এবং মৌলবাদের লকব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ইরানকে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং লেবাননের হিযবুল্লাহ্, ফিলিস্তিনের হামাস ও জিহাদে ইসলামী, মিসরের জিহাদে ইসলামী ও ত্বালি'উল্ ফাৎহ্ প্রভৃতিকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমন কি মিসরের অন্ধ ইসলামী নেতা হাফেয ওমর আবদুর রহমানকে আমেরিকার বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রে বিস্ফোরণের জন্যে অভিযুক্ত করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

এছাড়া ইসলামী আন্দোলনকে সরাসরি দমন ও নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ক্রুসেডাররা বিভিন্ন দেশে তাদের তাবেদার সরকারগুলোকে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছে। অতীতেও ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্রের ফলে তাদের তাবেদার সরকারগুলো সূদানে, মিসরে, ইন্দোনেশিয়ায়, তুরস্কে ও ইরাকে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান চালিয়েছে। আর আশি ও নব্বই-এর দশকে আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও মিসরে

www.pathagar.com

চরমভাবে হত্যা ও দমননীতির মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন ধ্বংসের প্রয়াস চলে। তুরস্কে, সউদী আরবে ও জর্দানে অতটা তীব্র না হলেও দমননীতি চলছে। তাজিকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে সেখানকার কম্যুনিস্ট সরকারকে সহায়তা দানের জন্যে রাশিয়ার সাবেক কম্যুনিস্ট অর্থোডক্স খৃস্টান সরকার সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে।

কোন কোন দেশে পারিপার্শ্বিক কারণে ইসলামী আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে ভিন্নতর পন্থার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। যেমন ঃ বাংলাদেশে এক গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র চলছে যার হোতা এই ক্রুসেডাররা বৈ নয়।

এ প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় স্মরণ করার মত। তা হচ্ছে ঃ গণতন্ত্রের লেবাসধারী ক্রুসেডার পাশ্চাত্য ইসলামী আন্দোলনকে দমন ও নিশ্চিহ্নকরণের লক্ষ্যে ডিক্টেটরশীপ, সামরিক অভ্যুত্থান ও রাজতন্ত্রকে সমর্থন দিতে দ্বিধা করছে না। আলজেরিয়ার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতায় আসতে না দিয়ে যে সামরিক স্বৈরতন্ত্র ক্ষমতা দখল করে গোটা ক্রুসেডার-বিশ্ব ও তাদের তাবেদার সরকারগুলো তাকে সমর্থন করে। আমেরিকা ও তার নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ আফ্রিকার খৃস্টান দেশগুলোতে উন্নয়নসাহায্য দানের জন্যে সাম্প্রতিককালে তথাকথিত গণতন্ত্রায়নের শর্ত জুড়ে দেয়, যদিও ঐ সব ডিক্টেটর আমেরিকারই তাবেদার এবং দীর্ঘ কয়েক যুগ যাবত আমেরিকারই খেদমত করে এসেছে। কিন্তু মুসলিম জাহানে আমেরিকা গণতন্ত্রায়নের বিরোধী এবং রাজা-বাদশাহ্ ও সামরিক-অসামরিক ডিক্টেটরদের টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী। কারণ, আমেরিকার ভয়, মুসলিম জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার পেলে হয়ত ইসলামের পক্ষে রায় দিয়ে বসবে। যদিও পুঁজিবাদনির্ভর গণতান্ত্রিক নির্বাচনে—যেখানে শোষণলব্ধ কোটি কোটি টাকা ব্যয় না করে নির্বাচনে জয়লাভ সম্ভব নয়—প্রকৃত ইসলামী শক্তির পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব, তথাপি আমেরিকা এ ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে রাজী নয়।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে ঃ কম্যুনিজমের পতনের পরে আমেরিকা যে কোন ধরনের ইসলামী শক্তির উত্থান রোধে বদ্ধপরিকর, তা সে শক্তি খাঁটি বিপ্লবী ও প্রগতিশীল ইসলামী শক্তিই হোক, বা গোঁড়া, প্রগতিবিরোধী বা বিকৃত-বিভ্রান্তই হোক। আমেরিকা ও ক্রুসেডারদের নিকট এক্ষেত্রে সকল ইসলামী শক্তি অভিন্ন। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পূর্বে যেসব ইসলামী আন্দোলনকে তারা ইরান ও কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি-পরবর্তী যুগে 'ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য' সরাসরি যুদ্ধে তারা ঐ সব ইসলামী আন্দোলনকেও নিশ্চিহ্নকরণের পক্ষপাতী যদিও এ কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের ইসলামী আন্দোলনকে তারা পুরোপুরি সঠিক ধারার ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের পূর্বতন প্রক্রিয়াও অব্যাহত রেখেছে।

www.pathagar.com

ক্রুসেডাররা শুধু দ্বীনদার, ইসলামপন্থী বিপ্লবী মুসলমানদের দমন করেই সন্তুষ্ট নয়, বরং মুসলমানদের সংখ্যাশক্তিও তাদের নিকট একটি বড় ব্যাপার। কারণ, গণযুদ্ধে এ যুগে পারমাণবিক বোমা কৌশলগত অস্ত্রে পরিণত হয়ে কার্যতঃ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং জনশক্তির গুরুত্ব পুনঃপ্রত্যাবর্তন করেছে। অন্যদিকে গণজাগরণে জনগণই হচ্ছে আসল উপাদান। তৃতীয়তঃ তাদেরই প্রচারিত তথাকথিত গণতন্ত্রে সংখ্যাশক্তিই নির্ণয়ক উপাদান। পশ্চিমা গণতন্ত্রে অর্থ নির্ণয়ক ভূমিকা পালন করলেও কখনো না কখনো তা অকার্যকর হবার ভয় তারা উড়িয়ে দিতে পারছে না। এ কারণে তারা মুসলিম দেশসমূহে ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূরীকরণের পরিবর্তে জন্মশাসনে অধিকতর আগ্রহী এবং এ জন্যে শত শত কোটি ডলার ব্যয় করে চলেছে।

কিন্তু পাশ্চাত্যে পরিস্থিতি বিপরীত। এক সময় যে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে তারা প্রচার চালিয়েছে এখন তারা শত চেষ্টা করেও তা থেকে নিজ জনগণকে মুক্ত করতে পারছে না। তারা তাদের লোকদেরকে ভোগবাদী বানিয়ে ফেলেছে ; এখন অনেকে দু'টি কি একটি সন্তানও চায় না। ফলে কোন কোন পশ্চিমা দেশে জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তাই পাশ্চাত্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার তো দূরের কথা, বরং জন্মহার বৃদ্ধির জন্যে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে, যেমন ঃ হাসপাতাল ও নার্সারীর সুবিধা, প্রসূতিছুটি, সন্তানভাতা, শিক্ষার সুযোগ, সমাজকল্যাণ দফতরের ভাতা, বিভিন্ন ধরনের কর রেয়াত ইত্যাদি। কিন্তু ভোগবাদে নিমজ্জিত পশ্চিমা জনগণ এসবে আকৃষ্ট হচ্ছে না। তাই স্বয়ং পোপ জন্মনিয়ন্ত্রণ ও এ জন্যে পাশ্চাত্যে বহুল ব্যবহৃত প্রক্রিয়া গর্ভপাতের বিরুদ্ধে আরেক ক্রুসেড শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কোন ফল হচ্ছে না।

অন্যদিকে ঐসব সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার করে পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলমানদের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু এ কারণেই বেশ কয়েকটি দেশে দেশীয় খৃস্টান জনগণ আগামী পঞ্চাশ বছর পর সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এরই পাশাপাশি ঐ সব দেশে ইসলামের প্রচার অব্যাহত রয়েছে এবং ক্রমেই খৃস্টানরা ব্যাপকভাবে দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। এ কারণে, উদারতা, সহনশীলতা, মানবাধিকার ও তথাকথিত গণতন্ত্রের দাবীদার পশ্চিমা ক্রুসেডাররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও দমন–অভিযান এবং গণহত্যার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

সিআইএ-র এজেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকার নির্দেশে এ পরাশক্তিটির বিলুপ্তি ঘটানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এতে স্বতঃই ঐ দেশের মুসলমানরাও লাভবান হয় যা আমেরিকা সহ্য করতে পারে নি। কারণ তা তার কাম্য ছিল না। এ কারণেই আমেরিকা সেখানে মুসলমানদের দমনে পুরোপুরি সহায়তা দিয়েছে ও দিচ্ছে।

www.pathagar.com

গর্বাচেভের আমলে লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান সেখানে শক্তি প্রয়োগে গর্বাচেভকে নিষেধ করেন এবং গর্বাচেভ তা মেনে নেন। অন্যদিকে নগর্নো-কারাবাগে খৃস্টানদের দ্বারা মুসলিম গণহত্যার প্রতিবাদে আযারবাইজানের মুসলমানরা হরতাল করলে পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের প্রকাশ্য সমর্থনক্রমে গর্বাচেভ সাড়ে তিন হাজার মুসলমানকে হত্যা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

মুসলিম সংখ্যাশক্তির দ্রুত বৃদ্ধিতে ভীত ক্রুসেডাররা সারা ইউরোপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দমননীতির আশ্রয় নিচ্ছে যাতে তারা ইউরোপ ছেড়ে চলে যায়। ফ্রান্সে মুসলমানদের মসজিদ ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়তে বাধা দেয়া হচ্ছে,[১] চালু মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে,[২] মুসলমানদের কবরের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে,[৩] মুসলিম মেয়েদের মাথায় ওড়না পরে স্কুল-কলেজে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না।[৪]

জার্মানীতে বহিরাগত মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে, এমন কি হত্যার ঘটনাও ঘটছে। গ্রীসে মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণে বাধা দেয়া হচ্ছে। সুইডেনে অগ্নিসংযোগ করে মসজিদকে ধ্বংস করা হয়েছে।[৫] বৃটেনেও মসজিদে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে[৬] এবং বোমা নিক্ষেপের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

একাধিকবার আলবেনিয়া ও মেসিডোনিয়ার মুসলমানদের—যারা সেখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ—তাদেরকে মুসলিম পরিচিতি বর্জনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর স্পেন ও ফিলিপাইনে যেভাবে গণহত্যার আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের যথাক্রমে নিশ্চিহ্ন ও সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও কসোভোর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডাররা জাতিগত নির্মূলকরণ অভিযান পরিচালনা করেছে।

এছাড়া আযারবাইজানের নগোর্নো-কারাবাগে, দক্ষিণ সূদানে, ইন্দোনেশিয়ায়, সোমালিয়ায় ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গন খুলেছে ক্রুসেডাররা। এসব রণাঙ্গনে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে; কবে শেষ হবে তা কেউ জানে না। আর সেই সাথে রয়েছে ক্রুসেডারদের পরোক্ষ রণাঙ্গন ফিলিস্তিন যেখানে তারা তাদের তাবেদার ইহূদীদের মাধ্যমে ক্রুসেড চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার আমরা এ রক্তক্ষয়ী রণাঙ্গনগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

## ফিলিস্তিনে

ইসলামের প্রথম কিবলাহ্ বায়তুল মুকাদ্দাস ফিলিস্তিনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বহু নবী-রসূলের (আঃ) স্মৃতিবিজড়িত বায়তুল মুকাদ্দাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ছিল ফিলিস্তিনের রাজধানী। এই বায়তুল মুকাদ্দাস থেকেই হযরত রসূলে আকরাম (সঃ) মি'রাজ গমন করেন।

www.pathagar.com

শুধু বায়তুল মুকাদ্দাসই নয়, বরং গোটা ফিলিস্তিন ভূখণ্ড মুসলমানদের নিকট বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। কারণ, এর প্রতিটি অংশেই বহু নবী-রসূলের (আঃ) স্মৃতি জড়িত রয়েছে। গোটা ফিলিস্তিনের, বিশেষ করে বায়তুল মুকাদ্দাসের এই পবিত্র মর্যাদার কারণেই হযরত ওমরের (রাঃ) সময় রক্তপাত এড়িয়ে দেশটিকে ইসলামী হুকুমতভুক্ত করা হয়। কিন্তু খৃস্টান ক্রুসেডাররা ফিলিস্তিন দখলের জন্যে বার বার রক্তের বন্যা বইয়েছে। গাযী সালহুদ্দীন ফিলিস্তিন উদ্ধার করার পরও তারা বার বার হামলা চালিয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। তবে তারা ফিলিস্তিন দখলের লক্ষ্য পরিত্যাগ করে নি। অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাদের জন্যে সে সুযোগ নিয়ে আসে।

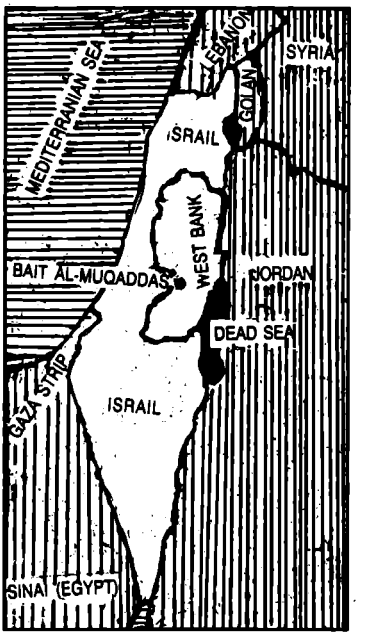


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ষড়যন্ত্রকারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তুর্কী ও আরব মুসলমানদের মধ্যে যথাক্রমে তুর্কী ও আরব জাতীয়তাবাদের বিষবৃক্ষ রোপণ করে এবং তাদেরই উস্কানিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে মক্কার শাসক শরীফ হোসেনের নেতৃত্বে আরবরা তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তুর্কীদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে। কিন্তু এ যুদ্ধে, পূর্বাহ্নিক ষড়যন্ত্র অনুযায়ী বৃটিশ জেনারেল এ্যালেনবি ফিলিস্তিন দখলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস দখলের পর বলেন ঃ "ক্রুসেড শেষ হল।"

তবে সমকালীন পরিস্থিতির আলোকে ফিলিস্তিনে খৃস্টান শাসন কায়েম করার বা করলেও টিকিয়ে রাখার মত কোন অবস্থা ছিল না। এমতাবস্থায়, মুসলমানদের রক্তপাতের স্থায়ী ব্যবস্থা করার জন্যে বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিনে একটি ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। বৃটিশ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত ইহূদী নেতাদের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে এ ঘোষণা দেয়া হয়। ক্রুসেডারদের ভালই জানা ছিল, এখানে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে তাদের ওপরই নির্ভর করে টিকে থাকতে হবে। তাই ক্রুসেডাররা ফিলিস্তিনে ইহূদীদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে।

১৮৯৭ সালে ইহূদীদের আন্তর্জাতিক যায়নবাদের আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাসম্মেলনে ফিলিস্তিনে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরই ভিত্তিতে নব্য তুর্ক

www.pathagar.com

আন্দোলনকারীদের চাপে ফিলিস্তিনে ইহূদী পুনর্বাসন শুরু হয়। তথাপি শতাব্দীর শুরুতে ফিলিস্তিনে ইহূদী জনসংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা সাত ভাগ। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দুনিয়া থেকে ইহূদীদের ফিলিস্তিনে এনে পুনর্বাসন চলতে থাকে। এই নিয়ে মুসলমান ও ইহূদীদের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রতিবারই ইংরেজ শাসকদের ও আশেপাশের আরব দেশগুলোর বৃটিশ-তাবেদার শাসকদের পক্ষ থেকে ন্যায়সঙ্গত ফয়সালার আশ্বাসের প্রেক্ষিতে মুসলমানরা যুদ্ধবিরতি করলে ইহূদীরা তাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করে।

শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮-এর ১৫ই মে যায়নবাদী ইহূদীরা ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের কথা ঘোষণা করে এবং আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্স তাকে স্বীকৃতি ও জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদান করে। মুসলমানরা যুদ্ধ চালিয়ে গেলে চাপের মুখে তাদেরকে যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য করা হয়। প্রতিবারের যুদ্ধেই ইহূদীরা নতুন নতুন মুসলিম এলাকা দখল করে নিয়ে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের উৎখাত করে। এ কাজ করতে গিয়ে তারা চরম হত্যা ও নির্যাতন চালিয়েছে।

এর পরেও আশেপাশের মুসলিম দেশসমূহ ও ফিলিস্তিনী জনগণের সাথে ইহূদীদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের কাণে ইহূদীদের নিকট মুসলমানরা পরাজিত হয়। ১৯৬৭-র জুন-যুদ্ধে মিসরের সিনাই প্রদেশ, ফিলিস্তিনী আরবদের গাযা এলাকা ও বায়তুল মুকাদ্দাস সহ জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং সিরিয়ার গোলান মালভূমি ইসরাইলের দখলে চলে যায়। কিন্তু ফিলিস্তিন উদ্ধারের জিহাদ চলতে থাকে। বিশেষ করে ফিলিস্তিনীরা এ জিহাদ অব্যাহত রাখে।

বস্তুতঃ ফিলিস্তিন সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ইসরাইলের উৎখাত ও সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ড জুড়ে স্বাধীন ইসলামী ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করা। কিন্তু মিসরের মার্কিন-তাবেদার প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ১৯৭৮ সালে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, বিনিময়ে ইসরাইল মরুময় সিনাই প্রদেশ ফিরিয়ে দেয়। আনোয়ার সাদাতের এ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মিসরের বিপ্লবী মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে বিপ্লবী মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করেন।

ষাটের দশকের শুরুতে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও) এবং ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে আল-ফাতাহ্ গেরিলা গ্রুপ গঠিত হয়। খুব শীঘ্রই আরাফাত পিএলও-র নেতৃত্বও লাভ করেন। পিএলও ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। পিএলও জর্দান থেকে অধিকৃত ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে কয়েকটি ছোটখাট হামলা চালায় যা ইসরাইলের তেমন ক্ষতি করতে পারে নি। বরং আমেরিকার সর্বাত্মক সাহায্য-সমর্থনে ইসরাইল ক্রমেই শক্তি অর্জন করতে থাকে, এমন কি পারমাণবিক অস্ত্রেরও অধিকারী হয়।

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ)-এর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হলে ইরানের ইসলামী সরকার ইসরাইলের ধ্বংসসাধন ও ফিলিস্তিন উদ্ধারকে তার এক নম্বর লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে এবং তেহরানের ইসরাইল-দূতাবাসকে ফিলিস্তিন-দূতাবাসে পরিণত করে পিএলও-র নিকট হস্তান্তর করে। এমতাবস্থায় ক্রুসেডারদের নেতা আমেরিকা ইরানকে ধ্বংসের লক্ষ্যে ইরাকের মাধ্যমে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। যুদ্ধ সত্ত্বেও ইরান ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনকে সহায়তা দান অব্যাহত রাখে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব এবং আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ ও ইরাকের সাথে লড়াই বিশ্বের ইসলামী জনতার মধ্যে, বিশেষ করে ফিলিস্তিনীদের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা পুনরুজ্জীবিত করে। ফলে ফিলিস্তিনীদের মধ্যে ইসলামী চরিত্রবিহীন আরাফাতের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। গড়ে ওঠে বিপ্লবী আন্দোলন হামাস ও জিহাদে ইসলামী। আর লেবাননের বিপ্লবী মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হয় হিযবুল্লাহ্ নামে।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে অব্যাহত ব্যাপক গণপ্রতিরোধের সূচনা হয় ১৯৮৭-র ডিসেম্বর থেকে যা ইন্তিফাদাহ্ (প্রকম্পন) নামে সুপরিচিত। ইন্তিফাদাহ্ চলতে থাকে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পশ্চিমা সূত্র থেকে খবর ফাঁস হয়ে পড়তে থাকে যে, আসলে আরাফাত পশ্চিমাদের এজেন্ট; ফিলিস্তিনী বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে পরিকল্পিতভাবে তাঁকে ফিলিস্তিনীদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। নব্বই-এর দশকের প্রথমার্ধেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

ইরানকে ধ্বংস করার লক্ষ্যেই আমেরিকার নেতৃত্বে গোটা ক্রুসেডার-জগত ইরাককে সর্বাত্মক সাহায্য দিলেও দীর্ঘ আট বছর চলার পর জয়-পরাজয় নির্ণয় ছাড়াই ইরান-ইরাক যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ততদিনে ইরাক রাসায়নিক অস্ত্রের বিরাট ভাণ্ডার, পারমাণবিক অস্ত্রের বিরাট সম্ভাবনা ও এগার লাখ সৈন্যের বিরাট বাহিনীসহ মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। এটা ইসরাইলের জন্যে আশঙ্কার ব্যাপার ছিল। তাছাড়া আমেরিকা ভয় করতে থাকে যে, ইরানের শাহ্কে দেয়া অস্ত্রশস্ত্র যেভাবে ইসলামী বিপ্লবীদের হাতে পড়ে সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ইরাকে ঘটলে তা আমেরিকার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই আমেরিকা ইরাকের দ্বারা কুয়েত দখল করিয়ে সেই ছুতায় ইরাকের সামরিক শক্তির ধ্বংসসাধন করে।

ইরাককে ধ্বংস করার পর আমেরিকা তথাকথিত মধ্যপ্রাচ্য-শান্তিআলোচনা শুরু করে। কিন্তু হামাস, জিহাদে ইসলামী ও আরো অনেক ফিলিস্তিনী সংগঠন এ আলোচনা বর্জন করে জিহাদ ও ইন্তিফাদাহ্ অব্যাহত রাখে। ফলে তথাকথিত শান্তিআলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে নি। এমতাবস্থায় ইয়াসির আরাফাত ইসরাইলের সাথে গোপন আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। এরই ভিত্তিতে ১৯৯৩-র ১৩ই সেপ্টেম্বর পিএলও

www.pathagar.com

ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়। বিনিময়ে ইসরাইল প্রথমে গাযাহ্ ও আরিহা শহরে অর্থাৎ ফিলিস্তিনের শতকরা দুই ভাগ এলাকায় ইসরাইলী সার্বভৌমত্বের অধীনে আরাফাতের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনীদের সীমিত স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে এবং পরে তা আলখালীল (হেবরন)সহ পশ্চিম তীরের কয়েকটি শহরে সম্প্রসারিত হয়। এ পর্যন্ত পিএলও-র আওতায় ছেড়ে দেয়া জায়গা পশ্চিম তীরের শতকরা ৭ ভাগের মত।

পিএলও-ইসরাইল চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর নির্ধারিত পাঁচ বছর শেষ হয়ে আরো দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পিএলও তার সনদ থেকে ইসরাইল-বিরোধী ধারা বিলোপ করেছে। কিন্তু খণ্ডিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রেরও খবর নেই। তবে ইসরাইল উৎখাতের সংগ্রাম ইন্তিফাদাহ্ অব্যাহত রয়েছে। লেবাননের হিযবুল্লাহ্ও ইসরাইল-বিরোধী হামলা অব্যাহত রেখেছে।

ফিলিস্তিনের জন্যে এ পর্যন্ত হাজার হাজার শহীদ রক্ত দিয়েছেন। শুধু ইন্তিফাদাহ্র শহীদের সংখ্যাই প্রায় দেড় হাজারে দাঁড়িয়েছে। ইন্তিফাদাহ্ চলবেই ইসরাইলের উৎখাত ও সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ড উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন এই যে, ইতিপূর্বে ইসরাইলী বনাম ফিলিস্তিনী যে লড়াই চলছিল, আরাফাতের নেতৃত্বাধীন ৩০ হাজার সদস্যের পুলিশ বাহিনী ফিলিস্তিনীদের দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সে লড়াই ফিলিস্তিনী-ফিলিস্তিনী লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়েছে।

অবশ্য এর সুফল হচ্ছে এই যে, আরাফাতের চেহারার ওপর থেকে ভণ্ডামীর আবরণ অনেকখানি খসে গেছে; এ আবরণ পুরোপুরি খসে যাবার পর আর কেউ তাঁর দ্বারা বিভ্রান্ত হবে না। তাই আশা করা যায়, সকল ফিলিস্তিনী জনগণই ক্রমান্বয়ে ইন্তিফাদায় শামিল হবে এবং সেই সাথে মুসলিম উম্মাহ্ও আগের চেয়ে বেশী সচেতন হবে। ফলে ফিলিস্তিন উদ্ধারের পথ অধিকতর উন্মুক্ত হবে। কেননা, মুসলিম উম্মাহ্র চাপের মুখে মুসলিম সরকারগুলো ইসরাইলের উৎখাতে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র জিহাদে এগিয়ে আসতে বাধ্য হবে।[৭]

সমগ্র ফিলিস্তিনের আয়তন ২৭ হাজার ৯০ কিলোমিটার। ১৯৯৩-র মাঝামাঝি সময়ে মোট ফিলিস্তিনী জনসংখ্যা ছিল ৭০ লাখ।[৮] সে হিসেবে শতাব্দীশেষে বিশ্বে ফিলিস্তিনী জনসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৮০ লাখে। এর মধ্যে অর্ধেক অধিকৃত ফিলিস্তিনে এবং বাকী অর্ধেক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। অধিকৃত ফিলিস্তিনের মধ্যে গাযায় ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে ২৮ লাখ এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ও তথাকথিত ইসরাইলে ১২ লাখ ফিলিস্তিনী বসবাস করছে। পিএলও-ইসরাইল তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন-চুক্তি বাস্তবায়িত হবার পর গাযা ও পশ্চিম তীরে কতক দেশত্যাগী ফিলিস্তিনীকে ফেরত নেয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো যে ৪০ লাখ ফিলিস্তিনী বিদেশে রয়েছে তাদেরকে দেশে ফেরার অনুমতি ইসরাইল দেবে না।

www.pathagar.com

অসলো-চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর সাত বছরেও আরাফাত গাযা ও পশ্চিম তীরের সম্পূর্ণ এলাকা তাঁর শাসনাধীন স্বায়ত্তশাসিত এলাকার আওতাভূক্ত করতে পারেন নি। এদিকে বায়তুল মুকাদ্দাছের ভবিষ্যতও অনির্ধারিত রয়ে গেছে। এমতাবস্থায় জনমতের ভয়ে আরাফাত আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর (২০০০) গাযা ও পশ্চিম তীর নিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিনের ঘোষণা দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। অবশ্য এরূপ কথা তিনি এর আগেও বহুবার বলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ফিলিস্তিনের ঘোষণা দেন নি। তবে এবার পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। কারণ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য ফিলিস্তিনী জনগণের পক্ষ থেকে আরাফাত প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন। অন্যদিকে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে মুসলিম জাহান তার প্রতি সমর্থন জানাবে। এদিকে আমেরিকা ফিলিস্তিনের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। তাই দেখার বিষয় শেষ পর্যন্ত আরাফাত কি করেন।

আরাফাত ফিলিস্তিনের (যদিও খণ্ডিত) স্বাধীনতা ঘোষণা করুন বা না-ই করুন, ফিলিস্তিনী জনগণ গোটা ফিলিস্তিন উদ্ধারের সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেই। শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিন মুক্ত হবে এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনের ৫০ লাখ ইহূদীর মধ্যে অন্য দেশ থেকে আগত শতকরা নব্বই ভাগকেই ফিলিস্তিন থেকে চলে যেতে হবে।

## বসনিয়া-হার্জেগোভিনায়

সাবেক যুগোস্লাভিয়া থেকে সদ্য স্বাধীন মুসলিম-প্রধান দেশ হচ্ছে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা। এর আয়তন ৫১ হাজার ১২৯ বর্গকিলোমিটার।[৯] জনসংখ্যা ৪৪ লাখ। এদের মধ্যে মুসলিম শতকরা ৪৪ ভাগ, সার্ব বংশোদ্ভুত অর্থোডক্স খৃস্টান শতকরা ৩২ ভাগ, ক্রোট বংশোদ্ভুত ক্যাথলিক খৃস্টান শকরা ১৭ ভাগ এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর লোক শতকরা ৭ ভাগ।[১০] অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হাঙ্গেরীয়দের সংখ্যা সর্বাধিক।

আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব-উত্তর তীরে অবস্থিত এ দেশটির উপকূলের পরিমাণ মাত্র ২০ কিলোমিটার এবং বলতে গেলে পুরো দেশটাই অন্য দেশের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে। এর উত্তরে ক্রোয়েশিয়া, পূর্বে সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রতর যুগোস্লাভিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্রোয়েশিয়া অবস্থিত। ক্রোয়েশিয়ার দক্ষিণাংশের মাঝখান দিয়ে মাত্র ২০ কিলোমিটার উপকূল রয়েছে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার।

*সাবেক যুগোস্লাভিয়ার অঙ্গরাজ্যসমূহ*

www.pathagar.com

১৪৬৩-৬৫-র যুদ্ধে দেশটি তুরস্কের ওসমানী খেলাফতভুক্ত হয়। দীর্ঘ কয়েকশ' বছর পরে ওসমানী খেলাফতের দুর্বলতার যুগে ১৮৭৭ সালে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের পর দেশটিকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সরকারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯০৮ সালে অস্ট্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটিকে নিজ এলাকাভুক্ত করে নেয়।

বসনিয়ার রাজধানী সারাজেভোতে ১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ নিহত হলে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে অস্ট্রো-জার্মান অক্ষশক্তি পরাজিত হয় এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। তখন বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়া নিয়ে যুগোস্লাভিয়া সাম্রাজ্য নামকরণ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বসনিয়া-হার্জেগোভিনাসহ আশেপাশের দেশগুলো অক্ষশক্তির দখলে চলে যায়। কিন্তু যুদ্ধে অক্ষশক্তি পরাজিত হওয়ায় মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট যুগোশ্লাভিয়া গঠিত হয়।

ছয়টি প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত যুগোশ্লাভিয়ার সংবিধানে প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার ছিল, যদিও একদলীয় কম্যুনিস্ট শাসনে বাস্তবে তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আশির দশকের শেষে এসে পুর্ব ইউরোপে কম্যুনিজমের পতন শুরু হলে যুগোস্লাভিয়ায়ও কম্যুনিস্ট শাসনের পতন ঘটে। কম্যুনিস্ট পার্টির আধিপত্যই ছিল যুগোস্লাভিয়ার ঐক্যের ভিত্তি। কম্যুনিস্ট পার্টি না থাকায় প্রজাতন্ত্রগুলোর জন্যে স্বাধীনতা ঘোষণার সুযোগ এল। প্রথমেই ১৯৯০-র জুলাই মাসে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে।[১১]

মূলতঃ যুগোস্লাভিয়ার শাসন-কর্তৃত্ব এবং সশস্ত্র বাহিনীর পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল সার্বদেরই হাতে। কম্যুনিস্টপূর্ব যুগ থেকেই সার্বরা স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় বসতি স্থাপন করে আসছিল। কম্যুনিস্ট যুগে তা আরো বৃদ্ধি পায়। স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সেখানকার সার্ব জনগণ এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং যুগোস্লাভ বাহিনী—কার্যতঃ যার প্রায় পুরোটাই ছিল সার্বদের নিয়ে—এতে সহায়তা করে।

স্লোভেনিয়ায় সার্বদের সংখ্যা কম ছিল, ফলে সেখানে পরিস্থিতি অতটা মারাত্মক রূপ ধারণ করে নি। কিন্তু ক্রোয়েশিয়ার সার্বরা নির্মম গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সীমান্ত ঘিরে ক্রোয়েশিয়ার সার্ব অধ্যুষিত এলাকায় তারা ক্রাজিনা প্রজাতন্ত্র নামে একটি নিজস্ব প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় জার্মানীর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ইউরোপীয় কম্যুনিটি (ইসি) স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়াকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং সার্বিয়ার নেতৃত্বাধীন যুগোস্লাভিয়ার প্রতি সৈন্য সরিয়ে নেয়ার জন্যে চরমপত্র দেয়। সার্ব বাহিনী সেখান থেকে সরে যাবার সময়

www.pathagar.com

ক্রোয়েশীয় সার্বদের গঠিত তথাকথিত ক্রাজিনা প্রজাতন্ত্রের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রেখে যায়। (অবশ্য পরবর্তী সময়ে ক্রোয়েশিয়া ক্রাজিনাকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়।)

ক্রোয়েশিয়ায় যখন সার্বদের দ্বারা ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল তখন বসনিয়া-হার্জেগোভিনা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকগণ মন্তব্য করছিলেন যে, এরপর বসনিয়া-হার্জেগোভিনার পালা আসবে। বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলিম-প্রধান সরকার ঘোষণা করে যে, বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বৃহত্তর যুগোস্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছা নেই, কিন্তু ক্ষুদ্রতর যুগোস্লাভিয়ায় থাকবে না। (কারণ, ক্রোটদের বেশীরভাগ ও স্লোভেনরা না থাকায় সার্বদের পুরো চাপই পড়বে মুসলমানদের ওপর।) এমতাবস্থায় বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলিম ও ক্রোটরা স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তুতি নিতে থাকে। কিন্তু সার্বরা এর বিরোধিতা করতে থাকে। তারা বসনিয়া-হার্জেগোভিনার স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বে সীমান্ত পুনঃনির্ধারণ করার দাবী জানায়। মূলতঃ এ দাবী মেনে নেয়াই ছিল বুদ্ধিমানের পরিচায়ক। কিন্তু মুসলিম নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার কারণে এবং ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্রমূলক প্রতারণতার শিকার হয়ে বসনিয়ার মুসলমানরা এ যুগের সবচেয়ে বড় গণহত্যার শিকার হতে এগিয়ে যায়।

মুসলিম নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় অদূরদর্শিতা ছিল পাশ্চাত্য জগতের ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে উদাসীনতা। এটা বুঝা উচিত ছিল যে, মুসলিম জাহানের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এবং চতুর্দিকে খৃস্টান পরিবেষ্টিত অবস্থায়· খালি হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত খৃস্টান সার্বদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়া ঠিক হবে না, বরং লড়াইকে সাধ্যানুযায়ী এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে যে সার্ব-বাহিনী স্বধর্মীয় ক্রোটদের কচুকাটা করতে এবং তাদের শহর-গ্রাম ধ্বংস করতে দ্বিধা করে নি তারা মুসলমানদের কচুকাটা করতে দ্বিধা করবে না। এমতাবস্থায় ক্রোয়েটদের সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা ঠিক হয় নি।

তাছাড়া কার্যতঃ বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় মুসলমানরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না, বরং সার্ব ও ক্রোটদের দু'টি ভিন্নতর জাতি হিসেবে গণ্য করে মুসলমানরা ছিল আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ (৪৪%)। মুসলিম নেতৃত্বের চিন্তা করা উচিত ছিল যে, অর্থোডক্স সার্ব খৃস্টান ও ক্রোট ক্যাথলিক খৃস্টানরা বিরোধ ভুলে গিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলে তারাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বস্তুতঃ সার্ব ও ক্রোটদের লড়াই ছিল স্বার্থের লড়াই, ধর্মীয় লড়াই নয় এবং যে কোন মুহূর্তে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে, পরবর্তীকালে সাময়িকভাবে হলেও তা-ই হয়েছিল—সার্ব ও ক্রোটরা মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুধু রাজনৈতিক লড়াইয়েই পরস্পরকে সহায়তা করে নি, বরং সামরিক লড়াইয়েও সহায়তা করেছিল।

www.pathagar.com

তাছাড়া বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে পাশ্চাত্যের ক্রুসেডারদের গোপন মদদে ইসি-র উদ্যোগে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে সার্ব ও ক্রোটদের মধ্যে যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তাতে মুসলমানদের বাদ দিয়ে বসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে দুই ভাগ করে নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয। এখানে সার্বরা ৬৫ ভাগ এবং ক্রোটরা ৩৫ ভাগ এলাকা দাবী করে। অবশ্য পরে তারা মুসলমানদেরকে শতকরা ৫ ভাগ এলাকা ছেড়ে দিতে সম্মত হয়।[১২]

এমন কি যুদ্ধ শুরু হবার পরেও ১৯৯২-র মে মাসে বসনীয় সার্ব নেতা রাদোভান কারাদজিক ও বসনীয় ক্রোট নেতা মেট্ বোবান্ অস্ট্রিয়ার গ্রাজ শহরে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে ভাগাভাগি করার ব্যাপারে একটি দলীলে স্বাক্ষর করেন[১৩] যদিও মুসলমানরা তখন ক্রোটদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্যে লড়াই করছিল। অথচ আপোষে সার্ব অধ্যুষিত বেশীর ভাগ এলাকা সার্বিয়াকে ছেড়ে দিয়ে সীমান্ত পুনঃনির্ধারণ করলে মুসলমানদের ওপর গণহত্যা ও দুর্দশা নেমে আসত না। যা হয়েছে নিঃসন্দেহে তা নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার ফল। তেমনি তা ক্রুসেডারদের মুসলিম নির্মূলকরণ ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশও বটে।

বস্তুতঃ ক্রুসেডাররা মুসলমানদের নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার লক্ষ্যে খৃষ্টানদের রক্তপাত ঘটাতেও দ্বিধা করে নি। স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন ইউরোপীয় গোষ্ঠীর (ইসি) উচিত ছিল এদেরকে স্বীকৃতি না দিয়ে গণভোটের ফলাফল দৃষ্টে সীমান্ত পুনঃনির্ধারণ করা। সেক্ষেত্রে ক্রোয়েশিয়ার সার্ব অধ্যুষিত এলাকা—তারা যার নাম দিয়েছিল ক্রাজিনা প্রজাতন্ত্র—এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনার উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব এলাকা সার্বিয়াভুক্ত হত। আর মধ্য ও দক্ষিণ এলাকার ক্রোটরা চাইলে ক্রোয়েশিয়াভুক্ত হত অথবা বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় থেকে যেত। সেক্ষেত্রে হয়ত সার্বিয়ার কসোভো প্রদেশের মুসলমানরাও স্বাধীন হতে পারত।

এভাবে আপোষে বিনা রক্তপাতে ভাগ-বাটোয়ারা হলে সার্বরা হয়ত অপেক্ষাকৃত কম এলাকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। তাছাড়া সেক্ষেত্রে ইসি গণভোটের রায়ভিত্তিক বিভক্তি পরিকল্পনা চাপিয়ে দিতে পারত এবং সবাই তা মেনে নিতে বাধ্য হত। কিন্তু ক্রুসেডাররা তা চায় নি। কারণ, তাতে কার্যতঃ মুসলমানরা লাভবান হত।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হল ইসিভুক্ত দেশগুলো রোমান ক্যাথলিক; কেবল বৃটেন প্রোটেস্ট্যান্ট। কিন্তু কোন অর্থোডক্স দেশ ইসি-তে নেই। এমতাবস্থায় ক্যাথলিক ক্রোয়েশিয়ার অংশবিশেষ ক্রাজিনা প্রজাতন্ত্রকে তারা যে কোন মূল্যে ক্রোয়েশিয়ার হাতে রাখতেই বদ্ধপরিকর ছিল। তাই তারা তাড়াহুড়ো করে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়াকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তা সত্ত্বেও বসনিয়ার মুসলিম নেতারা সার্বিয়ার সাথে সীমান্ত

www.pathagar.com

পুনঃনির্ধারণে সম্মত হলে মুসলিম ও ক্রোটদের নিয়ে যে ক্ষুদ্রতর বসনিয়া-হার্জেগোভিনা হত তাতে মুসলমানরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হত। কারণ, তাদের অনুপাত হত ৪৪ঃ১৭।

যা-ই হোক, ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুসলমানরা ক্রোটদের সাথে মিলে গণভোটের মাধ্যমে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার স্বাধীনতার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ গণভোটের ফলাফল কি হতে পারে তা বসনীয় সার্বদের অজানা ছিল না। এ কারণে তারা এ গণভোট বর্জন করে। এতদসত্ত্বেও বসনীয় সরকার ১৯৯২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী বসনিয়া-হার্জেগোভিনার স্বাধীনতা ঘোষণা করে।[১৪] সাথে সাথে বসনীয় সার্বরা এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনার রাজধানী সারাজেভোর অদূরবর্তী শহর পালে-কে রাজধানী করে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বসনীয় সার্ব প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। তারা সাথে সাথেই বসনিয়া-হার্জেগোভিনার যত বেশী সম্ভব এলাকা দখল করার জন্যে সর্বাত্মক ও ধ্বংসাত্মক বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধ শুরু করে।[১৫] সেই সাথে তারা তাদের ঘোষিত প্রজাতন্ত্রকে খণ্ডিত যুগোস্লাভ ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্য সার্বিয়ার সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যও ঘোষণা করে।

বসনিয়া-হার্জেগোভিনার স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই সেখানে অবস্থানরত যুগোস্লাভ বাহিনী—যার সদস্যরা ও অফিসাররা ছিল সার্ব বংশোদ্ভুত—বসনীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। পরে অবশ্য আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তারা রাজধানী সারাজেভোসহ সমগ্র বসনিয়া-হার্জেগোভিনা থেকে সরে যায়। কিন্তু চলে যাবার সময় তারা তাদের বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক হাল্কা ও ভারী অস্ত্র বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সার্ব বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিয়ে যায়।

ইতিপূর্বে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হবার পর ইসি-র উদ্যোগে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গোটা সাবেক যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রনিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞার শিকার হয় শুধু বসনিয়ার মুসলিম সরকার ও জনগণ। কারণ সার্বিয়ার ও বসনীয় সার্ব বিদ্রোহীদের হাতে যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ছিল অতঃপর তাদের আর বাইরে থেকে কোন অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। কারণ, সাবেক যুগোস্লাভিয়ার মত সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী দেশের সকল সমরাস্ত্রই তাদের হাতে ছিল। তাছাড়া গোপন পথে রাশিয়া থেকে তাদের কাছে অস্ত্র পৌঁছছিল। অন্যদিকে ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়া অস্ত্রের দিক থেকে মুসলমানদের ন্যায় একেবারে রিক্তহস্ত ছিল না। তদুপরি পার্শ্ববর্তী ক্যাথলিক দেশসমূহ থেকে গোপনে অস্ত্র আমদানীর পুরো সুযোগও তাদের হাতে ছিল।

কিন্তু বসনীয় মুসলমানরা ভৌগলিক দিক থেকে মুসলিম জাহানের অন্য সকল দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বিধায় গোপনে অস্ত্র সংগ্রহের কোন সুযোগই তাদের ছিল না এবং কোন মুসলিম দেশ চাইলেও তাদেরকে অস্ত্র সাহায্য পাঠাতে পারত না। তাই বসনীয়

www.pathagar.com

মুসলমানরা প্রধানতঃ রাইফেল নিয়েই দেশরক্ষার যুদ্ধ শুরু করে। পরে রণাঙ্গনে যেখানেই তারা বিজয়ী হয় সেখানে তারা শত্রুপক্ষের কিছু কিছু অস্ত্র হস্তগত করে। এছাড়া ইরান সরকার সরাসরি কিছু অস্ত্র পাঠায় সাহায্যসামগ্রীর সাথে। কিন্তু শীঘ্রই তা ধরা পড়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ক্রোটদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক যতদিন ভাল ছিল ততদিন তারা ক্রোট এলাকার মধ্য দিয়ে চোরা পথে অস্ত্র আমদানী করে। কিন্তু খুব শীঘ্রই—স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র এক বছরের মাথায় ১৯৯৩-র মার্চ মাসে—ক্রোটরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে সে সুযোগও হাতছাড়া হয়ে যায়।

সার্বরা বসনিয়া-হার্জেগোভিনার জনসংখ্যার শতকরা ৩২ ভাগ। কিন্তু যুগোস্লাভ (সার্বীয়) বাহিনীর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় তারা শতকরা ৭০ ভাগ এলাকা দখল করে নেয়। শতকরা ২০ ভাগ এলাকা ক্রোটদের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে থাকে মাত্র দশ ভাগ এলাকা। বস্তুতঃ সার্বরা যেসব এলাকা দখল করে নেয় তা ছিল মুসলমানদেরই এলাকা; এতে ক্রোটরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানদের বেশীর ভাগই বিভিন্ন শহরে বসবাস করত। অন্যদিকে সার্বদের বেশীর ভাগই ছিল গ্রাম-এলাকার অধিবাসী। বিদ্রোহী সার্বরা যেখানেই সার্ব ছিল সে এলাকাই দখল করে নেয়। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বসনিয়ায় অনেকগুলো মুসলিম শহর-জনপদ ছিল সার্ব অধ্যুষিত এলাকার অভ্যন্তরে। সার্বরা এসব শহর-জনপদ দখল করেই ক্ষান্ত থাকে নি, বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাইকারী গণহত্যা চালায়, নারীদেরকে পাইকারী হারে ধর্ষণ করে, বাড়ীঘর ধ্বংস করে দেয়, হাজার হাজার নারী-পুরুষকে নিয়ে বন্দী-শিবিরে আটক করে, তাদের মধ্য থেকে অনেক যুবতীকে পতিতা হিসেবে ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহার করে, আর লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে বা দেশের মধ্যেই শরণার্থীতে পরিণত করে। কার্যতঃ তারা তাদের দখলকৃত প্রতিটি শহরকে মুসলিমশূন্য করে।

এরপর খুব শীঘ্রই ক্রোটরা তাদের স্বরূপে আবির্ভূত হয়। ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রোটরা মুসলমানদের হাত থেকে বাকী ১০ ভাগ এলাকা কেড়ে নেয়ার জন্যে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম-সার্ব ও মুসলিম-ক্রোট—পাশাপাশি দু'টি যুদ্ধ চলতে থাকে। তবে ক্রোটরা মুসলমানদের সাথে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারে নি। এমতাবস্থায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে সার্বরা ক্রোটদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তাছাড়া ক্রোয়েশীয় বাহিনীও বসনীয় ক্রোটদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

কেবল ১৯৯৩-র মে মাস নাগাদ এক বছরে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানদের ওপর যে ধ্বংসযজ্ঞ চলে তার খতিয়ান হচ্ছে ঃ নিহত দুই লাখ,[১৬] ধর্ষিতা ৬০ হাজার, সার্ব ও ক্রোটদের বন্দী-শিবিরে আটক ৭০ হাজার, বসনিয়ার অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হয়ে

www.pathagar.com

শরণার্থী ৭ লাখ ৪০ হাজার এবং দেশের বাইরে শরণার্থী দশ লাখ।[১৭] এছাড়া ঐ সময় পর্যন্ত মসজিদ ধ্বংস করা হয় ৮শ'।[১৮]

বসনিয়া-সরকার তার দেশের ভৌগলিক অখণ্ডত্ব রক্ষার স্বার্থে তার ওপর থেকে অস্ত্রনিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্যে জাতিসংঘকে বার বার অনুরোধ জানিয়েও সাড়া পায় নি। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, ইউরোপের বুকে কোন শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তাঁরা মানবেন না। বসনিয়ার ওপর থেকে অস্ত্রনিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হলে তিনি তাতে ভেটো দেবেন বলে হুমকি প্রদান করেন। ক্রুসেডারদের নেতা আমেরিকা মুসলমানদের বোকা বানানোর জন্যে অস্ত্রনিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ও সার্বদের ওপর বিমান হামলার কথা বলে। কিন্তু মার্কিন সামরিক অধিনায়কদের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযানকে সমস্যার সহজ সমাধান বলে মতামত ব্যক্ত করা হলেও এবং এতে কোন ঝুঁকি না থাকার কথা পাশ্চাত্য থেকে স্বীকার করা সত্ত্বেও আমেরিকা কার্যতঃ এ ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকে।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্সকে ও ইসি-র পক্ষ থেকে সাবেক বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ওয়েনকে বসনিয়া-সমস্যা সমাধানের জন্যে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়। লর্ড ওয়েন একজন ইহুদী এবং স্বভাবতঃই মুসলিম-বিদ্বেষী। তিনি সমস্যাকে সমাধানের পরিবর্তে জটিলতর করার জন্যে চেষ্টা করেন। এমন কি পরবর্তীকালে সারাজেভোকে বিভক্ত করার জন্যেও চাপ সৃষ্টি করেন।

যাই হোক, ভ্যান্স এবং ওয়েন ১৯৯৩ সালের ২রা জানুয়ারী বসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে এমনভাবে দশটি প্রদেশে বিভক্ত করার এক পরিকল্পনা পেশ করেন যাতে তিনটি করে প্রদেশে প্রত্যেক জাতির প্রাধান্য রাখা হয় এবং রাজধানী সারাজেভোকে সকলের যৌথ শহর ও প্রদেশ হিসেবে রাখার কথা বলা হয়। এতে তিনটি সার্ব-প্রদেশে শতকরা ৪৩ ভাগ এলাকা দেয়া হয়। কিন্তু মুসলমান ও ক্রোটরা মেনে নিলেও সার্বরা পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করে। আর সাথে সাথেই নিরাপত্তা পরিষদ, ইসি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই সার্বদের এ প্রত্যাখ্যানকে মেনে নেয় এবং পরিকল্পনাটি গ্রহণ করানোর জন্য কোনরূপ চাপ প্রয়োগ থেকে পুরোপুরি বিরত থাকে। ফলে ভ্যান্স-ওয়েন পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

এরপর আমেরিকার পক্ষ থেকে ভ্যান্সের পরিবর্তে থর্‌ভাল্ড্ স্টোল্টেন্‌বার্গ্‌কে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়। তিনি ওয়েনের সাথে মিলে যা করলেন তা হচ্ছে তাঁরা সার্ব ও ক্রোটদের দেয়া এক যৌথ পরিকল্পনা মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেন। এতে দেশটিকে তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্রের একটি ইউনিয়ম বা কনফেডারেশনে পরিণত করার কথা

www.pathagar.com

বলা হয়। এ জন্যে যে মানচিত্র প্রণীত হয় তাতে সারাজেভোকে দু' বছরের জন্যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ও মুসলিম-ক্রোট যৌথ শহর মোস্তারকে একই মেয়াদের জন্যে ইসি-র তত্ত্বাবধানে রাখার এবং বাকী এলাকাকে একশ' ভাগ ধরে ৫৩ ভাগ সার্বদেরকে, ৩০ ভাগ মুসলমানদেরকে এবং ১৭ ভাগ ক্রোটদেরকে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। সার্বরা খুশীর সাথে এ প্রস্তাব মেনে নেয়। ক্রোটরাও সহজেই মেনে নেয়। কিন্তু এতে মুসলমানদেরকে চরমভাবে বঞ্চিত করা হয় বলে তারা তা মানতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত ইউরোপ-আমেরিকা ও সার্বদের চাপের মুখে তারা তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফলে ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুলাই জেনেভায় এ ব্যাপারে এক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই সর্বশেষ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্যে ছিল আত্মহত্যার শামিল। কারণ, এতে একদিকে মুসলমানদেরকে ভূখণ্ডগতভাবে বঞ্চিত করা হয়, অন্যদিকে সার্বরা মুসলমানদের হত্যা বা বিতাড়িত করে যেসব শহর-জনপদ দখল করে নিয়েছিল আগ্রাসনের পুরস্কার হিসেবে সেগুলো সার্বদেরকেই দেয়া হয়। সর্বোপরি মুসলমানদেরকে সমুদ্রে নামার করিডোর না দিয়ে সার্ব ও ক্রোটদের দ্বারা অবরুদ্ধ কয়েকটি ভূখণ্ড দেয়া হয় যাতে তারা সব সময়ই সার্ব ও ক্রোট খৃস্টানদের নিকট নত হয়ে থাকতে বাধ্য হয় এবং কোনদিনই ইসলামী পরিচিতি নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহস না পায়।

এ প্রস্তাবে মুসলমানদেরকে সারাজেভোর উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে একটি মূল ভূখণ্ড, উত্তর-পশ্চিম বসনিয়ার বিহাক প্রদেশ এবং পূর্ব বসনিয়ার কয়েকটি ছিটমহল দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। বিহাকসহ ছিটমহলগুলোর সাথে সার্বদের এলাকার ওপর দিয়ে সড়কপথে মূল ভূখণ্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ দেয়ার কথা বলা হয়, অন্যদিকে সমুদ্রে নামার জন্যে ক্রোটদের এলাকার ওপর দিয়ে একটি নদীপথ ও দু'টি সড়ক পথ ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার এবং ক্রোয়েশিয়ার প্লোস্ বন্দরের একটি ডক্ ৯৯ বছরের জন্যে মুসলিম বসনিয়াকে লীজ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু এসব করিডোরের সার্বভৌমত্ব যথাক্রমে সার্ব ও ক্রোটদের হাতেই রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এর মানে ছিল এই যে, যে কোন মুহূর্তে তারা চাইলেই করিডোর বন্ধ করে দিতে পারত। তাই এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হওয়ার অর্থ ছিল, মুসলমানদেরকে সব সময়ই সার্ব ও ক্রোটদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

বলা বাহুল্য যে, এরূপ একটি ইউনিয়ন রাষ্ট্রের শত্রুঅবরুদ্ধ প্রজাতন্ত্রের অধিবাসী হয়ে ইসলামী পরিচিতি নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করলে মুসলমানদের পক্ষে সার্ব ও ক্রোটদের সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে মুসলিম-নেতৃত্বের জন্যে দূরদর্শিতার পরিচায়ক

www.pathagar.com

হত যে কোন মূল্যে সমুদ্র পর্যন্ত একটি ভূখণ্ড আদায়ের চেষ্টা করা যার সার্বভৌমত্ব মুসলিম বসনিয়ার হাতে থাকত। এ জন্যে কয়েকটি ছিটমহল ছেড়ে দিয়ে ও জনসংখ্যা বিনিময় করে হলেও চেষ্টা চালানো উচিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই যে, অদূরদর্শী মুসলিম নেতৃত্ব মূল সমস্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সার্বদের দখলকৃত কয়েকটি মুসলিমশূন্যকৃত ছিটমহল আদায়ের চেষ্টা শুরু করে। তবে ভাগ্যক্রমে এটা মুসলমানদের জন্যে কিছুটা পরোক্ষ কল্যাণ বয়ে আনে। তা হচ্ছে, ছিটমহল নিয়ে দর কষাকষির ফলে এক পর্যায়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত এ পরিকল্পনাটিও পরিত্যক্ত হয়।

বসনিয়ার মুসলিম নেতাদের অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতার কারণে দেশটির মুসলিম জনগণের দুর্ভাগ্য এখানেই সীমাবদ্ধ থাকল না। ক্রুসেডারদের হিংস্র থাবার ক্ষত না শুকাতেই মুসলিম-নেতৃত্বের আভ্যন্তরীণ কোন্দল মুসলমানদের জন্যে এক নতুন বিপর্যয়

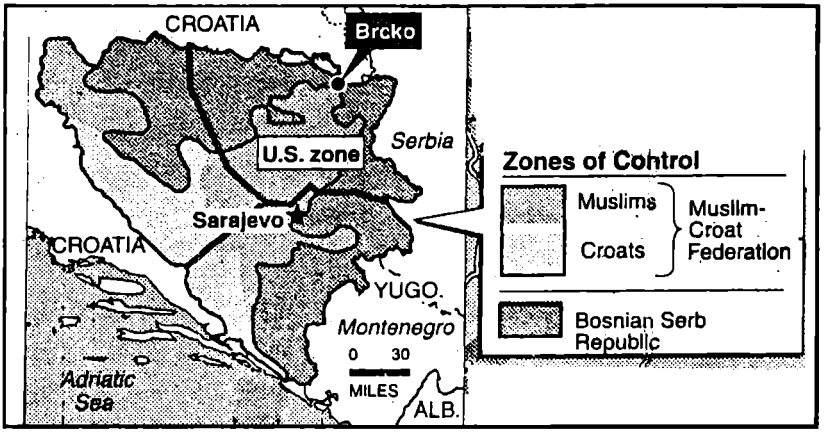


নিয়ে আসে। উত্তর-পশ্চিম বসনিয়ার বিহাক প্রদেশের পার্লামেন্ট আলাদা প্রজাতন্ত্র গঠনের পক্ষে রায় দেয় এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনার প্রেসিডেন্ট পরিষদের সদস্য ফিক্‌রাত্ আব্‌দিককে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। আর সাথে সাথেই বসনিয়া-হার্জেগোভিনার প্রেসিডেন্ট আলিয়া ইজ্জতবেগোভিচ বিহাক উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ দেন। ফলে স্বয়ং মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে আরেকটি গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

বিহাক প্রদেশ ছিল ক্রোয়েশিয়া সীমান্তে ক্রোয়েশীয় সার্ব এবং বসনীয় সার্বদের দ্বারা অবরুদ্ধ বৃহত্তম ছিটমহল যার আয়তন সমগ্র বসনিয়া-হার্জেগোভিনার শতকরা চার ভাগ। ব্যবসায়ী ফিক্‌রাত্ আব্‌দিক্ ছিলেন এখানকার জনপ্রিয় নেতা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কুশলী ও বাস্তবদর্শী। ফলে তিনি যুদ্ধের দাবানল থেকে এ ছিটমহলটিকে মোটামুটি রক্ষা করতে পেরেছিলেন। বসনিয়ার কেন্দ্রীয় মুসলিম বাহিনীর সাহায্য ছাড়াই তিনি বিহাকের নিজস্ব মিলিশিয়া বাহিনী দ্বারা এবং সার্বদের সাথে ভূখণ্ডগত

www.pathagar.com

আপোষের মাধ্যমে বিহাকবাসীদের জান-মাল হেফাযত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সার্বরা বিহাকের এক-তৃতীয়াংশ দখল করে নিয়েছিল ; তিনি তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না করাকেই বিহাকবাসীদের জন্য কল্যাণকর মনে করেন। (অবশ্য ইউনিয়ন-চুক্তি বাস্তবায়িত হলে সার্বদের দখলকৃত এক-তৃতীয়াংশ এলাকাও মুসলমানদের ফেরত পাওয়ার কথা ছিল।)

ফিক্‌রাত্ আব্‌দিক্ বিহাকের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্যসরবরাহ বজায় রাখতে সক্ষম হন। ফলে সেখানে মুসলিম-সার্ব যুদ্ধের আঁচড় তেমন একটা লাগে নি। এমতাবস্থায় ইউনিয়ন-পরিকল্পনা ভেঙ্গে গেলে নতুন করে মুসলিম-সার্ব যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় আব্‌দিকের নেতৃত্বে বিহাক পার্লামেন্ট এ যুদ্ধের ক্ষতিকারকতা থেকে বিহাককে বাঁচাবার এবং সার্বদের সাথে সরাসরি বিরোধনিষ্পত্তির লক্ষ্যে আলাদা প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। কিন্তু বসনিয়ার কেন্দ্রীয় বাহিনী হামলা শুরু করলে বিহাকের পক্ষে আর নিরাপদ থাকা সম্ভব হয় নি। এ পর্যায়ে বিহাক প্রজাতন্ত্র ও সার্বদের মধ্যে চুক্তি হওয়ায় সার্বরা বিহাক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যুদ্ধে নামে। শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধে বসনিয়ার কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং বসনীয় সার্বদের হামলা-পাল্টা হামলায় বিহাকেও বিরাট আকারে ধ্বংস সাধিত হয়।

ইউনিয়ন-চুক্তি পরিত্যক্ত হবার সাথে সাথে মুসলিম-সার্ব যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যায়। সেই সাথে ঘন ঘন যুদ্ধের ভাগ্যপরিবর্তন ঘটতে থাকে। কখনো মুসলমানরা এগিয়ে যায়, কখনো সার্বরা এগিয়ে যায়। এমনি এক অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ময়দানে অবতীর্ণ হয়; তবে যুদ্ধের ময়দানে নয়, কূটনীতির ময়দানে।

বসনিয়ায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর ১৬ হাজার সৈন্য ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ (১) যুদ্ধ বন্ধ করানো তাদের দায়িত্ব ছিল না, কেবল ত্রাণসামগ্রী বিতরণই ছিল তাদের কাজ। (২) তাদের হাতে কোন ভারী অস্ত্র দেয়া হয় নি। ফলে সার্বরা তাদের ত্রাণসরবরাহে বাধা দিচ্ছিল, ত্রাণসমাগ্রী লুটে নিচ্ছিল, তাদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল এবং তাদেরকে হত্যা ও বন্দী বা পণবন্দী করছিল। কিন্তু তাদের কিছু করার ছিল না। (৩) বিশ্বনেতৃত্বের দাবীদার আমেরিকার এ বাহিনীতে কোন সৈন্য ছিল না।

যুদ্ধের নতুন পর্যায়ে বিশেষ করে জাতিসংঘ বাহিনীর নিরাপত্তার জন্যে সার্বদের ওপর বিমান হামলা চালানো ও ছত্রীসেনা নামানোর প্রস্তাব দেয়া হতে থাকলেও আমেরিকা এ থেকে বিরত থাকে। শেষ পর্যন্ত ন্যাটো কয়েক বার লোক দেখানো বিমান হামলা চালায়। কিন্তু সার্বরা জাতিসংঘ ঘোষিত মুসলিম নিরাপদ এলাকাগুলোর বেশ কয়েকটি দখল করে নেয়। ফলে বসনিয়ার মুসলিম-প্রধান সরকারের হাতে সারাজেভো ও রণাঙ্গন ছাড়া তেমন কোন এলাকাই অবশিষ্ট থাকে নি।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় আমেরিকা ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। বসনিয়া-সরকার অসহায় অবস্থায় আমেরিকার দ্বারস্থ হয় এবং আমেরিকার মধ্যস্থতায় ১৯৯৪-র ১লা মার্চ বসনীয় ক্রোটদের সাথে একটি ফেডারেশন-চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে বসনিয়ার মুসলিম ও ক্রোট এলাকাগুলোকে কতকগুলো স্বায়ত্তশাসিত ক্যান্টনে বিভক্ত করে কেন্দ্রে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য রেখে বাকী ক্ষমতা ক্যান্টনগুলোকে দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু এ চুক্তির প্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, বসনীয় মুসলিম-ক্রোট ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট গণতান্ত্রিক নিয়মে নির্বাচিত হবেন না বা মুসলিম ও ক্রোটদের অনুপাত ৪৪ঃ১৭ হলেও প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ দুই সম্প্রদায়ের জন্য স্থায়ীভাবেও নির্ধারিত হয় নি, বরং প্রতি বছর দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পদ দু'টি হাতবদল হবে। এছাড়া এ ফেডারেশনের জন্যে বসনীয় সার্ব প্রজাতন্ত্রের সাথে ইউনিয়ন গঠনের এবং ক্রোয়েশিয়ার সাথে কনফেডারেশন গঠনের সুযোগ রাখা হয়।

এ চুক্তি সম্পাদিত হবার পর আমেরিকার শাট্‌ল্ ডিপ্লোম্যাসির তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, ক্রোয়েশিয়া-সরকারের বাহিনী বসনিয়ার মুসলিম ও ক্রোটদের পক্ষে যুদ্ধে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে, বসনীয় সার্বদের বিরুদ্ধে ন্যাটোবাহিনী চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে সার্বিয়ার ওপর চাপ বৃদ্ধি করা হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৯৫-র ১৩ই মে জাতিসংঘ কর্তৃক নিয়োজিত পাঁচ-জাতি যোগাযোগ গ্রুপ একটি নতুন বিভক্তিপরিকল্পনা পেশ করে। কিন্তু সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় আমেরিকা ১৯৯৫ সালের ১৫ই আগস্ট একটি নতুন শান্তিপরিকল্পনা পেশ করে। এতে মুসলিম-ক্রোট ফেডারেশনকে ৫১ ভাগ ও বসনীয় সার্ব প্রজাতন্ত্রকে ৪৯ ভাগ এলাকা দেয়ার এবং দুই প্রজাতন্ত্র মিলে একটি ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত ১৯৯৫ সালের ২১শে নভেম্বর বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও অঙ্গরাজ্যের ডেটনে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন।

নতুন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর মুসলিম-ক্রোট ফেডারেশন ও বসনীয় সার্বদের মধ্যে এক নাটকীয় তীব্র যুদ্ধ হয়। এতে জয়-পরাজয় বিনিময়ের পর দেখা গেল উভয় পক্ষই শান্তিচুক্তিতে বর্ণিত তাদের প্রাপ্য জায়গাসমূহ নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে।

এ অবস্থায় শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্যে বসনিয়ায় আর নতুন করে সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন ছিল না। বরং কিছুসংখ্যক সামরিক পর্যবেক্ষক প্রেরণই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও ১৯৯৫-র ৩০শে নভেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ বসনিয়ায় ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৬-র মধ্যে সৈন্য পাঠানোর জন্য ন্যাটোকে অনুরোধ জানায়। ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখে ন্যাটো বসনিয়ায় ৬০ হাজার সৈন্য পাঠাবার প্রস্তাব অনুমোদন করে।

www.pathagar.com

এরপর ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জাতিসংঘ বাহিনী বসনিয়ায় প্রবেশ করে এবং দু'পক্ষের মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করে যার আসলে কোনই প্রয়োজন ছিল না। এ বাহিনীর প্রায় অর্ধেক মার্কিন সৈন্য। তারা সেখানে পারমাণবিক উপজাত অস্ত্রশস্ত্রও মোতায়েন করেছে।

বসনিয়া-হার্জেগোভিনা মুসলিম পরিচিতি হারিয়ে ফেলেছে। কারণ এখন তা দু'টি প্রজাতন্ত্রের একটি ইউনিয়ন যার একটি এককভাবে সার্ব খৃস্টানদের, কিন্তু অপরটি এককভাবে মুসলমানদের নয়। অন্যদিকে আমেরিকান সৈন্যরা সেখানে গেড়ে বসে আছে; কবে তাদের প্রত্যাহার করা হবে বা আদৌ প্রত্যাহার করা হবে কিনা কেউ জানে না। বস্তুতঃ বসনিয়া-হার্জেগোভিনা এখন আমেরিকার একটি অঘোষিত অঙ্গরাজ্য মাত্র।

## আযারবাইযানে

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশকারী দেশসমূহের অন্যতম হচ্ছে আযারবাইজান। কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত এ মুসলিম দেশটির উত্তরে রাশিয়া ও জর্জিয়া, পশ্চিমে আর্মেনিয়া ও দক্ষিণে ইরান। আযারবাইজানের একটি বিচ্ছিন্ন ছিটমহল নাখ্জাওয়ান ইরান ও আর্মেনিয়ার মাঝখানে অবস্থিত। এর উত্তর-পূর্বে আর্মেনিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ইরান অবস্থিত। নাখ্জাওয়ানের উত্তর-পশ্চিম কোণের সাথে তুরস্কের সামান্য কিছুটা সীমান্ত রয়েছে।

আযারবাইজানের মোট আয়তন ৮৬ হাজার ৬০০ বর্গকিলোমিটার। নগোর্নো-কারাবাগসহ সারা দেশের মোট জনসংখ্যা শতাব্দীশেষে সোয়া ৭৯ লাখে দাঁড়াবে। এদের মধ্যে শতকরা ৮১ ভাগ মুসলমান। নগোর্নো-কারাবাগের বিচ্ছিন্নতার পর অবশ্য জনসংখ্যার শতকরা ৮৩ ভাগ মুসলমান। শতাব্দীশেষে মুসলিম জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬৪ লাখের ওপরে।

আযারবাইজানের ছিটমহলগুলোর মধ্যে নাখ্জাওয়ানের আয়তন ৫ হাজার ৫০০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা আড়াই লাখের কাছাকাছি। আযারবাইজানের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে একটি প্রদেশ খৃস্টান অধ্যুষিত, নাম নগোর্নো-কারাবাগ, আয়তন ৪ হাজার ৪০০ বর্গকিলোমিটার। ১৯৯১ সালে এর জনসংখ্যা ছিল ১ লাখ ৯০ হাজার। এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ ছিল আর্মেনীয় বংশোদ্ভুত খৃস্টান ও ১৮ ভাগ ছিল মুসলমান। ক্রুসেডারদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে এ প্রদেশটিকে কেন্দ্র করে আযারবাইজানী মুসলমানদের প্রচুর রক্ত ঝরেছে এবং মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করে ক্রুসেডাররা এটিকে আযারবাইজান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

www.pathagar.com

আযারবাইজান সুদীর্ঘকাল যাবত ইরানের ও পরে তুরস্কের ওসমানী খেলাফতের অংশবিশেষ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে বৃটিশ বাহিনী দেশটিকে প্রথম বারের মত দখল করে, কিন্তু সাথে সাথে জার্মান-ওসমানী যৌথ বাহিনী তা পুনরুদ্ধার করে। ১৯১৮-র শরতকালে বৃটিশরা পুনরায় আযারবাইজান দখল করে। ১৯১৯-এর নভেম্বরে সেখানে মিত্রশক্তির তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯২০-এর ২৮শে এপ্রিল বলশেভিকরা দেশটিকে দখল করে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে।[১৯] একই সময় আর্মেনিয়া এবং জর্জিয়া-ও সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত হয়।

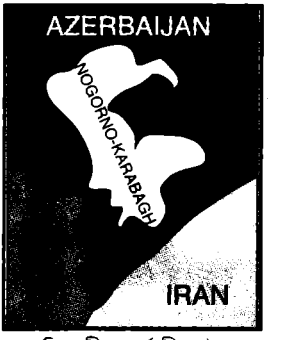


আযারীরা তুর্কী বংশোদ্ভূত। তুর্কী-ওসমানী খেলাফতের অধিবাসী আর্মানী খৃস্টানরা রুশ সাম্রাজ্যেরসাথে যোগসাজশ করে যাচ্ছিল এবং এ কারণে ১৯১৫ সালে তুর্কী খেলাফত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঐ সময় উত্তর তুরস্কের আর্মানীরা রুশদের নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা শুরু করে। এ কারণে তুর্কী খেলাফত তাদেরকে জোরপূর্বক উত্তর তুরস্ক থেকে তুলে দিয়ে দক্ষিণ তুরস্কে চলে যেতে বাধ্য করে। ১৯১৫-র এপ্রিলে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। আর্মানীরা দাবী করে যে, এ সময় তুর্কী খেলাফত গণহত্যার আশ্রয় নেয় এবং এতে দশ লাখ আর্মানী নিহত হয়েছিল।[২০] এ দাবীর সত্যতা কতখানি তা অবশ্য গবেষণার দাবী রাখে, কিন্তু এর প্রচারের ফলে সর্বত্র তুর্কীদের বিরুদ্ধে আর্মানীদের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায় আযারবাইজান ও জর্জিয়া ১৯২০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত হলে উভয় দেশের আর্মানী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তারা, নগোর্নো-কারাবাগের জনগণ আর্মানী—এ যুক্তিতে ঐ অঞ্চলটিকেও আর্মেনিয়াভুক্ত করার জন্যে বলশেভিক সরকারকে অনুরোধ জানায়। যদিও আর্মেনিয়ার সাথে নগোর্নো-কারাবাগের সীমান্ত নেই, তথাপি একই দেশের (সোভিয়েত ইউনিয়নের) অন্তর্ভুক্ত বিধায় নগোর্নো-কারাবাগের প্রশাসন দেখাশুনার দায়িত্ব আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্রের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যার আশ্রয় নেয়। ফলে ১৯৯১-র এপ্রিলের মধ্যেই ১৬ হাজার মুসলমান ঐ এলাকাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

যেহেতু নগোর্নো-কারাবাগের যুদ্ধ কোন সাধারণ বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল মুসলমানদের রক্তপাতের জন্য ক্রুসেডারদের সৃষ্ট প্রাচ্য রণাঙ্গন, তাই শুধু অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করেই ক্রুসেডার-বিশ্ব ক্ষান্ত থাকে নি, বরং সরাসরি সৈন্য পাঠিয়েও এতে অংশগ্রহণ করে। এখানে আর্মেনীয় সৈন্যদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক আফ্রিকান, আমেরিকান ও রুশ খৃস্টান সৈন্য যুদ্ধে অংশ নেয়।[২৩]

আর্মানী খৃস্টানদের উদ্দেশ্য শুধু নগোর্নো-কারাবাগকে আর্মেনিয়াভুক্ত করা ছিল না, বরং আর্মেনিয়া তখন দ্বিতীয় ইসরাইলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাই নগোর্নো-কারাবাগ ছাড়িয়ে তারা আযারবাইজানের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য-পশ্চিম এলাকা পুরোপুরি দখল করে নেয়। তারা সেখানকার আযারী মুসলমানদেরকে তাদের বাড়ীঘর থেকে উৎখাত বা বাড়িঘর ত্যাগে বাধ্য করে। ১৯৯৩-র আগষ্ট মাসের শেষ নাগাদ আর্মেনিয়া আযারবাইজানের শতকরা ২০ভাগ এলাকা দখল করে নেয়।[২৪] ১৯৯৩-র জুলাই পর্যন্ত এ যুদ্ধের ফলে দশ লাখ লোক শরণার্থীতে পরিণত হয়।[২৫] ১৯৯৪ সালের মে মাসে দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়া পর্যন্ত মোট ৩৫ হাজার লোক নিহত হয়।[২৬] বলা বাহুল্য যে, নিহতদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

আর্মেনীয় সেনাবাহিনী নগোর্নো-কারাবাগ ও তার আশেপাশের এলাকাসহ আযারবাইজানের এক পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড দখল করে নেয়। এক পর্যায়ে আযারবাইজান সরকার ইরানের সাহায্য চায়। কিন্তু একা ইরানের পক্ষে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তাই ইরান সরকার এ ব্যাপারে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানায়। কিন্তু এতে কেউ সাড়া দেয় নি। এমতাবস্থায় হাজার হাজার আযারী শরণার্থী আরাস্ নদী অতিক্রম করে ইরানে এসে আশ্রয় নেয়ার প্রেক্ষিতে ইরানী সেনাবাহিনী আযারবাইজানের অভ্যন্তরেই শরণার্থীদের জন্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ও ব্যবস্থাপনার জন্য আযারবাইজানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে রাশিয়া ইরানের বিরুদ্ধে হুমকি দেয়।[২৭] অন্যদিকে আর্মেনীয় সৈন্যদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক আফ্রিকান, আমেরিকান ও রুশ ভাড়াটে সৈন্য যুদ্ধ করে।[২৮]

আর্মেনীয় হামলায় দশ লক্ষাধিক আযারী দেশের ভিতরে-বাইরে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত আযারবাইজানের প্রেসিডেন্ট হায়দার আলীয়েভ্ রুশ মধ্যস্থতা মেনে নেন এবং যুদ্ধবিরতি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৯৪-র মে মাসে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। সাবেক কম্যুনিষ্ট হায়দার আলীয়েভ্ ইতিমধ্যে মস্কোকে খুশী করার জন্যে আযারবাইজানকে রুশ নেতৃত্বাধীন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত প্রজাতন্ত্রসমূহের

www.pathagar.com

জোট কমনওয়েলথ্ ফর ইন্ডেপেন্ডেন্ট স্টেট্স (সিআইএস)-এর সদস্য করেছেন। কিন্তু এরপরও আযারবাইজান আর্মেনীয় দখল থেকে তার হৃত ভূখণ্ড উদ্ধার করতে রুশ সহায়তা লাভে সক্ষম হয় নি।

## সূদানে

সুদান হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের অন্যতম। এ দেশটির রয়েছে অত্যন্ত গৌরবময় ইসলামী ঐতিহ্য। অন্যদিকে মিসর, ইথিওপিয়া, ও ইরিত্রিয়ার সাথে সীমান্ত থাকায় এবং লোহিত সাগরের উপকূলের অধিকারী হওয়ায় দেশটি কৌশলগত অবস্থানের দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। একারণে বহু পূর্ব থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডারদের এ দেশটির প্রতি বিশেষ লোলুপ দৃষ্টি ছিল।

সূদানের মহান ইসলামী নেতা মুহাম্মাদ আহমদ—যিনি 'সূদানের মাহ্দী' নামে সমধিক পরিচিত—১৮৮১ সালে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তিকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করে দেশটিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২৯] তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ ইসলামী হুকুমত ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

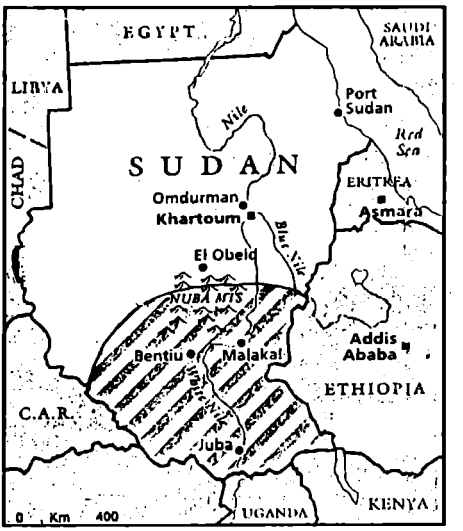


*দক্ষিণ সূদানের বিদ্রোহী এলাকা*

ইঙ্গ-মিসরীয় আগ্রাসনের ফলে ১৮৯৮ সালে পুনরায় দেশটি তার স্বাধীনতা হারায়। ১৯৫৬ সালে দেশটি পুনরায় স্বাধীন হবার পর মাহ্দীর উরাধিকারীরা শাসনক্ষমতা লাভ করেন। দু'বছর পর ১৯৫৮ সালে মার্কিন-তাবেদার জেনারেল ইব্রাহিম আব্বুদ্ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা দখল করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে ক্ষমতাত্যাগে বাধ্য হন। এরপর বেশ কতগুলো ক্যু-দেতা সংঘটিত হয়। অতঃপর ১৯৬৯ সালে কর্নেল (পরে জেনারেল) জাফর নিমেরী শাসনক্ষমতা দখল করেন। ১৯৮২ সালে তিনি সূদানের বুকে বেশ কয়েকটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'অনুমতি' প্রদান করেন।[৩০]

জেনারেল জাফর নিমেরী ছিলেন আমেরিকার তাবেদার। ইসলামের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তা সত্ত্বেও দেশের মুসলিম জনগণকে প্রতারিত করার লক্ষ্যে

www.pathagar.com

১৯৮২ সালে তিনি ইসলামী দণ্ডবিধি প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। কিন্তু ইসলামী আইন প্রবর্তনের কোনরূপ ক্ষেত্র প্রস্তুত না করেই তিনি এ পদক্ষেপ নেন। ফলে এ নিয়ে অমুসলিমদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে ক্রুসেডারদের উস্কানিতে ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ সূদানে খৃস্টানরা বিদ্রোহ করে।[৩১]

বিদ্রোহীরা প্রথমে ইসলামী আইন বাতিল করার ও দক্ষিণ সূদানের স্বায়ত্তশাসন দাবী করে। কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ সূদানের তিনটি প্রদেশকে সূদান থেকে বিচ্ছিন্ন করা। একারণেই পরবর্তীকালে 'ইসলামী আইন অমুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না' বলে সরকারী ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ সূদানে গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

দক্ষিণ সূদানে খৃস্টান বিদ্রোহীদের সাথে স্থানীয় এনিমিস্টিরাও সহযোগিতা করে চলেছে। সেখানে খৃস্টান মিশনারীরা ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে।[৩২] বস্তুতঃ খৃস্টান সম্প্রদায় সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক ক্রুসেড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা শুধু মুসলমানদের হত্যা করছে না, বরং মুসলিম কিশোরদের ধরে নিয়ে তাদের জন্যে কাজ করতে বাধ্য করছে। এক খবর অনুযায়ী তারা ১২ হাজার কিশোরকে ধরে নিয়ে গোলাবারূদ বহনের কাজে ব্যবহার করেছে।[৩৩]

১৯৮৫-র এপ্রিলে জেনারেল আবদুর রহমান সুয়ারুয্যাহাব নিমেরীকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত সাদেক আল-মাহ্দীর সরকার পুররোপুরি পাশ্চাত্যপন্থী নীতি গ্রহণ করলে ১৯৮৯ সালে জেনারেল ওমর হাসান আল-বাশীর তাঁকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

জেনারেল ওমর হাসান আল-বাশীর একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ও ইসলামী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তাই তিনি আমেরিকার তাবেদারী করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি সূদানের স্বমানখ্যাত ইসলামী নেতা শেখ হাসান আত্-তুরাবীর তত্ত্বাবধানে এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সহায়তায় সূদানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এতে ক্রুসেডাররা প্রমাদ গণে। তারা একদিকে দক্ষিণ সূদানের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা তীব্রতর করে, অন্যদিকে আমেরিকা সূদানকে সন্ত্রাসবাদী দেশের তালিকাভুক্ত করে দেশটির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এর বেশ পূর্ব থেকেই আমেরিকা সূদানে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়। পরে আন্তর্জাতিক অর্থতহবিল (আইএমএফ)-এ সূদানের সদস্যপদ বাতিল করে দেয়। আমেরিকা তার তাবেদার মিসরের মাধ্যমেও সূদানের বিরুদ্ধে হুমকি ও চাপ সৃষ্টি করে। সূদান-সরকারকে অচল করে দিয়ে দক্ষিণ সূদানকে বিচ্ছিন্ন করাই ছিল ক্রুসেডারদের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টির

www.pathagar.com

একমাত্র লক্ষ্য। এমতাবস্থায় সূদান-সরকার শান্তিপূর্ণ পন্থায় এ বিদ্রোহের অবসান ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু ক্রুসেডার-বিশ্বের উস্কানিতে বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ফলে ১৯৯২ পর্যন্ত প্রায় ৬০ লাখ লোক উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়[৩৪] এবং ১৯৯৭ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় দশ লক্ষাধিকে।[৩৫]

সূদান সরকার সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের উস্কানিতে বিদ্রোহীরা যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। শেষ পর্যন্ত সূদান সরকার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিরাট সাফল্যের অধিকারী হলে বিদ্রোহীদের একাংশ সম্মানজনক শর্তে শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়। ফলে ৭টি বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও সূদান সরকারের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তিতে অমুসলিমদের ওপর ইসলামী আইন কার্যকর না করার, পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয় এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদের পর গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলা হয়। কিন্তু ঐ সাতটি গোষ্ঠী এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও জন গারাং-এর নেতৃত্বাধীন প্রধান বিদ্রোহী গোষ্ঠী চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে ও বিদ্রোহ অব্যাহত রাখে।

সূদান সরকার বিদ্রোহীদের যে সব সুবিধা দিয়ে চুক্তি করেছে তা এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সুবিধা। কিন্তু এ সত্ত্বেও ক্রুসেডারদের প্ররোচনায় জন গারাং কর্তৃক চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার কারণ হচ্ছে দক্ষিণ সূদানের পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন গোত্রগুলো এসব সুবিধা লাভের পর আর সূদান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে না। একারণে নেতৃত্বলোভী জন গারাং ক্রুসেডারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী সাদেক আল-মাহ্দীর সাথে মিলে ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে সূদান সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত হামলা শুরু করে। ১৯৯৭-র শুরুর দিক পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। খৃস্টান নেতৃত্বাধীন ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া ও উগান্ডার সরকার সরাসরি বিদ্রোহীদের পক্ষে যুদ্ধ অংশ নেয়। এজন্যে আমেরিকা তাদের দুই কোটি ডলার সাহায্য দেয়।[৩৬] কিন্তু সূদানের ইসলামী বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে তারা ব্যর্থ হয়। পরে ১৯৯৯-র ১লা ডিসেম্বর মাহ্দী ও বাশীরের মধ্যে এক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলে মাহ্দীর সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে বিদ্রোহীরা আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে গারাং-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ সূদানে বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধ এখনো অব্যাহত রয়েছে।

## সোমালিয়ায়

আফ্রিকা-শৃঙ্গের মুসলিম দেশ সোমালিয়া। প্রায় এক কোটি মানুষের এ দেশটির জনসংখ্যার প্রায় সকলেই মুসলমান। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশসমূহের অন্যতম এ দেশটি। এ দেশটির ওপর ক্রুসেডারদের লোলুপ দৃষ্টি আজকে নতুন নয়।

www.pathagar.com

১৮৮৪ সালে দেশটির একাংশ ইংরেজরা দখল করে। অপর অংশ ১৮৮৯ সালে ইতালীয়রা দখল করে নেয়। ১৯৬০ সালে উভয় অংশ একত্রিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। সোমালিয়ার ওগাদেন মরু এলাকাকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী খৃস্টান-শাসিত ইথিওপিয়ার সাথে দেশটির যুদ্ধ বাধে। ১৯৭৮ সালে ওগাদেনে ইথিওপিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ শেষ হয়।

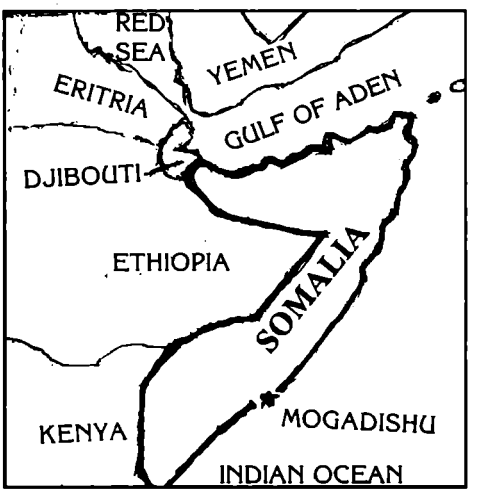


সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ যিয়াদ বারেহ্ ছিলেন আমেরিকার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি। এই সুযোগ নিয়ে ১৯৮০ সালে আমেরিকা সোমালিয়ার বারবারাহ্ সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের সুবিধা আদায় করে চুক্তি সম্পাদন করে। যিয়াদ বারেহ্র ডিক্টেটরী শাসন ও মার্কিন তাঁবেদারীর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিরোধিতা সৃষ্টি হতে থাকে। তিনি তা শক্তিপ্রয়োগে দমনের পথ বেছে নেন। শুধু ১৯৮১ সালেই তিনি ১৩ হাজার লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।[৩৭]

এ অবস্থায় যিয়াদ বারেহ্ আরো এক দশককাল শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। অতঃপর তাঁর জুলুম-অত্যাচারের মুখে যিয়াদ বারেহ্র বিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। আমেরিকার সমর্থন সত্ত্বেও ক্রমেই তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। ফলে ১৯৯০ সালের দিকে আমেরিকাও তাঁর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে। পরবর্তী বছর যিয়াদ বারেহ্ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজধানী মোগাদিসূ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট আলী মাহ্দী মোহাম্মদ পুরো ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেন। এই নিয়ে তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের নেতা জেনারেল ফারাহ্ আইদিদের নতুন করে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত সোমালিয়ায় দুর্ভিক্ষের তীব্রতা বেড়ে যায়। দুর্ভিক্ষজনিত কারণে শুধু শিশুমৃত্যুর সংখ্যাই তিন লাখে দাঁড়ায়।[৩৮] এই সুযোগে খৃস্টান মিশনারীরা সাহায্যতৎপরতার নামে এগিয়ে যায়। এর মধ্যে কেয়ার ও আইরিশ সংস্থা কন্সার্নের নাম বিশেষভাবে উলেখযোগ্য।[৩৯]

এমতাবস্থায় জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সোমালিয়ায় ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়। কিন্তু ত্রাণসামগ্রী বিতরণে সমস্যা দেখা দেয়। যুদ্ধরত সোমালীয়দের পক্ষ থেকে ত্রাণসামগ্রী

www.pathagar.com

লুট করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়। এ পরিস্থিতিতে আমেরিকা ত্রাণসামগ্রী পাহারা দেয়ার নাম করে সোমালিয়ায় সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য সৈন্য প্রেরণের পূর্বে আমেরিকা নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে একে বৈধতা দান করে।

নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন নিয়ে বহুজাতিক বাহিনী সোমালিয়ায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বহুজাতিক নামে কার্যতঃ মার্কিন বাহিনী ও মার্কিন-তাবেদার দেশসমূহের কিছু সৈন্য সোমালিয়ায় অবতরণ করে। ত্রাণতৎপরতার ছুতা ধরে আমেরিকা তার সামরিক লক্ষ্য হাসিলের দিকেই বেশী মনোযোগ দেয়। ১৯৯২-এর শেষ দিকে মার্কিন সেনারা সোমালিয়ার একটি বিমান ঘাঁটি দখল করে নেয়।[৪০] এরপর ত্রাণতৎপরতার নামে তারা গেরিলাদের ওপর অস্ত্রসমর্পণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু তারা শুধু জেনারেল ফারাহ্ আইদিদের লোকদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু করে।[৪১] কারণ, ফারাহ্ আইদিদ সোমালিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিলেন।

এই নিয়ে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ফারাহ্ আইদিদের সমর্থকরা আমেরিকার নিকট আত্মসর্পণ ও অস্ত্রসমর্পণে অস্বীকার করে। এই নিয়ে দু'পক্ষে ছোটখাট সংঘর্ষ শুরু হয় এবং ১২ই জানুয়ারী ১৯৯৩ তারিখে প্রথমবার একজন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। এর তিন দিনের মাথায় মার্কিন সৈন্যদের গুলীতে ৫জন গেরিলা নিহত হয়। এভাবে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ১৯৯৩-র মার্চ মাসে এক সংঘর্ষে বহুজাতিক বাহিনীভুক্ত ১৬ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। আমেরিকা এজন্য আইদিদ-সমর্থকদের দায়ী করে। আইদিদ তা অস্বীকার করলেও আমেরিকা আইদিদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা অব্যাহত রাখে। পাশাপাশি সোমালিয়ায় তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর সামরিক অভিযান চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে শত শত আইদিদ-সমর্থক নিহত ও হাজার হাজার আহত হয়। খাদ্যসাহায্য দিয়ে বাঁচানোর কথা বলে সোমালিয়ায় গিয়ে আমেরিকানরা সোমালীয়দের হত্যা করতে থাকে।

আমেরিকা ফারাহ্ আইদিদকে বাদ দিয়ে সোমালিয়ায় একটি রাজনৈতিক কাঠামো গঠনের উদ্যোগ পর্যন্ত গ্রহণ করে।[৪২] শুধু তা-ই নয়, আমেরিকানরা অনাহূতভাবে ফারাহ্ আইদিদের দেশে প্রবেশ করে তাঁকে বিদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করে। এমন কি তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করে। তবে আমেরিকার এসব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

সোমালিয়ায় সৈন্য পাঠানোর পিছনে যে আমেরিকার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা ছিল তা তার ডিগবাজিমূলক কথাবার্তা থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

১৯৯২-র ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডিক্ চিনি বলেছিলেন যে, পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে আমেরিকান সৈন্যরা সোমালিয়া ত্যাগ

www.pathagar.com

করবে।[৪৩] কিন্তু সে কথা তারা রক্ষা না করে নতুন করে সোমালিয়ায় সৈন্য পাঠায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ফারাহ্ আইদিদের অনুসারীদের আত্মত্যাগের ফলে আমেরিকান সৈন্যরা সোমালিয়াকে দখল করে রাখা অসম্ভব দেখতে পায়। ৪২ জন মার্কিন সৈন্যসহ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর মোট ১২০ জন সৈন্য নিহত হয়। সোমালিয়া থেকে মার্কিন বহিনীসহ জাতিসংঘ বাহিনীর প্রত্যাহার শুরু হয় এবং ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে সোমালিয়া বিদেশী সৈন্যমুক্ত হয়।

ইতিমধ্যে ফারাহ্ আইদিদ ইন্তেকাল করলে তাঁর পুত্র মোহাম্মদ হোসেন আইদিদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পরে ১৯৯৭-র ২২শে ডিসেম্বর কায়রো-চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সোমালীয়রা নিজেদের বিরোধ মোটামুটি নিষ্পত্তি করে। তবে এখনো দেশটিতে একক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি এবং মাঝে মাঝে ছোটখাট সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়।

সোমিলিয়ার বিভিন্ন অংশে ছোট-বড় ছয়টি দলের শাসন-কর্তৃত্ব চলছে। রাজধানী মোগাদিসুও প্রধান দু'টি শক্তির মধ্যে বিভক্ত হয়ে আছে।

## বাংলাদেশে

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের তথাকথিত শান্তিবাহিনী যে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে তা সর্বজনজ্ঞাত বিষয়। তবে এর পিছনে যে ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্র রয়েছে সে সম্পর্কে কম লোকই ওয়কিফহাল। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা চাকমা উপজাতির লোক ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। অন্যদিকে এদের ভারতে আশ্রয়গ্রহণ ও ভারত-সরকার কর্তৃক তাদের প্রশ্রয় দানের বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট যে, এরপর ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্রের কথা চিন্তা করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়। ষড়যন্ত্রকারীদের সাফল্য এখানেই। বস্তুতঃ তারা বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশকে বোকা বানিয়ে নিজেদের ঘৃণ্য লক্ষ্য চরিতার্থ করতে চায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জিলার মোট আয়তন দেশের মোট আয়তনের এক দশমাংশ। খনিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এ অঞ্চলটি বিশেষ কৌশলগত গুরুত্বের অধিকারী। এলাকার আয়তনের তুলনায় এ অঞ্চলের জনসংখ্যা খুবই কম। দু'হাজার সালের শেষ নাগাদ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা আনুমানিক ১৩ লাখে উপনীত হবে। ১৯৯১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ছিল ১০ লাখ। এদের অর্ধেক ছিল বাঙ্গালী এবং অর্ধেক উপজাতীয়। উপজাতীয়দের ৫০ ভাগের মধ্যে ২৪ ভাগ চাকমা, ১৪ ভাগ মারমা (মগ), ৬ ভাগ ত্রিপুরা এবং বাকী ৬ ভাগ অন্যান্য উপজাতি।[৪৪] চাকমারা প্রধানতঃ রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জিলায় বসবাস করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতির মোট জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা শূন্য দশমিক ৫ ভাগ মাত্র। কিন্তু তথাকথিত শান্তিবাহিনী সেখান থেকে

www.pathagar.com

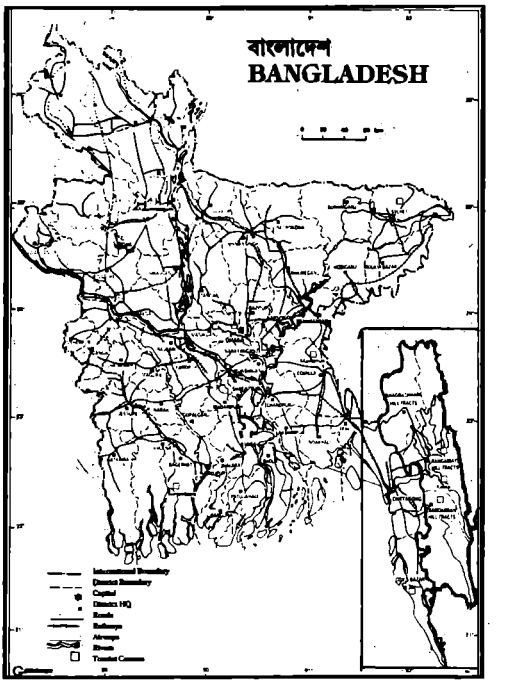


বাঙ্গালীদের উচ্ছেদ করে তথাকথিত স্বাধীন জুমল্যান্ড গঠন করতে চায়। এরই প্রথম ধাপ হিসেবে তারা ১৯৯৭-র ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সরকারের সাথে তথাকথিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তিতে তাদেরকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হলেও এর চূড়ান্ত পরিণতি এলাকাটির বিচ্ছিন্নতা।

অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো খৃস্টানদের সংখ্যা কম। কিন্তু এক দূরপ্রসারী লক্ষ্যে অসংখ্য খৃস্টান মিশনারী সংস্থা এ অঞ্চলে খৃস্টধর্ম প্রচার করে চলেছে। মানবতার নামে তারা খৃস্টধর্মের প্রচারের পাশাপাশি শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী তৎপরতাকে সমর্থন দিয়ে চলেছে এবং বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জুলুম-অত্যাচারের প্রচুর কল্পকাহিনী ছড়িয়েছে।[৪৫] দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশ-সরকার পশ্চিমা এনজিওগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই এনজিওগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক পার্বত্য চট্টগ্রামে নেতিবাচক তৎপরতা চালিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, বরং বিষয়টির আন্তর্জাতিকীকরণের চক্রান্তেও লিপ্ত রয়েছে।

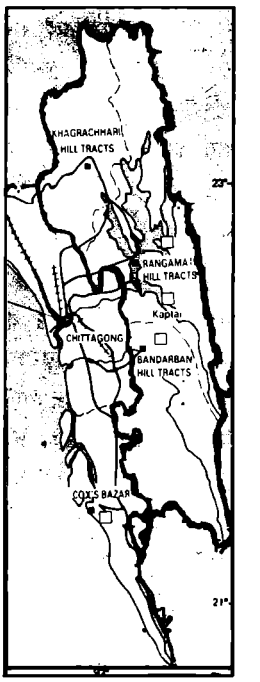


বস্তুতঃ চাকমারা খৃস্টান না হলেও খৃস্টান মিশনারী সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় 'স্বাধীনতা' লাভের স্বপ্নে বিভোর। খোদা না করুন, কখনো এ তথাকথিত স্বাধীনতা এলে তা যেমন ক্রুসেডার-বিশ্বের প্রত্যক্ষ সমর্থনের কারণেই আসবে, তেমনি এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শান্তিবাহিনী বা চাকমারা পুরোপুরি তাদের ক্রীড়নক হয়ে পড়বে। সবচেয়ে বড় বিপদ

www.pathagar.com

এখানেই। দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূখণ্ডের ওপর দেশের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সরকার, সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বিপদের ভয়াবহতা এখানে যে, পর্দার আড়ালে অবস্থিত নায়কদের লক্ষ্য শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, বরং গোটা বৃহত্তর চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

এ ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র শুধু বৃহত্তর চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে নয়; এর আওতা বিস্ময়করভাবে ব্যাপকপতর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, এশিয়া মহাদেশে খৃস্টধর্মের কোন বড় ঘাঁটি নেই। এশিয়ার একমাত্র খৃস্টান রাষ্ট্র হচ্ছে ফিলিপাইন। কিন্তু এ দেশটিকে জোর করে খৃস্টান বানানো হয়েছে। সেখানকার বেশীর ভাগ অধিবাসী ছিল মুসলমান। স্পেনীয়রা ১৫২১ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইনের দখল সমাপ্ত করার পর স্পেনে মুসলিম নিধনের কায়দায় সেখানেও মুসলিম নিধন ও তাদের জোর করে খৃস্টানে পরিণত করার পদক্ষেপ নেয়।

অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রুসেডাররা পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম এলাকা লেবাননকে খৃস্টান-সংখ্যাগুরু দেশে পরিণত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করলেও তা ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ এই গোটা মহাদেশে ফিলিপাইন ছাড়া ক্রুসেডারদের আর কোন বড় ঘাঁটি নেই। এ ক্ষেত্রে তারা মহাদেশের মাঝামাঝি ভারতীয় উপহাদেশের একটি অংশকে ক্রুসেডের ঘাঁটিতে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ইংরেজ-পদানত হবার পর পরই।

তারা মুসলমানদের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচারে খুব একটা সুবিধা করতে পারে নি। বিশেষ করে মুন্সী মুহাম্মাদ মেহেরুল্লাহ্‌র বদৌলতে বাংলার মুসলমানরা খৃস্টান মিশনারীদের হাত থেকে রক্ষা পায়। এমতাবস্থায় খৃস্টান মিশনারীরা উপজাতীয় এলাকাগুলোর দিকে বেশী দৃষ্টি প্রদান ও সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এক্ষেত্রে তারা সফলতাও লাভ করে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের সাতটি প্রদেশ নিয়ে যে বৃহত্তর আসাম তার মধ্যে নাগাল্যান্ড ও মেঘালয় সুনিশ্চিতভাবে খৃস্টান-সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৪৬] মিজোরাম ও মণিপুরেও সম্ভবতঃ তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই ঐ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে খৃস্টানরা। এর পাশে উত্তর বার্মার কারেন উপজাতিও খৃস্টান; তারাও বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে। আসাম ও ত্রিপুরার কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনেও মিশনারীরা মদদ দিয়ে চলেছে। সংখ্যাগুরু না হলেও পর্দান্তরালে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশ্যেই স্থানীয় খৃস্টানরা নেতৃত্ব দিচ্ছে। উত্তর ভারতে যে ঝাড়খন্ড আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতেও খৃষ্টানদের মদদ ছিল। সম্প্রতি এ আন্দোলন সফল হয়েছে এবং ভারত সরকার ঝাড়খণ্ড প্রদেশ গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

www.pathagar.com

নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়ন আসাম থেকে প্রায় অর্ধ কোটি মুসলমানকে বাঙ্গালী আখ্যা দিয়ে উৎখাত করার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে; এর উদ্দেশ্য হচ্ছে খৃস্টানদের আনুপাতিক সংখ্যাশক্তি বৃদ্ধি করা। একই কারণে, তারা পশ্চিম বাংলা ও নেপাল থেকে আগত হিন্দুদের বংশধরদেরও বহিস্কারের দাবী তুলেছে।

মুখে খৃস্টান রাষ্ট্রের কথা না বললেও এবং উপজাতীয় জনগণের অধিকারের কথা বললেও তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের তিন কোটি খৃস্টানের[৪৭] জন্যে একটি স্বাধীন খৃস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও গেরিলাযুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে এবং স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছে।

ভারতের কাশ্মীরে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, পাঞ্জাবে দীর্ঘদিন যাবত বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাযুদ্ধ চলছে। তামিল নাড়ুতেও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছে। ঝাড়খণ্ড এলাকার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ইতিমধ্যেই শক্তির পরিচয় দিয়ে সফল হয়েছে। ক্রুসেডাররা অপেক্ষা করছে উপযুক্ত সময়ের জন্য। তারা ভারতকে টুকরো টুকরো করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছে। একই সময়ে অন্যান্য প্রদেশে সর্বাত্মক গেরিলাযুদ্ধ শুরু হলে তারা উক্ত সাত প্রদেশ নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেবে। পরে এর সাথে কারেন, ঝাড়খণ্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে যোগ করবে। কিন্তু তাদের সাগরে নামার পথ চাই। আর এ পথ কেবল গোটা চট্টগ্রাম দখলের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে।

বস্তুতঃ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ভূখণ্ড বন্টনের সময় ভবিষ্যত খৃস্টান রাষ্ট্রের বিষয়টি মনে রাখা হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা যায়। ভারতকে তিনটি রাষ্ট্রের ইউনিয়নে পরিণত করার প্রস্তাব বানচালের পিছনে এ লক্ষ্য ছিল বলেই মনে হয়। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে একটি, বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি এবং বাকী এলাকা নিয়ে একটি প্রজাতন্ত্র গঠনের প্রস্তাব দেয়া হলে আসামের গভর্নর বাংলার সাথে থাকতে অস্বীকার করেন। ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতে ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু ভারতের সাথে আসাম এলাকার সংযোগ হয় খুবই দুর্বল। অন্যদিকে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) মূল ভূখন্ডের সাথে চট্টগ্রাম এলাকার সংযোগও একই রকম দুর্বল। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আসাম স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ভারতের পক্ষে তার সফল মোকাবিলা করা হবে অসম্ভব। অন্যদিকে পরিকল্পিত খৃস্টান রাষ্ট্র চট্টগ্রামকে দখল করে নিয়ে সমুদ্রে নামার পথ করে নিলে তার মোকাবিলা করাও বাংলাদেশের জন্যে খুবই দুরূহ ব্যাপার হবে।

বস্তুতঃ ত্রিপুরাও বাংলারই অংশ ছিল। ভারত বিভাগের সময় ত্রিপুরাকে ও বার্মার মুসলিম এলাকা আরাকানকে পাকিস্তানভুক্ত না করার পিছনে হয়তো দেশটিকে কৌশলগতভাবে দুর্বল করে রাখার উদ্দেশ্যই কার্যকর ছিল। আর একবার ক্রুসেডাররা

www.pathagar.com

কোন এলাকা দখল করে নিলে এরপর আলোচনার পর আলোচনাই চলবে; এলাকা তারা কোন দিনই ফেরৎ দেবে না। ফিলিস্তিন ও আযারবাইজানে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিরাজমান। অতএব, এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার পূর্বেই সতর্ক ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক তথাকথিত শান্তিবাহিনী ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে ২৫ হাজার বাঙালী মুসলমানকে হত্যা করে[৪৮] এবং এখনো তাদের উৎখাতের দাবীতে অটল। অন্যদিকে আসামের খৃস্টান বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সেখানকার হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদেরই বেশী হত্যা করছে এবং প্রায় অর্ধ কোটি মুসলমানকে বাংলদেশে ঠেলে দিয়ে এদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বিপর্যয় সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর রিপোর্ট অনুযায়ী একটি বৃহৎ শক্তি ও খৃস্টান মিশনারীরা খৃস্টান নাগা বিদ্রোহীদের মদদ দিচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ইন্ধন যোগাচ্ছে।[৪৯] অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে শান্তিচুক্তি করলে আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো দ্রুততম গতিতে তাকে স্বাগত জানায়। এ থেকেই প্রমাণিত যে, সেভেন সিস্টার্স ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার মূল নায়ক তারাই।[৫০]

বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের সাথে যে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছে তা নিয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, এককেন্দ্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের কোন অংশের জন্য স্বায়ত্তশাসনের কোন সুযোগ সংবিধানে নেই যা পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেয়া হয়েছে এবং এ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতীয়দের; উপজাতীয়-বাঙ্গালী নির্বিশেষে সেখানকার সকল অধিবাসীকে নয়। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদে উপজাতীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও তাদের জন্য এ পরিষদের প্রধানের পদ নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা দেশের যে কোন স্থানে জমি ক্রয় করতে পারলেও বাঙ্গালীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদের অনুমতি ছাড়া সেখানে জমি ক্রয় করতে পারবে না। শুধু তা-ই নয়, বর্তমানে সেখানে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের মধ্যে কে সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী তা আঞ্চলিক পরিষদই নির্ধারণ করবে। এভাবে সেখানে বাঙ্গালীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। এমন কি সরকার ঐ অঞ্চলের কোন ভূমি অধিগ্রহণ করতে চাইলে আঞ্চলিক পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন হবে।

তথাকথিত শান্তিচুক্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে বিচ্ছিন্নতার অধিকার দেয়া হয় নি। তবে এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার সুযোগ

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। এ চুক্তির পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের এবং ভারতেরও সায় রয়েছে। এ কারণে ভবিষ্যতেও কোন সেক্যুলার সরকার এ সংবিধানবিরোধী চুক্তি বাতিলের পদক্ষেপ নেবে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে চুক্তি বাতিলের পদক্ষেপ নিলে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এবং সেক্ষেত্রে তাদের শক্তিশালী অবস্থানের কারণে বিদ্রোহ দমন করা খুবই কঠিন হবে। তাছাড়া বিদ্রোহ দমনের পদক্ষেপ নিলে ক্রুসেডাররা বিশ্বব্যাপী হৈচৈ করবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত উভয়ই সেভেন সিস্টার্সের জন্যে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দানের কথা বলছে। বিশেষ করে ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত লক্ষ্য সমগ্র বৃহত্তর চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। অবশ্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে ক্রুসেডাররা ও ভারত একমত হলেও উভয়ের লক্ষ্য পরস্পরের বিপরীত। ভারতের লক্ষ্য সেভেন সিস্টার্সের বিদ্রোহ দমনকে সহজতর করা এবং ক্রুসেডারদের লক্ষ্য সেভেন সিস্টার্স স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তাকে সামরিক সাহায্য পৌঁছানোর পথ তৈরী করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র বানচাল করতে হলে সংবিধানবিরোধী চুক্তি বাতিল করার সাথে সাথে ঐ এলাকায় ব্যাপকভাবে বাঙ্গালী জনগণকে পুনর্বাসন দিতে হবে, তাদেরকে স্থায়ী ভূমিঅধিকার দিতে হবে, বাঙ্গালীদের জন্য বেসরকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থা তথা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে হবে, উন্মুক্ত নিরাপত্তাবেষ্টনী গঠনসহ সীমান্তপ্রহরাকে কঠোরতর করতে হবে, সেভেন সিস্টার্সের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে ভারতের সাথে ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে হবে (যেমন ঃ কোন বিদ্রোহীকে আশ্রয় না দেয়া এবং কেউ প্রবেশ করলে তাকে তৃতীয় দেশে বহিস্কার), উপজাতীয়দের জান-মালের নিরাপত্তা ও ভূসম্পদের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, পশ্চিমা ও পশ্চিমা অর্থপুষ্ট এনজিও ও খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা নিষিদ্ধ করতে হবে এবং উপজাতীয়দের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করতে হবে।

## কসোভোতে

মুসলিম উম্মাহ্‌র ওপর ক্রুসেডারদের সাম্প্রতিকতম ক্রুর থাবা বিস্তৃত হয়েছে কসোভোতে। সেখানকার কসোভো লিবারেশন আর্মি (কেএলএ) মুক্তিযুদ্ধ শুরু করলে খণ্ডিত যুগোস্লাভিয়ার সার্ব-বাহিনী সেখানকার জনগণের ওপর ব্যাপক দমনাভিযান ও গণহত্যার আশ্রয় নেয়। এর ফলে কসোভোর মুসলিম জনগণ ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করে। এমতাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো-বাহিনী যুগোস্লাভিয়ার ওপর বিমান

www.pathagar.com

হামলা চালায়। শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের চাপের মুখে শান্তিআলোচনা শুরু হয়।

কসোভো বর্তমান ক্ষুদ্রতর যুগোশ্লাভিয়ার সার্বিয়া প্রজাতন্ত্রের একটি প্রদেশ। আলবেনিয়া সীমান্তবর্তী এ প্রদেশটির আয়তন ১০ হাজার ৮৮৭ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ২০ লাখ। এদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ আলবেনীয় বংশোদ্ভুত মুসলমান। সে হিসেবে মুসলিম জনসংখ্যা ১৮ লাখ। অবশ্য ১৯৯৫-এর মাঝামাঝি সার্বীয় দুঃশাসন ও দারিদ্রের কারণে প্রায় প্রায় তিন লাখ মুসলমান কসোভোর বাইরে চলে যায়। অন্যদিকে ক্রোয়েশিয়া থেকে আগত সার্বদের একাংশকে কসোভোতে পুনর্বাসিত করা হয় এবং ধীরে ধীরে সার্বিয়ার সার্বদের মধ্য থেকেও কতক লোক কসোভোতে এসে বসবাস করতে শুরু করে। ফলে ১৯৯৫-র শেষ নাগাদ কসোভোতে অবস্থানরত জনসংখ্যার মধ্যে আনুমানিক ১৫ লাখ ছিল আলবেনীয় বংশোদ্ভুত মুসলমান ও ৩ লাখ ছিল সার্ব বংশোদ্ভুত অর্থোডক্স খৃস্টান।

সার্বরা জাতিগতভাবে মুসলিম-বিদ্বেষী। তারা যেভাবে বসনিয়ায় মুসলিম গণহত্যা চালায় সেভাবে কসোভোতেও হত্যা, সন্ত্রাস ও দমননীতির মাধ্যমে প্রদেশটির জনসংখ্যাবিন্যাসে পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করে। ১৯৯৭-র শেষ দিক থেকে কসোভোতে নতুন করে দমননীতি শুরু হয় এবং ১৯৯৯-র মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর ফলে সেখানকার মুসলিম জনগণের মধ্য থেকে দশ লাখ লোক কসোভোর বাইরে চলে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।[৫১] অবশ্য ন্যাটোর অভিযানের পর সার্ব-বাহিনী কসোভো ত্যাগ করলে তাদের প্রায় সকলেই কসোভোতে ফিরে আসে। অন্যদিকে অনেক সার্ব কসোভো ত্যাগ করেছে।

ঐতিহাসিকভাবে কসোভো সার্বিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না। আলবেনীয় বংশোদ্ভুত মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত এ দেশটি তুর্কী ওসমানী খেলাফতের অংশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানী খেলাফতের বিপর্যয় ঘটলে গোটা বলকান উপদ্বীপ তার হাতছাড়া হয়ে যায়। এসময় ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো নিয়ে যুগোস্লাভিয়া গঠিত হয় এবং কসোভো সার্বিয়ার অংশে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে বৃহত্তর যুগোস্লাভিয়া গঠিত হয়। ৬টি প্রজাতন্ত্র ও ৩টি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ নিয়ে কনফেডারেশন আকারে বৃহত্তর যুগোস্লাভিয়া গঠিত হয় সংবিধানে যার প্রজাতন্ত্রগুলোর

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নতার অধিকার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির শাসনে কার্যতঃ যুগোস্লাভিয়া ছিল এককেন্দ্রিক দেশের ন্যায়। তবে এ সংবিধানের কারণেই কমিউনিজমের বিলুপ্তির পর যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে যায়।

কসোভো ও সার্বিয়ার মধ্যে কোন দিক দিয়ে ঐক্যসূত্র নেই। বর্ণ, গোত্র, ধর্ম, ভাষা ও ভূখণ্ড সব দিক থেকেই তারা পরস্পর আলাদা। একারণে কমিউনিস্ট শাসনের শেষের দিকে আশির দশকে কসোভোর আলবেনীয় জনগণ কসোভোকে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা দেয়ার জন্য দাবী জানায়। কিন্তু সার্বরা সে দাবী মেনে নেয়ার পরিবর্তে ইতিপূর্বেকার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনও বাতিল করে দেয়।

বস্তুতঃ কমিউনিষ্ট যুগোস্লাভিয়ায় সার্বদেরই ছিলো একাধিপত্য। কমিউনিজমের বিদায়ের জন্য যখন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং সিআইএ-র রিক্রুটকৃত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ—যারা পরে সাবেক কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচিত হন— বুঝতে পারেন যে, কমিউনিজমের বিদায়ের পরে যুগোস্লাভিয়া আর এক থাকবে না। এ কারণে তাঁরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন কসোভো পার্লামেন্টে আইন পাশ করিয়ে কসোভোর স্বায়ত্তশাসনের বিলুপ্তি ঘটান এবং কসোভোকে সার্বিয়ার অঙ্গীভূত একটি স্বায়ত্তশাসনবিহীন প্রদেশে পরিণত করেন। এ ঘটনা ঘটে ১৯৮৯ সালে। একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় আরেকটি মুসলিম-প্রধান প্রদেশ সান্‌জাকের ক্ষেত্রে এবং খৃস্টান-প্রধান প্রদেশ ভজ্‌ভোদিনার ক্ষেত্রে। কসোভোর মুসলিম জনগণ অবশ্য এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। কিন্তু কঠোর দমননীতির আশ্রয় নিয়ে সে বিক্ষোভ দমন করা হয়।

১৯৯১ সালে যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে যায়। প্রথমে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া এবং পরে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও মেসিডোনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এসময় কসোভোর মুসলমানরাও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু সংবিধানে তাদের স্বাধীনতার অধিকার ছিল না। সেহেতু তারা কোনরূপ আন্তর্জাতিক সমর্থন পায় নি। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অস্ত্রশক্তি ও বাইরের পৃষ্ঠপোষকতার বিচারে দুর্বলতার কারণে তাদের স্বাধীনতার ঘোষণা কার্যতঃ কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য স্বাধীনতাযুদ্ধের রূপ নিতে পারে নি। ফলে যথাযথভাবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় নি। অবশ্য কসোভো লিবারেশন আর্মি (কেএলএ) কিছু তৎপরতা চালাতে থাকে এবং কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠনও কাজ করতে থাকে। ১৯৯৫ এবং ১৯৯৮-৯৯-র গণহত্যা কেএলএ-কে দমনের নামে চালানো হয়।

কসোভোর জনসাধারণ মুসলমান এবং একারণে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি মুসলিম উম্মাহ্‌র সমবেদনা রয়েছে। অন্যদিকে ঐতিহাসিক ও বিরাজমান

www.pathagar.com

পরিবেশগত কারণে তাদের স্বাধীনতার দাবী অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এ ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ঠাণ্ডা মাথায় সুচিন্তিত পরিকল্পনামাফিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে আবেগপ্রসূত ও হঠকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে কসোভোর মুসলমানদের জন্য মর্মান্তিক ভাগ্যবিপর্যয় নেমে আসে এবং তা বসনিয়ার মুসলমানদের ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রায় অনুরূপ। এর কারণ কসোভো ইস্যুতে মুসলিম উম্মাহ্‌র কোন ভাগ্যনির্ধারণী ভূমিকা ছিল না, বরং এ ভূমিকায় নামে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা শক্তিবর্গ। বলা বাহুল্য যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থে নয়, বরং স্বীয় রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থেই কসোভো ইস্যুকে হাতে নেয়।

কসোভো ইস্যুতে কয়েকটি বিষয় মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমতঃ কসোভোর আলবেনীয় বংশোদ্ভুত মুসলমানরা ইসলামী ও মুসলিম অনুভূতি থেকে নয়, বরং জাতীয়তাবাদী অনুভূতি থেকে স্বাধীনতা চাচ্ছে। তারা স্বাধীন হতে পারলে আলবেনিয়া ও মেসিডোনিয়ার আলবেনীয় অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন বৃহত্তর আলবেনিয়া গঠনের উদ্যোগ নেবে। ইতিমধ্যেই মেসিডোনিয়ার আলবেনীয়রা অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু তাদের এ জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ ধরনের কোন বৃহত্তর আলবেনিয়া গঠনকে সমর্থন করবে না।

দ্বিতীয়তঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো কসোভো ইস্যুকে স্বীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করছে। ২০০০ খৃষ্টাব্দের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের নেতৃত্বে থাকছে না এটা অবধারিত বিষয়। শক্তিশালী দেশগুলো অনুগ্রহপূর্বক ২০০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বে মার্কিন নেতৃত্বের বিষয়টি মেনে নিয়েছে। অতঃপর বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতৃত্ব তার স্থান দখল করবে। এমতাবস্থায় পূর্ব গোলার্ধে আমেরিকা তার উপস্থিতি বজায় রাখার জন্য বাস্তব উপযোগিতাভিত্তিক কতক ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। তদনুযায়ী বসনিয়া-পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এমনভাবে মোড় নেয় যে, সেখানে সার্ব ও মুসলিম-ক্রোট প্রজাতন্ত্রদ্বয়ের মাঝখানে মার্কিন সৈন্য অবস্থান নিয়েছে যা হয়তো দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকবে। মেসিডোনিয়ায় পূর্ব থেকেই জাতিসংঘ বাহিনীর নামে হাজার খানেক মার্কিন সৈন্য ছিল। অতঃপর আলবেনিয়ার রাজনৈতিক গোলযোগের সূত্র ধরে সেখানেও মার্কিন সৈন্য অবস্থান নেয়। এরপর কসোভো পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো সেখানে হস্তক্ষেপ করে। এভাবে ২০০০ খৃস্টাব্দের পরে পূর্ব গোলার্ধে মার্কিন নেতৃত্বের অবসান ঘটলেও বলকান উপদ্বীপে দৃষ্টিগ্রাহ্য মার্কিন উপস্থিতি বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যদিকে রাশিয়া গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রত্যাবর্তনের পরেও একটি বৃহৎ শক্তি ও আঞ্চলিক নেতৃত্বের মর্যাদা সংরক্ষণে সক্ষম হয়েছে। রাশিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে

www.pathagar.com

তার প্রভাব হচ্ছে সিআইএস-এর মাধ্যমে এবং ইউরোপে তার প্রভাবের ভিত্তি হচ্ছে স্লাভ জাতিগত উৎস ও ধর্মীয় দিক থেকে অর্থোডক্স খৃস্টান পরিচিতি। সে হিসেবেই খণ্ডিত যুগোস্লাভিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীন মিত্র। কিন্তু কসোভো ধর্ম ও জাতিত্ব উভয় দিক থেকেই অ-স্লাভ ও অ-অর্থোডক্স হওয়ায় পশ্চিম ইউরোপের ক্যাথলিক দেশগুলো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থোডক্স ধর্মীয় সীমান্তকে কসোভো-সার্বিয়া সীমান্তে নির্ধারণ করতে চাচ্ছে। তারা অর্থোডক্স ভূখন্ডের সম্প্রসারণ রোধ করতে চাচ্ছে, তবে মুসলিম রক্তের বিনিময়ে। এতে কসোভো সার্বিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হতে পারুক বা না-ই পারুক ক্যাথলিক ইউরোপের প্রভাববলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এটাই তাদের বড় লাভ।

বলা বাহুল্য যে, সার্বরা ঘোরতর মুসলিম-বিদ্বেষী। এ সত্ত্বেও কসোভো ও সার্বিয়ার মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি না করে সেখানে স্বাধীনতার শ্লোগান তোলা আত্মঘাতী হয়েছে। কেএলএ শুরু থেকেই আমেরিকার সমর্থনের ওপর নির্ভর করে আসছে যা প্রমাণ করে যে, কসোভোর মুসলিম জনগণের স্বার্থে নয়, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেই কেএলএ-র জন্ম হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কসোভোর স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন করতে অস্বীকার করেছে[৫২] এবং স্বায়ত্তশাসনকে আলোচনা ও শান্তিচুক্তির ভিত্তি করেছে। কসোভো থেকে সার্ব সৈন্য প্রত্যাহার এবং তার পরিবর্তে সেখানে ন্যাটো-বাহিনী ও রুশ সৈন্য মোতায়েন করায় আপাততঃ সার্বদের জুলুম থেকে মুসলমানরা রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু কসোভোর স্বাধীনতার স্বপ্নের বিলুপ্তি ঘটেছে। অথচ এই মিথ্যা স্বপ্নের জন্যে কমপক্ষে ১১ হাজার মুসলমানকে প্রাণ দিতে হয়েছে।[৫৩] বিনিময়ে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন লাভবান হয়েছে।

কসোভোতে ন্যাটোর পক্ষ থেকে ৪০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। অথচ কেএলএ-কে (যার সদস্যসংখ্যা ১০ থেকে ৩০ হাজার বলে অনুমিত হয়েছে) মাত্র আড়াই থেকে তিন হাজার সদস্যের ন্যাশনাল গার্ড নামক আধাসামরিক বাহিনী গঠনের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং কেএলএ তা মেনে নিয়েছে (বা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে)।

## ইন্দোনেশিয়ায়

জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্র ও সেক্যুলার শাসকদের উদাসীনতার ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার নির্মম শিকার হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তাইমুর প্রদেশ সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

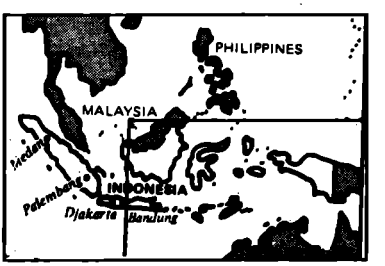


www.pathagar.com

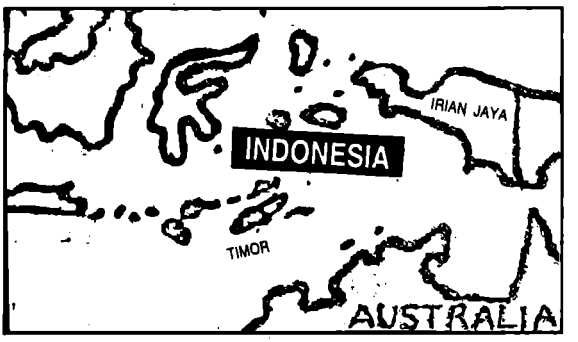


গেছে। অন্যদিকে ইরিয়ান জায়া প্রদেশের খৃস্ট ধর্মাবলম্বী আদিবাসী বিদোহীরা এ বিশালায়তন প্রদেশটিকে 'স্বাধীন' করার লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ী নাশকতামূলক তৎপরতা চালাচ্ছে। আর মালুকুতে খৃস্টানরা মুসলমানদের হত্যা করছে। এছাড়া মুসলিম অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও আচেহ্ প্রদেশেও বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা চলছে।

## পুর্ব তাইমূর

তাইমূর দ্বীপের নাম থেকেই সুস্পষ্ট যে, এটি মুসলমানদের দ্বারা আবিষ্কৃত একটি দ্বীপ। কিন্তু উপনিবেশিক দখলের যুগে দ্বীপটির পশ্চিম অংশ ওলন্দাজদের ও পুর্ব অংশ পর্তুগীজদের দখলে চলে যায়। পূর্ব তাইমূরের আয়তন ১৪,৯৩৭ বর্গকিলোমিটার। ১৯৪৫ সালে ওলন্দাজদের হটিয়ে দিয়ে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু পূর্ব তাইমূর পর্তুগীজ দখলে থাকায় তা ইন্দোনেশিয়ার সার্বভৌমত্বের বাইরে থেকে যায়। ইন্দোনেশিয়ার সরকার প্রথমে পূর্ব তাইমূর প্রশ্নে উদাসীনতার পরিচয় দেয়। পরে, ইন্দোনেশিয়ার ভৌগলিক সীমারেখার অভ্যন্তরে একটি ইউরোপীয় উপনিবেশের উপস্থিতি ইন্দোশিয়ার নিরাপত্তার জন্য কতখানি হুমকি তা বুঝতে পেরে ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়া পুর্ব তাইমূর দাবী করে। কিন্তু পর্তুগাল এ দাবীর প্রতি কর্ণপাত করা থেকে বিরত থাকে। এদিকে খৃস্টান মিশনারীরা সেখানে ব্যাপক তৎপরতা চালাতে থাকে।

মিশনারীদের সহায়তায় গঠিত ফ্রেতিলিন গেরিলা গোষ্ঠী পূর্ব তাইমূরে একটি স্বাধীন খৃস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে। অন্যদিকে এ্যাপোদেতী নামক অপর একটি সংগঠন পূর্ব তাইমূরের ইন্দোনেশিয়াভুক্তি দাবী করে। এ্যাপোদেতীর সদস্যরাও বেশীর ভাগই খৃস্টান। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশ হিসেবে পূর্ব তাইমূরের স্বাধীনতা অর্থবহ হবে না, বরং পাশ্চাত্যের হাতের পুতুল ও শোষণের শিকার হবে বুঝতে পেরেই তারা এ তথাকথিত স্বাধীনতা-দাবীর বিরোধিতা করে।

১৯৭৫-এর আগস্টে দু'পক্ষের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ফ্রেতিলিন একই বছর নভেম্বরে একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এমতাবস্থায় ইন্দোনেশিয়া একই বছর ৭ই ডিসেম্বর পূর্ব তাইমূরে সেনাবাহিনী পাঠায় এবং ১৯৭৬-এর জুলাই মাসে দ্বীপের এ অংশকে দেশের ২৭তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে।

www.pathagar.com

ভৌগলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিচারে গোটা তাইমূর দ্বীপ ইন্দোনেশিয়ার অপরিহার্য অংশ। পূর্ব তাইমূরে একটি খৃস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইন্দোনেশিয়ার জন্য নিরাপত্তাসমস্যা সৃষ্টি করতে বাধ্য। কিন্তু একদিকে ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্রের ফলে সেখানে ফ্রেতিলিন গেরিলাদের সশস্ত্র তৎপরতা অব্যাহত থাকে, অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার সেক্যুলার সরকার পূর্ব তাইমূর সমস্যার মোকাবিলার জন্য সেখানে আদর্শিক তৎপরতা তথা ইসলাম প্রচার ও জনসংখ্যা বিন্যাসে পরিবর্তনের কোন চেষ্টাই করে নি। অথচ ক্রুসেডাররা পাশ্চাত্যের আর্থিক সহায়তায় খৃস্টধর্মের প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ফলে অচিরেই সেখানে খৃষ্টানরা সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়।

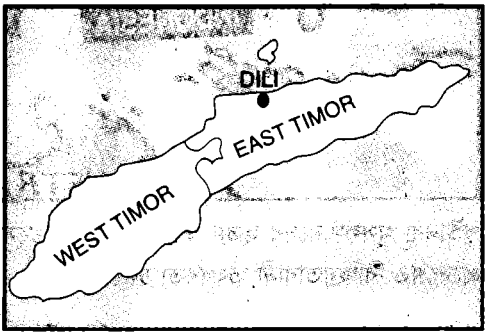


পূর্ব তাইমূরে ১৯৪০ সালে ক্যাথলিক খৃস্টানরা ছিল মাত্র শতকরা ৮ ভাগ। ১৯৭২ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ২৭ দশমিক ৮ ভাগে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়াভুক্তির পর পশ্চিমা ক্রুসেডারদের অর্থানুকুল্যে খৃস্টধর্মের পরিকল্পিত ব্যাপক প্রচারের ফলে ক্যাথলিক খৃস্টানদের হার অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ১৯৮৫ সালে দাঁড়ায় ৭৮ দশমিক ৮ ভাগে এবং ১৯৯৪ সালে দাঁড়ায় ৯২ দশমিক ৩ ভাগে।[৫৪]

ইন্দোনেশিয়ার সরকার পূর্ব তাইমূর সমস্যার মোকাবিলার জন্য সামরিক ও অর্থনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে। সেখানকার উন্নয়নের জন্য ইন্দোনেশিয়া সরকার যে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার মুখে তা বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা হ্রাসে কোন ভূমিকাই পালন করতে পারে নি। ফলে গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এর ফলে দীর্ঘ ২৫ বছরে ইন্দোনেশীয় বাহিনী ও ইন্দোনেশিয়াপন্থী মিলিশিয়াদের সাথে ফ্রেতিলিনের সংঘর্ষে পূর্ব তাইমূরে দুই লাখ লোক নিহত হয়েছে বলে[৫৫] দাবী করা হয়েছে। এতেও ক্রুসেডাররাই লাভবান হয়েছে।

১৯৯৮-এর মে মাসে সুহার্তোর পতনের পূর্বে ইন্দোনেশিয়ায় যে অর্থনৈতিক ধ্বস নামে এবং তাঁর পতনের পর যে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার ফলে ইন্দোনেশিয়ার সরকার ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো পাশ্চাত্যের চাপের মুখে পূর্ব তাইমূরের স্বাধীনতা প্রশ্নে সেখানে গণভোটের প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়। আমেরিকা সুস্পষ্ট ভাষায় এই বলে চাপ সৃষ্টি করে যে, পূর্ব তাইমূরে গণভোটে সম্মত না হলে ইন্দোনেশিয়ায় আমেরিকা কোন সাহায্যই দেবে না। এব্যাপারে আমেরিকান সিনেট ৯৮-০ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় ১৯৯৯-র ৩০শে আগস্ট জাতিসংঘের

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধানে পূর্ব তাইমূরে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রিত জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে সার্বিক সাহায্য প্রদান করে।

পূর্ব তাইমূরের শতকরা ৭৮ ভাগেরও বেশী সংখ্যক ভোটার স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। ইন্দোনেশিয়া সরকার গণভোটের রায় মেনে নেয়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়াপন্থী মিলিশিয়ারা স্বাধীনতাপন্থীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষ বন্ধ করার লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া সরকার পূর্ব তাইমূরে সামরিক শাসন জারী করে। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্যের ইচ্ছানুযায়ী সেখানে জাতিসংঘবাহিনী মোতায়েন করা হয়। অতঃপর ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব তাইমূরের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করে।

## ইরিয়ান জায়া

ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্রের ফলে ইন্দোনেশিয়ার বিশালায়তন ইরিয়ান জায়া (পশ্চিম নিউ গিনি) প্রদেশেও বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা চলছে। নিউ গিনি দ্বীপের পূর্ব অংশ স্বাধীন রাষ্ট্র যার নাম পাপুয়া নিউ গিনি। ইরিয়ান জায়ার আয়াতন ৪ লাখ ১২ হাজার ২৮১ বর্গকিলোমিটার যা ইন্দোনেশিয়ার এক পঞ্চমাংশেরও বেশী এবং বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় তিন গুণ। কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র ১৯ লাখ—যাদের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী খৃস্টান।

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এ বিশালায়তন প্রদেশটিতে দীর্ঘদিন থেকে খৃস্টান মিশনারীরা আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে এবং তাদের উস্কানি ও আর্থিক সহযোগিতায় আদিবাসীরা সশস্ত্র তৎপরতা চালাচ্ছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সেক্যুলার সরকার সেখানে ইসলাম প্রচারের বা জনসংখ্যাবিন্যাস পরিবর্তনের কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করে নি। ফলে প্রদেশটির ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অতি সম্প্রতি ইরিয়ান জায়ার খৃস্টান বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নতুন করে স্বাধীনতার দাবী তুলেছে। অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান ওয়াহিদ দৃঢ়তার সাথে এ দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন।

## আচেহ্

এছাড়া ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিম অংশের আচেহ্ (বা আকেহ্) প্রদেশেও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বিদ্যমান। প্রদেশটির আয়তন ৫৯ হাজার ৮১৪ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৪০ লাখ যাদের শতকরা ৯৮ ভাগই মুসলমান। অবশ্য এখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ইসলামী হুকুমতের দাবীদার। তবে সামগ্রিকভাবে ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম জনগণের মধ্যে দ্বীনী ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি যথেষ্ট না হওয়াই এ বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার মূল কারণ। এছাড়া এখানেও ক্রুসেডারদের উস্কানি থাকতে পারে যার লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়াকে টুকরো টুকরো ও দুর্বল করে ফেলা।

www.pathagar.com

আচেহ্-র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে ইন্দোনেশীয় সরকারের একটি সমঝোতাচুক্তি হয়েছে। এর ভিত্তিতে বিদ্রোহীরা আপাততঃ সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধ রেখেছে। ইন্দোনেশীয় সরকার প্রদেশটির জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে আচেহ্-সমস্যার সমাধান করার পরিকল্পনা করেছে।

## মালুকু

অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার খৃস্টান-প্রধান মালুকু প্রদেশে সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েক বার মুসলিম-খৃস্টান দাঙ্গা হয়েছে। এসব দাঙ্গায় খৃস্টানদের হাতে চার হাজার মুসলমান নিহত হয়েছে এবং আরো দুই লক্ষাধিক মুসলমান বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এর পিছনেও ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্র কার্যকর রয়েছে। মালুকুর মুসলমানরা এ দাঙ্গার জন্য আমেরিকাকে সুস্পষ্ট ভাষায় দায়ী করেছে। ক্রুসেডাররা ৮৩,৬৭৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ প্রদেশটিকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যেই দাঙ্গা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

## উত্তর-পূর্ব ভারতে

'সেভেন সিস্টার্স' নামে পরিচিত ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সাতটি রাজ্য, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম এবং বার্মার কারেন স্টেট নিয়ে একটি খৃস্টান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্যে ক্রুসেডার-বিশ্ব তাদের শতাব্দীপ্রাচীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে।

সেভেন সিস্টার্সের জনসংখ্যা বর্তমানে তিন কোটির মত। এদের মধ্যে ৩০ শতাংশ খৃস্টান এবং বাদবাকী হিন্দু, মুসলমান ও উপজাতি।[৫৬] ১৯৭১ সালে ঐ অঞ্চলে মুসলমানদের হার ছিল শতকরা ২৪ দশমিক শূন্য ৩ ভাগ।[৫৭] মুসলসমানদের মধ্যে জন্মহার তুলনামূলকভাবে বেশী হওয়ায় বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা খৃস্টানদের তুলনায় বেশী হবার সম্ভাবনা। অনেকে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ বলে মনে করেন।

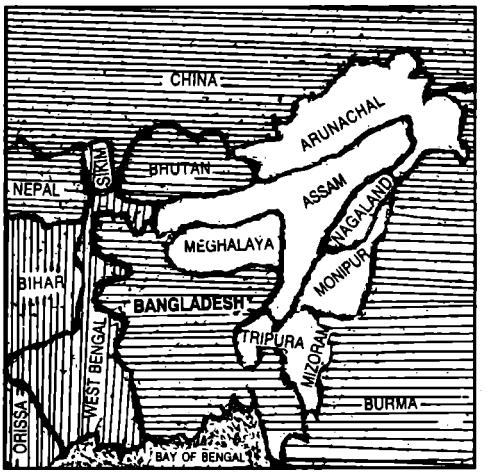


বর্তমানে সেভেন সিস্টার্সে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা চলছে তার সংগঠক ও পরিচালক হচ্ছে পশ্চিমা ক্রুসেডার শক্তি। তারা আর্থিক, সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে এ

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নতাবাদকে সহায়তা দিচ্ছে। ভারতীয় প্রশাসন ও গোয়েন্দাসংস্থার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশকারী সিআইএ-এজেন্টরা এ বিদ্রোহকে কৌশলগত সহায়তা দিচ্ছে। অন্যদিকে প্রচারষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে বাংলাদেশী জনগণের মধ্যে সেভেন সিস্টার্সের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন সৃষ্টির চেষ্টা চলছে এবং এ ব্যাপারে ক্রুসেডাররা ইতিমধ্যেই বহুলাংশে সফল হয়েছে।

কিন্তু সেভেন সিস্টার্সের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ ভারতের জন্য যতখানি বিপজ্জনক তার চেয়ে বহুগুণে বেশী বিপজ্জনক সেখানকার মুসলমানদের ও বাংলাদেশের জন্য। কারণ মুসলমানদের সংখ্যাশক্তির কারণে ক্রুসেডাররা সেভেন সিস্টার্সের মুসলমানদেরকে নিজেদের দুষ্ট লক্ষ্যের পথে ভবিষ্যত প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করছে। তাই তারা সেখানকার মুসলমানদের বাংলাদেশ থেকে আগত ও অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশে বিতাড়িত করতে চাইছে। অথচ সেখানকার বাংলাভাষী মুসলমানরা পুরুষানুক্রমে সেখানে বসবাস করে আসছে।

সেভেন সিস্টার্সের মধ্যে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় ও মণিপুরে খৃস্টানরা সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী এবং আসাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচলে তারা খুবই প্রভাবশালী। অন্যদিকে মুসলমানরা প্রধানতঃ আসাম রাজ্যে বসবাস করে এবং সেখানে তারা তুলনামূলক সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী। তাই আশির দশক থেকেই সেখানে মুসলিম বিতাড়নের দাবীতে আন্দোলন চলে আসছে। যদিও অতি সাম্প্রতিককালে কৌশলতগত কারণে আন্দোলনকারীরা নীরবতা অবলম্বন করছে। কিন্তু তারা তাদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করে নি।

আসাম থেকে মুসলিম বিতাড়নের প্রকাশ্য আন্দোলনের হোতা আসাম ছাত্র ইউনিয়ন (এএসইউ)। এছাড়া আরো অনেক সংগঠন রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের সাথে সুর মিলাচ্ছে। বিভিন্ন সময় তথাকথিত অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৪০ লাখ বা তার বেশী উল্লেখ করা হয়। এমন কি ৭০ লাখ[৫৮] পর্যন্ত সর্বোচ্চ দাবী করা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯৯৩ সালে খসড়া ভোটার তালিকায়ই ৩০ লাখ মুসলিম ভোটারের নাম বাদ দেয়া হয়।[৫৯]এমন কি প্রতি বারই চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় খসড়া তালিকাভুক্ত কয়েক লাখ মুসলমান ভোটারকে বাদ দেয়া হয়। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে এভাবে চার লাখ ভোটারের ভোটাধিকার বাতিল করে দেয়া হয়।[৬০] ১৯৯৯ সালের চূড়ান্ত তালিকায়ও তিন লক্ষাধিক ভোটারের নামে 'ডি' অক্ষর জুড়ে দেয়া হয় যার অর্থ 'ডাউটফুল—সন্দেহযুক্ত'।[৬১] অর্থাৎ এদের ভারতীয় নাগরিক হবার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। বলা বাহুল্য যে, এরূপ ভোটারের পক্ষে ভোট দানের সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

এছাড়া আসামের বোড়ো উপজাতি ক্রুসেডারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বোড়োল্যাণ্ড নামে পৃথক রাজ্য গড়ার জন্যে আন্দোলন করছে এবং তাদের দাবীকৃত এলাকা থেকে বাঙ্গালী ও নেপালী বংশোদ্ভুতদের বিতাড়িত করার জন্য হামলা ও হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় নিচ্ছে। এসব পৈশাচিকতার প্রধান শিকার হচ্ছে মুসলমানরা। শুধু তা-ই নয়, খৃস্টানরা নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে মুসলমানদেরকে জোর করে খৃস্টান বানাচ্ছে।[৬২] এছাড়া মণিপুর রাজ্যেও মুসলমানরা গণহত্যার শিকার হয়েছে।

ক্রুসেডাররা সেভেন সিস্টার্স থেকে মুসলমান ও হিন্দুদেরকে বিতাড়িত করতে চাচ্ছে। এক্ষেত্রে মুসলমানরাই তাদের প্রধান টার্গেট। উপজাতীয়দেরকে তারা কিনে নিয়েছে এবং ধীরে ধীরে খৃস্টান বানাচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সেভেন সিস্টার্সের বিদ্রোহের পক্ষে জনমত গঠনে সাফল্যের প্রেক্ষাপটে ক্রুসেডাররা সেভেন সিস্টার্সের মুসলমানদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলার জন্যে নতুন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। সেখানকার মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু বিভ্রান্ত-প্রতারিত লোককে দিয়ে একটি মুসলিম গেরিলা-দল গঠনের সংবাদ পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। এরা নাকি অন্য গেরিলা-দলগুলোর ন্যায় সেভেন সিস্টার্সের স্বাধীনতার জন্য লড়বে। এমন কি আসামে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার খবরও পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এভাবে ক্রুসেডাররা তাদের ঘৃণ্য লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য মুসলমানদের জানমাল ক্ষয়ের চেষ্টা চালাচ্ছে।

এটা অবধারিত যে, সেভেন সিস্টার্স ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হতে পারলে তা হবে একটি খৃস্টান রাষ্ট্র এবং বলা বাহুল্য যে, তা হবে উপমহাদেশে পাশ্চাত্যের ক্রুসেডার-শক্তিবর্গের পা রাখার জায়গা। বাংলাদেশের ঘাড়ের ওপর এ ধরনের একটি খৃস্টান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হবে এ দেশের জন্য চরম বিপর্যয়কর। দ্বিতীয়তঃ প্রকাশিত খবরাখবর অনুযায়ী, শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, গোটা বৃহত্তর চট্টগ্রামও উক্ত 'খৃস্টান রাষ্ট্র পরিকল্পনা'র অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে এ ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়া শুধু ভারতের জন্য নয়, বাংলাদেশের জন্যও অপরিহার্য। তৃতীয়তঃ সেভেন সিস্টার্স স্বাধীন হলে তার প্রথম কাজই হবে তথাকথিত বহিরাগত বা বিদেশীদের বিতাড়ন এবং তা বাংলাদেশের জন্য অর্ধ কোটি থেকে এক কোটি শরণার্থীর দুর্বহ বোঝারূপ মহাবিপদ ডেকে আনবে। তাই এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক হওয়া অপরিহার্য।

অবশ্য উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থান ও অবস্থার প্রেক্ষিতে উত্তরপূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রশ্নে বাংলাদেশের নীতি 'না সহযোগিতা, না শত্রুতা' হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

## পাদটীকা ঃ

১) جمهوری اسلامی ঃ ১৭-১-১৯৯০

২) প্রাগুক্ত ঃ ২০-১১-১৯৯১

৩) ইনকিলাব ঃ ২৪-১১-১৯৯২

৪) جمهوری اسلامی ঃ ২৭-৩-১৯৯০ ; Daily Star : 6-11-1993 ; মিল্লাত ঃ ১৬-১১-১৯৯৩

৫) Telegraph : 26-9-1993

৬) جمهوری اسلامی ঃ ২৩-১-১৯৯১

৭) অত্র লেখকের রচিত অপ্রকাশিত ইতিহাসগ্রন্থ 'ফিলিস্তিনের ইতিহাস'-এ দেশটির শুরু থেকে সর্বশেষ ইতিহাস পর্যন্ত তুলে ধরা হয়েছে।

৮) Reuters/BSS (আহ্‌মদ জিবরীলের উক্তি) ঃ ১৪-৯-১৯৯৩

৯) New Nation : 4-8-1993

১০) New Nation : 16-4-1993. এটা ১৯৯২ সালের অবস্থা। সার্বদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার ফলে এখন মুসলমানরা আনুমানিক শতকরা ৪৩ ভাগের মত।

১১) New Nation : 4-8-1993

১২) New Nation : 16-4-1993

১৩) প্রাগুক্ত

১৪) AP/UNB : 14-12-1995

১৫) প্রাগুক্ত

১৬) Telegraph : 30-9-1993

১৭) Time : 5-3-1993

১৮) মিল্লাত ঃ ২৬-১০-১৯৯৩

১৯) جمهوری اسلامی ঃ ৩০-১১-১৯৯১

২০) প্রাগুক্ত

২১) প্রাগুক্ত

২২) جمهوری اسلامی ঃ ১৯-১-১৯৯১

২৩) এএফপি/ইনকিলাব ঃ ৫-১০-১৯৯২

২৪) Morning Sun : 30-8-1993

২৫) Morning Sun : 31-7-1993

২৬) Reuters/Kayhan International : 13-10-1997

২৭) মিল্লাত ঃ ১০-৯-১৯৯৩

২৮) ইনকিলাব ঃ ৫-১০-১৯৯২

২৯) گیتاشناسی کشورها

৩০) প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

৩১) ইনকিলাব ঃ ২২-১-১৯৯৩

৩২) ইনকিলাব ঃ ৯-৯-১৯৯২

৩৩) Telegraph : 8-9-1993

৩৪) এপি/ইনকিলাব ঃ ৩১-১-১৯৯৩

৩৫) আলমুজাদ্দেদ ঃ ১-১১-১৯৯৭

৩৬) Crescent International : 16—31 March, 1997

৩৭) گیتاشناسی کشورها

৩৮) ইনকিলাব ঃ ২৯-৮-১৯৯২

৩৯) Daily Star : 21-10-1992

৪০) মিল্লাত ঃ ১৪-১২-১৯৯২

৪১) ইনকিলাব ঃ ১৪-১-১৯৯৩

৪২) মিল্লাত ঃ ৩-১০-১৯৯৩

৪৩) মিল্লাত ঃ ১৪-১২-১৯৯৩

৪৪) ইনকিলাব ঃ ১১-৩-১৯৯৫

৪৫) ইনকিলাব ঃ ১০-৮-১৯৯২, ২৭-৮-১৯৯২, ৮-৯-১৯৯২, ১৪-৯-১৯৯২ ও ২৪-৯-১৯৯২-এ বিস্তারিত তথ্য দ্রষ্টব্য।

৪৬) New Nation : 3-2-1993

৪৭) মতান্তরে ভারতে খৃস্টানদের সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগ। (Tehran Times : 30-3-1992) সে হিসেবে শতাব্দীর শেষে তাদের সংখ্যা পাঁচ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

৪৮) Telegraph : 31-10-1993

৪৯) সানডে/ইনকিলাব ঃ ১৮-৫-১৯৯২

৫০) এ সম্বন্ধে প্রচুর প্রামাণ্য তথ্য রয়েছে। এসব তথ্য উল্লেখসহ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার দাবীদার।

৫১) জনকণ্ঠ ঃ ১৩-৬-১৯৯৯

৫২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপপরাষ্ট্রমন্ত্রী স্ট্রোব্ ট্যাল্‌বোট্ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র কসোভোর জন্য স্বাধীনতার সমর্থন করে না। (Reuters/New Nation : 26-8-1999)

৫৩) এএফপি/ইনকিলাব ঃ ৩-৮-১৯৯৯

৫৪) New Nation : 25-4-1997

৫৫) ইত্তেফাক ঃ ১০-৭-১৯৯৯

৫৬) এএফপি/ইনকিলাব ঃ ১১-৭-১৯৯৮

৫৭) اقلیتهای مسلمان درجهان امروز ঃ পৃঃ ১৪৫

৫৮) সাপ্তাহিক কলম, কলিকাতা ঃ ১৪-১১-১৯৯৩

৫৯) প্রাগুক্ত

৬০) বিবিসি/ইত্তেফাক ঃ ১৪-২-১৯৯৮

৬১) কলম ঃ ১৪-৮-১৯৯৮

৬২) কলম ঃ ২৬-১২-১৯৯৮

www.pathagar.com

# বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘু

বিশ্বের বুকে এমন কোন দেশ নেই যেখানে মুসলমানের বাস নেই। মুসলমান যেখানে সংখ্যাগুরু নয়, সেখানে সংখ্যালঘু হলেও আছে। বেশীর ভাগ দেশেই মুসলমানরা প্রথম বা দ্বিতীয় সংখ্যালঘু। বিশেষ করে অমুসলিমদের ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ এবং মুসলমানদের উচ্চতর জন্মহারের কারণে অমুসলিম-প্রধান দেশসমূহে মুসলমানদের সংখ্যাশক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে অভিবাসন ও নাগরিকত্ব গ্রহণও ঐসব দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

বর্তমান বিশ্বে সংখ্যালঘু মুসলমানের সংখ্যা কত তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কারণ অনেক দেশের সরকারই এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে আগ্রহী নয়। কোন কোন সরকার মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখানোকেই নিজেদের জন্যে কল্যাণকর মনে করে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু মুসলমানরা ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে বলে মনে করারও কারণ রয়েছে। তবে মোটামুটি বলা চলে যে, বর্তমান বিশ্বে সংখ্যালঘু মুসলমানের সংখ্যা ৪৫ কোটি থেকে ৫২ কোটির মধ্যে।

## ভারত

বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাস ভারতে। এ দেশে বর্তমানে প্রায় ২৬ কোটি মুসলমানের বাস।[১] সে হিসেবে ভারতীয় মুসলমানরা শুধু বিশ্বের বৃহত্তম সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীই নয়, বরং সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু নির্বিশেষে বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী। কারণ তাদের সংখ্যা জনসংখ্যার বিচারে বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম জনসংখ্যার চেয়েও বেশী।

ভারতের মুসলমানরা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে আছে। তবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে তারা সংখ্যাগুরু এবং কেরালা, আসাম ও পশ্চিম বঙ্গে তারা সংখ্যাগুরু না হলেও তাদের সংখ্যাশক্তি খুবই উল্লেখযোগ্য (বর্তমানে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ)।

ভারতের মুসলিম জনগণ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের চাপের সম্মুখীন হয়ে আছে। ১৯৪৭-এ উপমহাদেশ বিভক্ত হবার পর অসংখ্য মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বহু কবরস্থানের জায়গা ও ঈগদাহ্ বেদখল হয়ে আছে। পশ্চিম বঙ্গে মাইকে আজান দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশে মহররমের মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ভারতে মুসলিম পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ঃ কলিকাতা হাইকোর্ট তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম নারীকে তার পুনর্বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পূর্বস্বামীর পক্ষ থেকে ভরণপোষণ প্রদান বাধ্যতামূলক করে রায় দেয়া হয়েছে। এছাড়া তথাকথিত শুদ্ধি-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জোর করে মুসলমানকে হিন্দু বানানোর ঘটনাও ঘটছে।

www.pathagar.com

লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানরা তাদের সংখ্যাশক্তি অনুপাতে সংখ্যাগুরুদের তুলনায় খুবই পশ্চাদপদ। রাজ্যসভা, লোকসভা ও বিধানসভাগুলোতে এবং স্থানীয় সরকার সমূহেও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব তাদের জনসংখ্যার তুলনায় খুবই কম।

বিরাট সংখ্যাশক্তি নিয়েও মুসলমানরা যে ভারতের বুকে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত সে জন্যে বর্ণহিন্দুদের মুসলিম-বিদ্বেষ যতখানি দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী মুসলমানদের অচেতনতা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অদূরদর্শিতা ও ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাব।

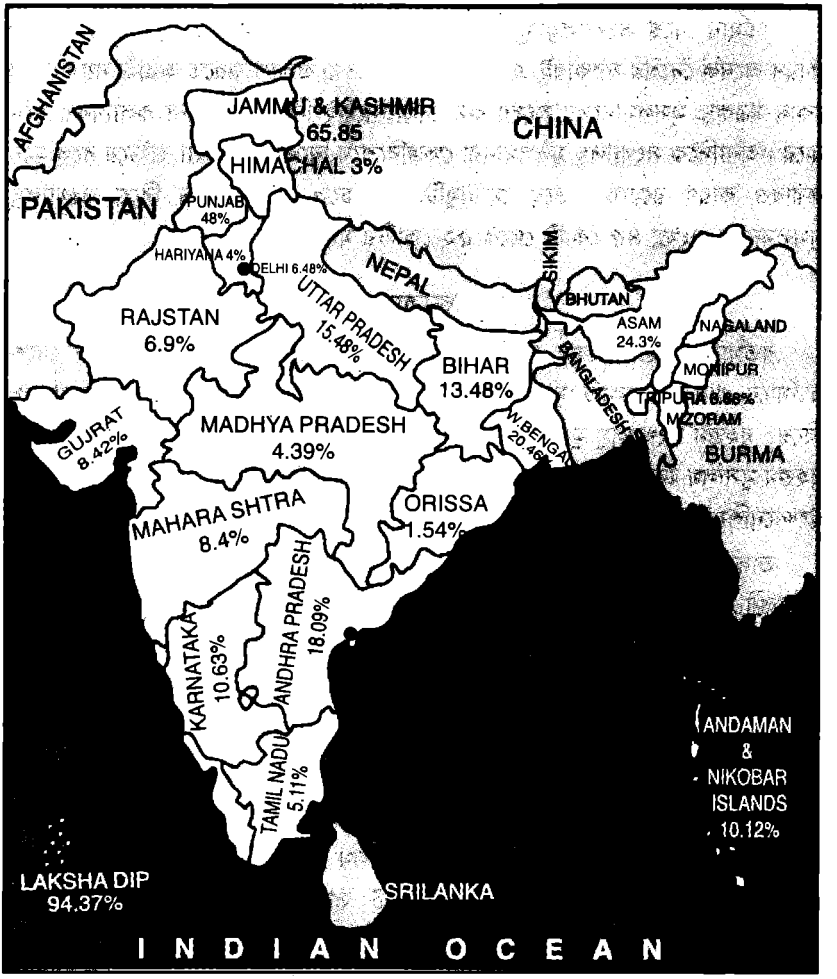


*ভারত সরকারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৭১ সালের আদমশুমারীর ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যায় মুসলমানদের শতকরা হার। (তথ্যসূত্র : اقلیتهای مسلمان درجهان امروز — পৃঃ ১৪৫-১৪৬)*

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় বর্তমান ভারতের দু'একটি এলাকা বাদে বাকী এলাকাগুলোর পাকিস্তানভুক্ত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐসব এলাকার মুসলমানরা সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানায়। ফলে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন হবার পর স্বাধীন ভারতে মুসলমানরা পাকিস্তানের সমর্থক পঞ্চম বাহিনী হিসাবে গণ্য হতে থাকে যার পরিণামে তাদেরকে অবর্ণনীয় জুলুম-অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়।

এছাড়া দ্বীনী ইল্‌মের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অনুপস্থিতি এবং মাযহাবী সংকীর্ণতার কারণে তারা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যুগজিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারছে না। ফলে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা সেখানে আশানুরূপ নয়। ভারতের পঁচিশ কোটি হরিজনের মধ্যে ইসলাম প্রসারের বিরাট ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিরোধ এবং সামগ্রিকভাবে তাদের শক্তিহীনতা হরিজনদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করছে। তবু কিছু কিছু হরিজন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক ইসলাম গ্রহণ করছে।

ভারতের মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও সংকীর্ণ মতপার্থক্য এতই প্রকট যে, ক্ষেত্রবিশেষে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে দাঙ্গার মত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাও সংঘটিত হচ্ছে।

রাজনৈতিক অঙ্গনেও ভারতীয় মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে পারছে না। পাকিস্তান সৃষ্টিকারী সেক্যুলার দল মুসলিম লীগের প্রতি দ্বীনদার লোকেরা যেমন আকৃষ্ট হচ্ছে না, তেমনি সেক্যুলারিজম দ্বারা প্রভাবিত লোকেরাও একে বাস্তবতার দৃষ্টিতে সঠিক মনে করতে পারছে না। ফলে ভারতে মুসলমানদের একটা বিরাট অংশের, যেমন ঃ তাবলীগ জামাআত ও বিভিন্ন পীরের মুরীদগণের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনুপস্থিতির পাশাপাশি রাজনীতিতে আগ্রহী লোকেরা জামাআতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, জনতা দল ও কম্যুনিস্ট পার্টিতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এমন কি বিস্ময়কর হলেও সত্য, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র ন্যায় চরম মুসলিম-বিদ্বেষী দলেও কিছু মুসলিম নামধারী লোক রয়েছে।

অন্যদিকে কারণে-অকারণে সেখানে মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গা হচ্ছে। গরু কোরবানীর ন্যায় বাহুল্য কাজের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানরাই দাঙ্গার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে থাকে যদিও ছাগল, ভেড়া, দুম্বা বা উট কোরবানী করে বিসম্বাদ এড়াতে পারে। যাদের মধ্যে দ্বীনের প্রচার-প্রসার উদ্দেশ্য তাদেরকে উত্যক্ত না করে তাদের সাথে সহনশীলতার সাথে আচরণ করা উচিত—এ শিক্ষা তাদের দেয়া হয় নি।

প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ভারতীয় মুসলমানদের কোনরূপ দিকনির্দেশনা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে এ দুই দেশের ইসলামপন্থীরা ভারত-

www.pathagar.com

বিরোধিতা ও ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতি নৈতিক সমর্থন দানে প্রয়োজনের চেয়েও বেশী অগ্রসর বিধায় তাদের ভারতে যাতায়াত নেই বললেই চলে। ফলে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে পথনির্দেশ পাচ্ছে না।

অন্যদিকে ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগুরু রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলমানরা যেখানে ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে আশা-ভরসার স্থল হতে পারত ও তাদেরকে নেতৃত্ব দিতে পারত তার পবিবর্তে তারা স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে। এর ফলে ভারতের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদেরকে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।[২]

ভারতের মুসলমানদের জন্যে পারস্পরিক সংকীর্ণ মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে এবং অমুসলিমদের উস্কানির মুখেও ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় দান, বিভিন্ন মাযহাব ও ফের্কার অস্তিত্ব বজায় রেখেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সর্বক্ষেত্রে ন্যায়ের সমর্থন করা এবং সর্বোপরি দ্বীনী ইল্‌মের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ধারা উন্মুক্ত করে স্থবিরতা কাটানোই হচ্ছে মুক্তি ও অগ্রগতির পথ।

## চীন

বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী হচ্ছে চীনের মুসলিম জনগণ। কিন্তু তাদের সংখ্যাশক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। চীনের মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রের দাবীর মধ্যে ১ঃ১০ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সরকারী সূত্রে চীনের মুসলিম জনসংখ্যা দেড় কোটি বলে উল্লেখ করা হয় যা একেবারেই অবাস্তব। অন্যদিকে কোন কোন সূত্রে তাদের সংখ্যা কয়েক বছর আগে সাড়ে চৌদ্দ কোটি বলে দাবী করা হয় যা সত্য হলে শতাব্দী শেষে তাদের সংখ্যাশক্তি পনর কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

চীনে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হবার পূর্বে সে দেশের কান্‌সু ও ক্যান্টন প্রদেশে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিল। ঐ সময় চীনের বর্তমান পশ্চিম-উত্তর প্রান্তের প্রদেশ জিংজিয়াং (পূর্বতন উচ্চারণ 'সিনকিয়াং') ছিল একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশটির নাম ছিল পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র। কম্যুনিস্ট রাশিয়ায় অধ্যয়নকারী কমরেড সাইফুদ্দীন দেশে ফিরে এসে রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করেন এবং শীঘ্রই দেশের প্রেসিডেন্ট পদ দখল করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে সিনকিয়াংকে চীনের সাথে সংযুক্ত করেন। এরপর সেখানে এবং চীনের অন্যান্য এলাকায় মুসলমান ও কমিউনিস্টদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। ফলে লাখ লাখ মুসলমান নিহত হয় বা দেশ ত্যাগ করে।[৩]

www.pathagar.com

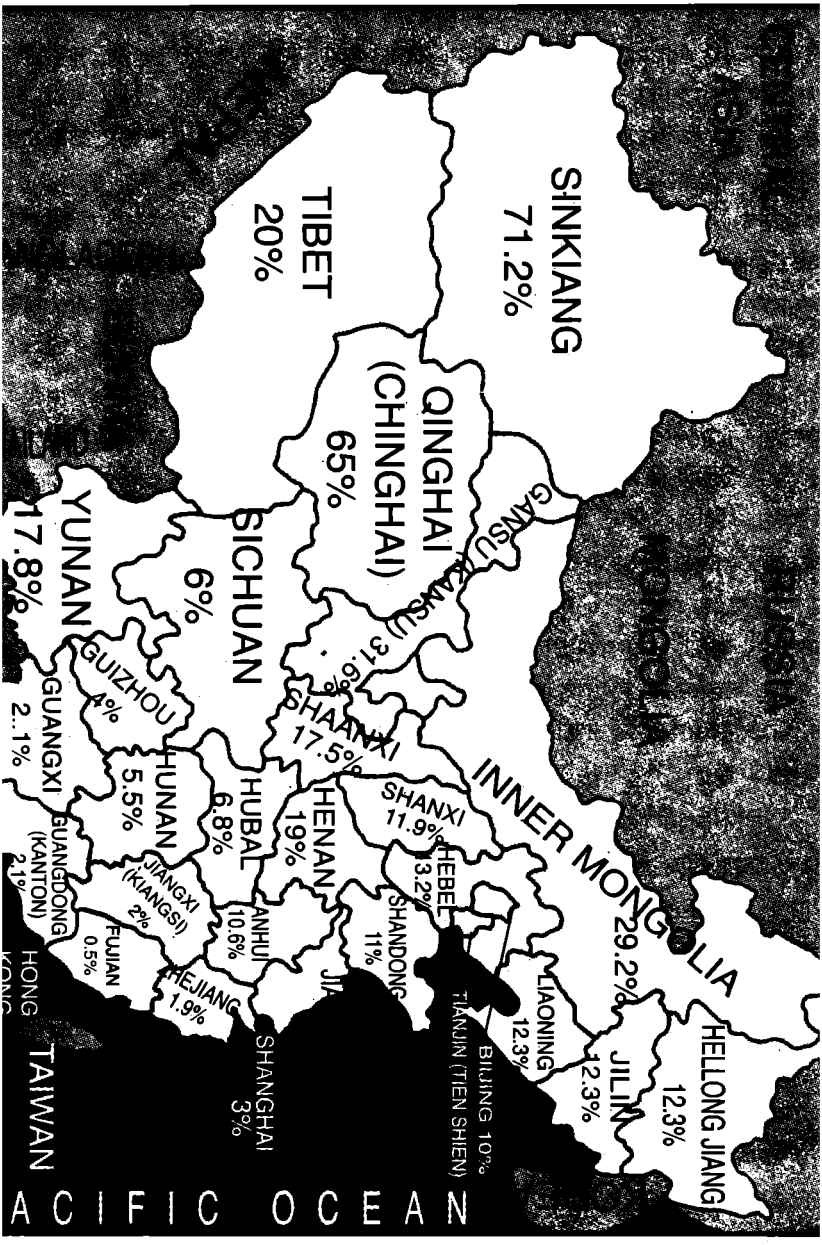


*১৯৬৮ সালে চীনের বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যায় প্রাক্কলিত মুসলমানদের শতকরা হার।*

www.pathagar.com

কম্যুনিস্ট চীনের ঘটনাবলী ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে বাইরে থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়েছে যে, কম্যুনিস্ট দখলকালে সিনকিয়াং ও চীনে মুসলমানের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি, কিন্তু হত্যা ও দেশত্যাগের ফলে এ সংখ্যা এক কোটিতে নেমে যায়। সম্ভবতঃ এর ভিত্তিতেই চার দশকের ব্যবধানে সেখানে মুসলমানের সংখ্যা দুই কোটি বলে মনে করা হয়। তবে কম্যুনিস্ট বিপ্লবকালে সেখানে ৪ কোটি মুসলমানের হত্যা ও দেশত্যাগের তথ্যটি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। বিশেষ করে, যেহেতু সিনকিয়াং ছাড়া অন্য কোথাও মুসলমানরা রাষ্ট্রক্ষতায় ছিল না সেহেতু তারা কম্যুনিস্টদের প্রথম প্রতিপক্ষ ছিল না। তাই তাদের ওপর এ ধরনের পাইকারী হত্যা-অভিযান সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়।

সিনকিয়াং-এও স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাইফুদ্দীন ছিলেন কম্যুনিস্ট যিনি দেশকে চীনভুক্ত করেন; নিঃসন্দেহে তাঁরও বিরাট জনসমর্থন ছিল। চীনের অন্যান্য এলাকায় কম্যুনিস্টদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জাতীয়তাবাদীরা। যদিও মুসলমানদের সচেতন অংশটি তাদের সমর্থন করেছিল, কিন্তু মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ ছিল রাজনৈতিক ব্যাপারে অসচেতন। তাই তাদের নিহত হওয়া বা দেশত্যাগের কারণ ছিল না। তাছাড়া মুসলমানদের একাংশ যে কম্যুনিস্টদের সমর্থক ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। এমতাবস্থায় ঐ সময় হত্যা ও দেশত্যাগের ফলে এক কোটি মুসলমান হ্রাস পেয়েছিল বলে ধরে নিলেও চার কোটি অবশিষ্ট ছিল সন্দেহ নেই। ফলে অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে তাদের সংখ্যা পনর কোটিতে দাঁড়ানো অসম্ভব নয়; অন্ততঃ দশ কোটির নীচে হবার কোনই কারণ নেই।

কোন কোন সূত্রমতে সিনকিয়াং-এর পার্শ্ববর্তী কানসু প্রদেশও মুসলিম সংখ্যাগুরু ছিল, পরে বৌদ্ধ ও কম্যুনিস্ট চীনারা এসে বসতি স্থাপন করায় তারা সংখ্যালঘু হয়ে যায়।[৪] ১৯৯২ সালে সিনকিয়াং-এর জনসংখ্যা ছিল এক কোটি ৬০ লাখ। এদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ চীনা এবং ৬২ ভাগ অর্থাৎ এক কোটি ছিল মুসলমান।[৫] মুসলমানরা বংশগতভাবে কাজ্জাক, উজবেক ও উইগুর। উইগুররা স্থানীয় বংশোদ্ভুত। চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত সিনকিয়াং-এর দক্ষিণে তিব্বত ও কিংগাই প্রদেশ, পূর্বে কিংগাই ও কানসু প্রদেশ এবং মঙ্গোলিয়া, উত্তর ও পশ্চিমে কাজ্জাকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান ও কাশ্মীর। সিনকিয়াং-এ দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন গোপন মুসলিম গেরিলা দল মুক্তিযুদ্ধ চালাচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত খবর পাওয়া যায় না। তবে, মাঝে মাঝে সংঘর্ষের খবর আসে।[৬]

সিনকিয়াং-এর পার্শ্ববর্তী কিংগাই প্রদেশেও বিপুল সংখ্যক মুসলমান বসবাস করছে। ১৯৯৩ সালে বিশ্ববাসী কিংগাই প্রদেশের, বিশেষ করে প্রাদেশিক রাজধানী জিনিং-এর মুসলমানদের অস্তিত্ব গভীরভাবে অনুভব করে। কারণ ঐ বছর ইসলামের

www.pathagar.com

প্রতি অবমাননাকর একটি বই-এর বিরুদ্ধে কিংগাই প্রদেশে লাখ লাখ মুসলমান প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সিনকিয়াং-এর বাইরে এ ধরনের মুসলিম বিক্ষোভ ছিল নযীরবিহীন।

বর্তমানে চীনের কিংগাই প্রদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ মুসলমান।[৭] এছাড়া নিংজিয়া ও সিচুয়ান প্রদেশেও অনেক মুসলমান রয়েছে।[৮]

কম্যুনিস্ট বিপ্লবের সময় চীনে বিপুল সংখ্যক মুসলমান নিহত হয় এবং ঐ সময় থেকে অসংখ্য মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়া হয় বা তা অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত চীনে যে তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয় তখনও মুসলমানদের ওপর নিষ্পেষণ চলে এবং বহু মুসলমানকে হত্যা করা হয়। তবে ১৯৭৮ সাল থেকে মাও-পরবর্তী নেতা দেং জিয়াও পিং-এর শাসনামলে অনেকটা ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়। তখন মসজিদসমূহ খুলে দেয়া হয় ও মুসলমানদের সীমিত সংখ্যককে হলেও প্রতি বছর হজে যাবার সুযোগ দেয়া হয়। এর ফলে সেখানে মুসলমানদের মধ্যে যে জাগরণ আসে তাতে ও সিনকিয়াং-এর মুক্তিযুদ্ধে আতঙ্কিত হয়ে ১৯৯৩ সাল থেকে সরকার ধর্মের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি বৃদ্ধি করেছে। এ সত্ত্বেও সেখানে দিনের পর দিন মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ ও দ্বীনী চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অন্যদিকে সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ওহাবী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ও ঐতিহ্যিক সূফী চিন্তাধারার সাথে তার সংঘাতের ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ-অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে।[৯]

## রাশিয়া

কম্যুনিস্ট শাসনের অবসান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর রুশ ফেডারেশনে মুসলমানদের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কত তা নিশ্চিত করে বলার মত প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে ১৯৯৫-এ পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময় সেখানকার কোন কোন মুসলিম নেতা রাশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা দুই কোটি বলে উল্লেখ করেন। এটা নিঃসন্দেহে ন্যূনতম সংখ্যা। প্রকৃত সংখ্যা বেশী হবারই সম্ভাবনা। কোন কোন সূত্রে তিন কোটিও উল্লেখ করা হয়েছে।

রুশ ফেডারেশনের সর্বত্রই মুসলমানরা ছড়িয়ে রয়েছে। তবে কাফকায (ককেসাস) পার্বত্য এলাকা এবং ভল্গা নদীর তীরেই বেশীর ভাগ মুসলমানের বাস।

কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মাঝামাঝি কাফ্কায্ পার্বত্য এলাকার উত্তর অংশে জর্জিয়া-সীমান্তে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী চেচনিয়া ছাড়াও রয়েছে কাবারতাহ্ বালকার (বা কাবার্দিনো বাল্কারিয়া) প্রজতান্ত্র, যা ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করে। এছাড়া রয়েছে আদিগাহ্ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, উত্তর উসেতিয়া স্বায়ত্তশাসিত

www.pathagar.com

অঞ্চল, কারাচাই-চার্‌কেশ্‌ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং কাস্পিয়ান সাগরের তীর ঘেঁষে দাগেস্তান প্রজাতন্ত্র।[১০] চেচেন-ইঙ্গুশত্‌ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া ইঙ্গুশ্‌তিয়ার কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

*সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন*

কাফকায এলাকার প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চলগুলোর সব ক'টিই বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার। কিন্তু রাশিয়া তা দিতে রাজী নয়। সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা ঘোষণাকারী চেচনিয়া চাচ্ছে এ প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চলগুলো স্বাধীন হোক। সেই সাথে তারা বহির্কাফকায এলাকার প্রজাতন্ত্রগুলো (আযারবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও জর্জিয়া থেকে সদ্য স্বাধীন আবখাযিয়া) সহ একটি কাফকায (কাকেসাস) কনফেডারেশন গঠন করতে চাচ্ছে। এ কারণে আবখাযিয়ার স্বাধীনতাযুদ্ধে চেচনিয়া সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করেছিল। ১৯৯৯-এর আগস্টে দাগেস্তানে যে সংক্ষিপ্ত স্বাধীনতাযুদ্ধ হয়েছিল তাতে চেচেনরাই অংশ নিয়েছিল।

ইঙ্গুশতিয়ার জনসংখ্যা আনুমানিক ৪ লাখ ৪২ হাজার। কারাচাই ও বালকারদের জনসংখ্যা ১৯৭০ সালে ছিল যথাক্রমে ১ লাখ ৩১ হাজার এবং ৬৬ হাজার।[১১] বর্তমানে এদের সংখ্যা যথাক্রমে ২ লাখ ও ১ লাখের মত।

**দাগেস্তান ঃ** ৫০ হাজার ৩০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট জাতিগত মুসলিম প্রজাতন্ত্র দাগেস্তানের জনসংখ্যা বর্তমানে বিশ লাখের ওপরে। রাজধানী মাখাচ্‌কালা।

কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দাগেস্তান প্রজাতন্ত্রের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী অতীত রয়েছে। ইমাম শামিল (রঃ)-এর নেতৃত্বে জার-শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের ইতিহাস রূপকথার মত রোমাঞ্চকর। বর্তমানেও দাগেস্তানীদের একাংশ স্বাধীনতার দাবীতে সশস্ত্র গেরিলা তৎপরতা চালাচ্ছে। ১৯৯৯-র আগস্টে সেখানে চেচনিয়া থেকে আগত একদল ইসলামী যোদ্ধা কয়েকটি পার্বত্য গ্রাম দখল করে স্বাধীন দাগেস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র

*কাফকায অঞ্চলে মুসলিম জাতিগত প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহের অবস্থান*

www.pathagar.com

ঘোষণা করে এবং রুশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। চেচনিয়ার মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীরনায়ক শামিল বাসায়েভ দাগেস্তানের স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

তারা ১৮ দিন ঐ গ্রামগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় এবং রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলে বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুশ বাহিনী তাদেরকে চেচনিয়ায় বিতাড়িত করে।

**তাতারিস্তান ঃ** রুশ ফেডারেশনের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে ভল্গা নদী ও উরাল পর্বত এলাকায় অবস্থিত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম জাতিগত প্রজাতন্ত্র হচ্ছে তাতারিস্তান ও

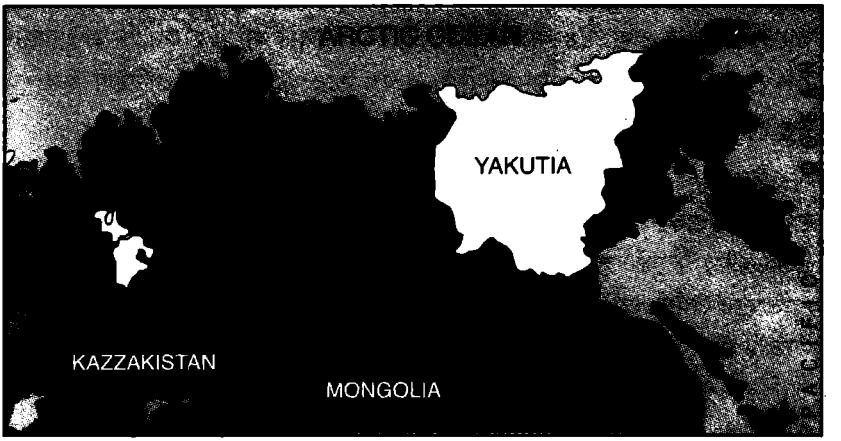


*রাশিয়ার অভ্যন্তরে তাতারিস্তান, বাশকিরিয়া (বাশকোরোস্তান) ও ইয়াকুতিয়ার অবস্থান*

বাশকোরোস্তান (বা বাশ্‌কিরিয়া)। মস্কো থেকে দক্ষিণ-পূর্বে পাশাপাশি অবস্থিত এ দু'টি প্রজাতন্ত্র। এর মধ্যে তাতারিস্তান একটি তেলসমৃদ্ধ প্রজাতন্ত্র। আয়তন ৬৮,০০০ বর্গকিলোমিটার। এখানে বছরে ৩ কোটি ৪০ লাখ টন তেল উত্তোলন করা হয় যা গোটা রাশিয়ার তেলচাহিদা পূরণ করে।[১২] প্রজাতন্ত্রটির বর্তমান জনসংখ্যা আনুমানিক ৫৬ লাখ।[১৩]

অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী তাতারিস্তান ১৯৯১-র ২৪শে জুন স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরে ১৯৯২-র মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে এক গণভোটে তা অনুমোদিত হয়। ২৬ লাখ ভোটারের মধ্যে শতকরা ৮২ জন ভোট প্রদান করে এবং স্বাধীনতার পক্ষে শতকরা ৬২ ভাগ ও বিপক্ষে ৩৭ ভাগ ভোট পড়ে।[১৪]

তাতারিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫২ জন তাতার মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫] তবে ভোটের ফলাফল থেকে তাদের সংখ্যাকে বেশী বলে মনে হয়। কারণ, রুশরা স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয় নি। অবশ্য বাশকির মুসলমানরাও স্বাধীনতার পক্ষে

www.pathagar.com

ভোট দিয়েছে। মোদ্দা কথা, প্রজাতন্ত্রটির শতকরা ৬০ ভাগ লোক মুসলমান বলে অনুমান করা চলে।

একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে তাতারিস্তান সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে রাশিয়ার সাথে ফেডারেশন-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু তৎকালীন রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন এ চুক্তি ভুলে গিয়ে সকল প্রজাতন্ত্রকে পদানত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়ার পর যে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন (এবং পরে গণভোটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটারের সমর্থন না পাওয়া সত্ত্বেও জনগণের ওপর চাপিয়ে দেন) তাতে জাতিগত প্রজাতন্ত্রগুলোর সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেয়া হয়। এ কারণে তাতারিস্তান রুশ ফেডারেশনকে দেয় ফেডারেশন–ট্যাক্স বন্ধ করে দিয়েছিল যার পরিমাণ ছিল শত শত কোটি রুবল।[১৬] ফলে সশস্ত্র সংঘাতের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।[১৭]

অবশ্য একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার। তা হচ্ছে, তাতারিস্তানের অবস্থান রুশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে হওয়ায় এবং অন্য কোন দেশের সাথে তার সীমান্ত না থাকায় প্রজাতন্ত্রটির পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা বাস্তবায়ন এবং রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক ব্যতিরেকে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখা পুরোপুরি অসম্ভব ব্যাপার। এ কারণে শেষ পর্যন্ত তাতারিস্তান সরকার এ ব্যাপারে আর বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। অন্যদিকে সাংবিধানিকভাবে জাতিগত প্রজাতন্ত্রগুলোর সার্বভৌমত্ব বাতিল হয়ে গেলেও রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষাপটে মস্কো-সরকার তাতারিস্তানের তেলসহ সকল শিল্পে প্রজাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের ওপর হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে। ফলে বাস্তব কারণেই তাতারিস্তান মস্কোর কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব ও সম্মান লাভ করছে। এমন কি তাতারিস্তান সরকার সেখানকার শিল্প-কারখানায় সরাসরি বৈদেশিক পুঁজি গ্রহণেরও সুযোগ ভোগ করছে।

**বাশকিরিয়া ঃ** বাশকিরিয়া বা বাশকোরোস্তান এবং তাতারিস্তান পাশাপাশি অবস্থিত। তবে বাশকিরিয়া আয়তনের দিক থেকে তাতারিস্তানের তুলনায় বেশ বড়। বাশকিরিয়ার আয়তন ১ লাখ ৪৩ হাজার বর্গকিলোমিটার। কিন্তু উভয় প্রজাতন্ত্রের জনসংখ্যা প্রায় সমান।

বাশকিরিয়া প্রজাতন্ত্র ১৯২০ সালের ২৭শে মে গঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে এ প্রজাতন্ত্রের জনসংখ্যা ছিল ৩৪ লাখ ২৪ হাজার। এর মধ্যে ১৫ লাখ ৪৮ হাজার ছিল রুশ (শতকরা ৪৫ দশমিক ২ ভাগ) এবং ১৮ লাখ ৭৬ হাজার (শতকরা ৫৪ দশমিক ৮ ভাগ) ছিল মুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে বাশকিরদের সংখ্যা ছিল ৯ লাখ ৩৬ হাজার এবং তাতারদের সংখ্যা ছিল ৯ লাখ ৪০ হাজার।[১৮] পরবর্তী ২০ বছরে কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি হিসাব করলে শতাব্দীশেষে প্রজাতন্ত্রটির মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে

www.pathagar.com

৫১ লাখের উর্দ্ধে। আর মুসলিম-প্রধান এলাকাসমূহে সব সময়ই মুসলিম জনসংখ্যার হার রুশ খৃস্টানদের অনুপাতে বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আনুমানিক প্রজাতন্ত্রটির বর্তমান জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমান হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাশকিরিয়াও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি প্রজাতন্ত্র এবং নিজ সম্পদের ওপর স্বীয় নিয়ন্ত্রণ তথা পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন দাবী করছে।[১৯]

**চুভাস ঃ** রুশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরস্থ আরেকটি মুসলিম জাতিগত প্রজাতন্ত্র হচ্ছে চুভাস। প্রজাতন্ত্রটির আয়তন ১৮ হাজার ৩০০ বর্গকিলোমিটার। তবে জনসংখ্যা মাত্র ২০ লাখ। শতকরা ৬৮ ভাগ মুসলমান।[২০] চুভাসও স্বাধীনতার দাবীদার।[২১] তবে এ নিয়ে কোন সংঘাতে যায় নি। রুশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে হওয়ায় ও বাইরের কোন দেশের সাথে সীমান্ত না থাকায় চুভাসবাসীরা মোটামুটি রাশিয়াভুক্তিকে মেনে নিয়েছে।

**ইয়াকুতিয়া ঃ** রাশিয়ার সাইবেরীয় এলাকার বিশালায়তন জাতিগত প্রজাতন্ত্র ইয়াকুৎস্ক বা ইয়াকুতিয়া একটি মুসলিম অধ্যুষিত প্রজাতন্ত্র। ইয়াকুতিয়ার আয়তন আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশের তিন গুণ। কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র ১০ লাখ।[২২] এদের মধ্যে ইয়াকুতী বংশোদ্ভুত মুসলমানদের সংখ্যা ৪ লাখ। ইয়াকুতিয়া স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার।[২৩] তবে এ নিয়ে কোন বড় ধরনের আন্দোলনের কথা জানা যায় না।[২৪]

এছাড়া রাশিয়ার আরো কয়েকটি মুসলিম জাতিগত প্রজাতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত এলাকা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ মার্দু, উদমুত্ ও মারী। উদমুতের আয়তন ৪২ হাজার ১০০ বর্গকিলোমিটার। ১৯৭৯ সালে-এর জনসংখ্যা ছিল ১৪ লাখ ৯০ হাজার। মার্দু-র আয়তন ২৫ হাজার ২০০ বর্গ কিলোমিটার, ১৯৭৯ সালে জনসংখ্যা ছিল ৯ লাখ ৯৫ হাজার। মারীর আয়তন ২৩ হাজার ৮০০ বর্গকিলোমিটার; ১৯৭৯ সালে জনসংখ্যা ছিল ৭ লাখ ৩ হাজার।[২৪]

## বার্মা

বিশ্বের অন্যতম বৃহত সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী হচ্ছে বার্মা (বর্তমান মায়ানমার)-এর মুসলমানরা।

বর্তমান বার্মার আরাকানে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সমসময়ে অর্থাত হযরত ওসমান (রাঃ)-র খেলাফতকালে বা তার পূর্বে ইসলামের প্রথম আগমন ঘটে।[২৫] পরে বহিরাগত মুসলমানদের বসতি স্থাপন ও স্থানীয় লোকদের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

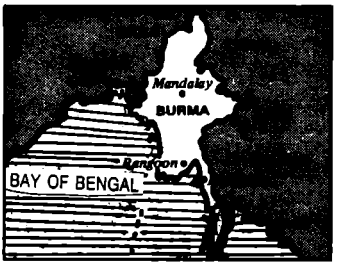


২০০০ খৃস্টাব্দের শেষে বার্মার মুসলিম জনসংখ্যা ৯৬ লাখ অতিক্রম করবে। বার্মার মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ হচ্ছে

www.pathagar.com

'রোহিঙ্গা' নামে পরিচিত আরাকানী মুসলমান। বাকী ৬৫ শতাংশ বার্মার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাস করছে। আরাকানীদের মধ্যে দেশ থেকে বিতাড়িত বা হিজরতকারীগণ ও তাদের বংশধরদের সংখ্যা আনুমানিক সাড়ে ১৮ লাখে এবং আরাকানে বসবাসরতদের সংখ্যা সাড়ে ১৬ লাখে দাঁড়াবে। আরাকান প্রদেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ হলেও বহিষ্কৃত ও হিজরতকারীদের বাদে বর্তমানে আরাকানে মুসলমানরা শতকরা ৫০ ভাগের বেশী নয়।

বার্মা সরকার আরাকানে মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার লক্ষ্যে সেখানকার জনগণের ওপর বার বার জুলুম-অত্যাচার চালিয়েছে। এ অত্যাচারের ফলে সেখানকার মুসলমানরা বহু বার বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৯১ সালে আগত ২ লাখ ৬৫ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানের মধ্যে ১৯৯৯-র মাঝামাঝি নাগাদও ২১ হাজারের উর্ধ্বে বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে ছিল। এছাড়া আরো প্রায় দেড় লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশী জনগণের সাথে মিশে এদেশে বসবাস করছে।[২৬]

বার্মা একট দুর্গম দেশ। রাজনৈতিকভাবেও রুদ্ধদ্বার দেশ। এছাড়া বিভিন্ন উপজাতি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী দেশ হওয়ায় এবং অভিন্ন সাধারণ ভাষার অভাবে এদের পারস্পরিক ও বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ খুবই কম। ফলে বার্মার অ-আরাকানী মুসলমানদের সম্বন্ধে খুব কমই জানা সম্ভব। তবে আরাকানী মুসলমানরা আরাকানের স্বাধীনতার জন্যে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। (এ সম্বন্ধে পরে অপেকক্ষাকৃত বিস্তারিত আলাচনা করা হয়েছে।)

## ফিলিপাইন

ফিলিপাইনে খৃস্টধর্ম প্রবেশের দু'শ' বছর পূর্বে সেখানে ইসলাম প্রবেশ করে এবং খুব দ্রুত এ দেশটি মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশে পরিণত হয়। সমগ্র ফিলিপাইনে ম্যানিলা, সুলু ও মাগুইন্দানাও নামে তিনটি মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে স্পেনীয় ক্রুসেডাররা স্বদেশে মুসলিম নির্মূলকরণের কাজ সমাপ্ত করার তিন দশক পরে ১৫২১ সালে ফিলিপাইনকে দখল করে নেয়। এরপর তারা জবরদস্তি করে ফিলিপাইনের জনগণকে ব্যাপকভাবে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করে।

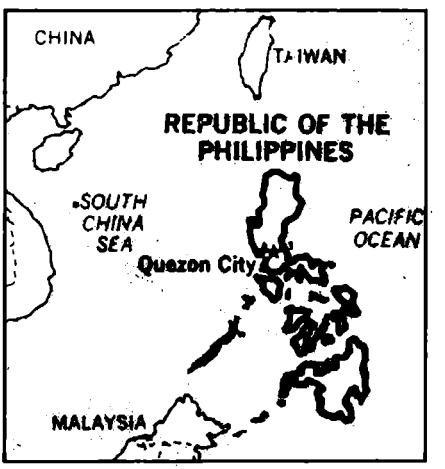


www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকা ফিলিপাইন দখল করে নেয় এবং তাদের ছত্রছায়ায় খৃস্টান মিশনারীদের পূর্বনীতি অব্যাহত থাকে। স্বাধীন দেশ হিসেবে ফিলিপাইনের আত্মপ্রকাশের পর, বিশেষ করে ডিক্টেটর মার্কোসের সময় মুসলমানদের ওপর নিষ্পেষণ বৃদ্ধি পায়। এ সময় দক্ষিণ ফিলিপাইনের মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলে খৃস্টান পুনর্বাসন বৃদ্ধি পায়। এছাড়া মার্কোস সরকার মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে নাশকতায় অস্বীকৃতি জানানোর কারণে একদল মুসলিম সৈন্যকে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে অধ্যাপক নূর মিসুয়ারীর নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (এমএনএলএফ) গঠিত ও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

১৩টি মুসলিম-প্রধান প্রদেশকে স্বাধীন করার জন্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। এতে লিবিয়া সর্বাত্মক সাহায্য দেয়। কিন্তু অন্য কোন মুসলিম দেশই মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে নি। এমতাবস্থায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র মধ্যস্থতায় ১৯৭৬-এ ত্রিপোলীতে আলোচনা শুরু হয়। ত্রিপোলীতে দু'পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। কিন্তু মার্কোস সরকার যুদ্ধবিরতির সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দক্ষিণ ফিলিপাইনে ব্যাপকভাবে সৈন্যমোতায়েন করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে। সরকার প্রতিশ্রুত স্বায়ত্তশাসন প্রদান থেকে বিরত থাকে। ফলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

১৯৮৬ সালে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে যুদ্ধ ও আলোচনা পাশাপাশি চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে দক্ষিণাঞ্চলীয় স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে চুক্তি সম্পাদিত হয়। তবে একটি উপদল (এমআইএলএফ) স্বাধীনতার দাবীতে এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। অবশ্য সংঘর্ষের তীব্রতা হ্রাস পায়। (এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

ফিলিপাইনের মুসলিম জনসংখ্যা প্রশ্নে বিভ্রান্তি আছে। ফিলিপাইনের সরকারী সূত্র ও বিভিন্ন বৈদেশিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী ফিলিপাইনের বর্তমান মুসলিম জনসংখ্যা ৭০ লাখের নীচে। কিন্তু অধ্যাপক নূর মিসুয়ারীর দাবী অনুযায়ী ২ কোটি।[২৭] অন্যদিকে মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট (এমআইএলএফ)-এর নেতা হাসেম সালামত বলেছেন এক কোটি ২০ লাখ।[২৮] নূর মিসুয়ারীর দাবী সঠিক হলে ফিলিপাইনের মুসলমানরা হবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যালঘু। তবে তাদের একাংশ দেশের বাইরে রয়েছে।

## থাইল্যান্ড

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এক শতাব্দীকালের মধ্যেই থাইল্যান্ডে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে পাত্তানী নামে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশিক যুগে মুসলমানরা থাই বৌদ্ধদের তুলনায় বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা লাভের পরে থাই সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে চাকরি-বাকরি, এমন কি ধর্ম পালনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও বহুবিধ বৈষম্যের আশ্রয় নেয়। এ কারণে দক্ষিণ থাইল্যান্ডের পাঁচটি মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশে মুক্তিযুদ্ধ গড়ে ওঠে। বিগত কয়েক দশক যাবত এ মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। তবে মুসলিম জাহানের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করতে পারছে না।

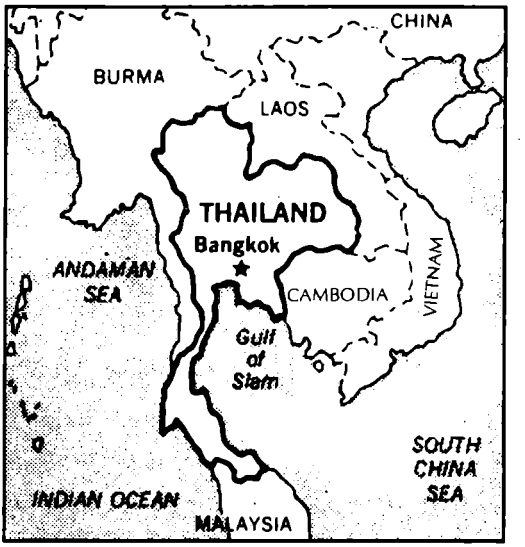


অন্যদিকে থাইল্যান্ডের মুসলমানরা দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষা ও আমলের ক্ষেত্রে খুবই পশ্চাদপদ। এ কারণে অনেকে দক্ষিণ থাইল্যান্ডকে স্বাধীন করার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে খাঁটি মুসলমান বানানোর ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করছেন। বিশেষ করে ব্যাংককসহ উত্তর থাইল্যান্ডের মুসলমানরা দক্ষিণ থাইল্যান্ডের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়। তারা প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদের সংখ্যাশক্তি বৃদ্ধি করার পক্ষপাতী। বর্তমানে সেখানে বিভিন্ন মহল থেকে দ্বীনী প্রচারমূলক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ চললেও তা তেমন শক্তিশালী নয়।

থাইল্যান্ডে মুসলিম জনসংখ্যা কত তা নিয়ে বিতর্ক আছে। বিভিন্ন সূত্রে ২২ লাখ, ৪০ লাখ ও সোয়া এক কোটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## কম্বোডিয়া

থাইল্যান্ডের প্রতিবেশী দেশ কম্বোডিয়া। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এখানকার মুসলমানদের সম্বন্ধে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় কম্যুনিস্টদের ক্ষমতা দখলের সময়। এ সময় তারা ৫ লাখ মুসলমানকে হত্যা করেছে বলে উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে কম্বোডিয়ায় প্রায় ২২ লাখ মুসলমান আছে বলে জানা যায়। তবে তারা কি অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

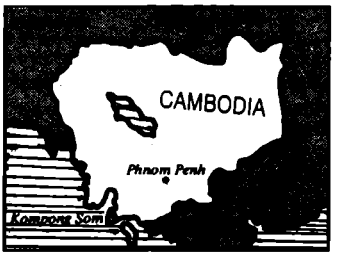


www.pathagar.com

## শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার জনগণ জাতিগতভাবে সিংহলী ও তামিল এবং ধর্মীয় দিক থেকে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান। বর্তমানে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ১৫ লাখ। বৌদ্ধরা সিংহলী ও হিন্দুরা তামিল। মুসলমানরা বেশীর ভাগ তামিল ও বাকীরা সিংহলী। বেশীর ভাগ মুসলমানই হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাস করছে।

বর্তমানে তামিল হিন্দুরা শ্রীলঙ্কার তামিল অধ্যুষিত এলাকায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার

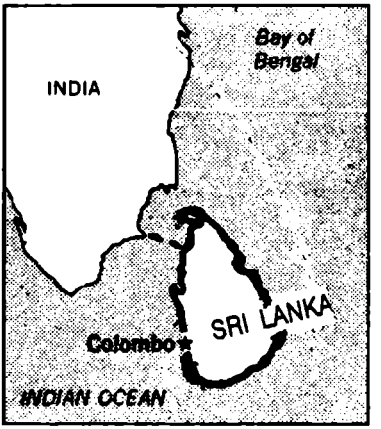


জন্যে যুদ্ধ করছে। কিন্তু মুসলমানরা বিচ্ছিন্নতার বিরোধী এবং শ্রীলঙ্কার ঐক্যের সমর্থক। এ কারণে সিংহলী বৌদ্ধদের পাশাপাশি মুসলমানরাও তামিল বিচ্ছিন্নতা-বাদীদের আক্রোশের শিকার হচ্ছে। বরং বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মুসলমানদের ওপরই বেশী ক্ষিপ্ত বলে মনে হচ্ছে। কারণ, মুসলমানরা না থাকলে তাদের পক্ষে ঐ এলাকায় নির্বিঘ্নে একাধিপত্য কায়েম করা সম্ভব। শ্রীলঙ্কার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বহু বার গণহত্যার আশ্রয় নিয়েছে।

শ্রীলঙ্কার মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট অগ্রসর। পার্লামেন্টে ও মন্ত্রিসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এক সময় স্পীকার পদে একজন মুসলমান নির্বাচিত হন। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা মোটামুটি অগ্রসর বলা চলে। ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজও কিছুটা চলছে যদিও এর ক্ষেত্র সীমিত।

## নেপাল

ভারতের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালার ওপরকার দেশ নেপালে বর্তমানে

আনুমানিক ৯ লাখ মুসলমান রয়েছে।

নেপাল সাংবিধানিকভাবে হিন্দু রাষ্ট্র। তবে দেশটিতে ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের ওপরে বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপরে কোন অত্যাচার নেই। এ দিক থেকে নেপালের অবস্থা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বিপরীত। তবে নেপালের মাটিতে কোন হিন্দু হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে পারে না। এ

www.pathagar.com

কারণে অনেক ক্ষেত্রেই যারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে তারা নেপালের বাইরে গিয়ে, প্রধানতঃ ভারতে গিয়ে, ধর্মান্তরিত হয়।

নেপালে ইসলামের দ্রুত বিস্তারের ক্ষেত্র না থাকলেও সেখানে ইসলাম ও মুসলমান নিরাপত্তা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারী।

## অন্যান্য এশীয় দেশ

এশিয়া মহাদেশের অমুসলিম-প্রধান অন্যান্য দেশেও কমবেশী মুসলমান রয়েছে। এর মধ্যে জাপানে কোন কোন সূত্রের তথ্যানুযায়ী প্রায় ২৫ লাখ মুসলমান রয়েছে বলে মনে হয়। কোন কোন সূত্রে অবশ্য খুব কম উল্লেখ রয়েছে।

জাপানের পার্শ্ববর্তী কোরীয় উপদ্বীপে সম্ভবতঃ হযরত আলীর (রাঃ) খেলাফতকালে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। কিন্তু বর্তমানে দুই কোরিয়ার কোথায় কত সংখ্যক মুসলমান রয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন সূত্রে দক্ষিণ কোরিয়ায় মাত্র ২৩ হাজার মুসলমান আছে বলে উল্লেখ পাওয়া যায় যা খুবই কম বলে মনে হয়। উত্তর কোরিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যা কত তা জানা যায় নি।

মঙ্গোলিয়ায় দেড় লক্ষাধিক মুসলমান আছে বলে জানা যায়।

## আফ্রিকা মহাদেশ

মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার অমুসলিম-প্রধান দেশগুলোতে মুসলমানের সংখ্যা অনেক। বিশেষ করে বেশ কয়েকটি দেশে যেমন ঃ কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের ব্যাপক প্রচারের চেষ্টা চলছে যদিও তা যথেষ্ট নয়। ইরানের সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন দ্বীনী সংস্থা সূদানে কেন্দ্র স্থাপন করে ঐসব দেশে ইসলাম প্রচার করছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় মোহাম্মদ দীদাত খৃস্টবাদের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়ে ইসলামের সত্যতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন।

আফ্রিকায় মুসলিম সংখ্যাগুরু নয় এমন দেশসমূহের মধ্যে কেনিয়ায় ৭৯ লাখ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো-তে (সাবেক জায়েরে) ৫৭ লাখ, মাদাগাস্কারে ৩০ লাখ, লাইবেরিয়ায় ১৪ লাখ, জাম্বিয়ায় ১২ লাখ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ৯ লাখ মুসলমান রয়েছে।

মুসলমানরা লাইবেরিয়ায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ এবং মাদাগাস্কারে শতকরা ১৯ ভাগ।

আফ্রিকা মহাদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে।

## যুগোস্লাভিয়া

সাবেক যুগোস্লাভিয়ার অন্যতম, বরং প্রধান প্রজাতন্ত্র সার্বিয়া। অবশ্য ছয়টি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে চারটি স্বাধীন হয়ে গেছে এবং সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো যুগোস্লাভিয়া নাম ধারণ করে আছে

www.pathagar.com

যদিও জাতিসংঘে যুগোস্লাভিয়ার সদস্যপদ বাতিল হয়েছে। এই সার্বিয়ার অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসনবিহীন প্রদেশ কসোভো একটি মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা। এক সময় স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ ছিল। যুগোস্লাভিয়ার বিলুপ্তির কিছুদিন পূর্বে স্বায়ত্তশাসন বাতিল করা হয়। কসোভোর ২০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ১৮ লাখ মুসলমান। ১৯৯৯-র মাঝামাঝি পর্যন্ত সেখানে মুক্তিযুদ্ধ চলেছে। (এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

সার্বিয়ার সান্‌জাক্ এলাকায়ও আড়াই লাখ মুসলমান আছে। এছাড়া মন্টিনিগ্রো প্রজাতন্ত্রে আরো আড়াই লাখ মুসলমান রয়েছে।

## ইউক্রেন

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির ফলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশকারী ১৫টি দেশের অন্যতম ইউক্রেন। ইউক্রেনের মুসলমানদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্ত ক্রিমিয়া এক সময় মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা ছিল এবং তাতার মুসলমানদের অন্যতম কেন্দ্রভূমি হিসেবে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সে হিসেবে ক্রিমিয়া সব সময়ই বিশ্বের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

**ক্রিমিয়ার মুসলমান ঃ** ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ক্রিমিয়া উপদ্বীপের আয়তন ৯ হাজার ৯০০ বর্গমাইল (২৫,৬৪১ বর্গকিলোমিটার)। সূত্রান্তরে ২৭ হাজার বর্গকিলোমিটার উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে ক্রিমিয়ায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে ক্রিমিয়া এখনো মুসলিম এলাকা হিসেবে পরিচিত।

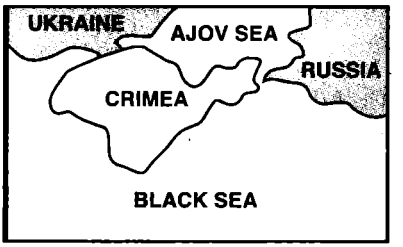


১৯২১ সালে এ মুসলিম ভূখণ্ডটি সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত হয়। ১৯৪১ সালের হিসেবে ক্রিমিয়ার জনসংখ্যা ছিল ১২ লাখ। এদের মধ্যে তিন লাখ ছিল তাতার

www.pathagar.com

মুসলমান। কিন্তু সংখ্যালঘু হলেও বীরের জাতি হিসেবে সর্বত্র তাদের প্রাধান্য ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ক্রিমিয়া জার্মান দখলে চলে গেলে তাতার ও অন্যান্য জনগণের একাংশ পরিস্থিতির চাপে পড়ে তাদের সাথে সহযোগিতা করে। কিন্তু ১৯৪৪ সালে সেখানে সোভিয়েত দখল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে 'দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা'র অভিযোগে কেবল তাতারদেরকে ঢালাওভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ সাইবেরিয়া ও কাজ্জাকিস্তানে নির্বাসিত করা হয়। স্তালিনের মৃত্যুর পর অন্যান্য নির্বাসিতদের নিজ নিজ এলাকায় ফেরার অনুমতি দেয়া হলেও তাতারদের সে অনুমতি দেয়া হয় নি। এমতাবস্থায় তাদের অনেকেই উজবেকিস্তান ও কিরগিজিস্তানে এসে বসবাস করতে থাকে। ১৯৮৫ সালের হিসাবে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রিমীয় তাতারদের সংখ্যা ছিল চার লাখ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর ক্রিমিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু ইউক্রেন তা মেনে নেয় নি, বরং স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করেছে। ১৯৯৪-র শুরুর দিকে ক্রিমিয়ার জনসংখ্যা ছিল ২৫ লাখ। এদের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগই রুশ বংশোদ্ভুত। তাতার মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৫ হাজার। ২০০০ সালের সমাপ্তিতে ৬০ হাজারে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত অন্যান্য দেশ থেকে ক্রিমীয় তাতাররা ক্রিমিয়ায় চলে এলে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

ক্রিমিয়ার মুসলমানরা সেখানকার রুশদের সাথে মিলে স্বাধীনতা দাবী করছে। অবশ্য রুশরা, স্বাধীনতা পেলে রাশিয়ায় যোগ দেবে বলে ঘোষণা করেছে; মুসলমানরাও এতে সম্মত আছে।

## বুলগেরিয়া

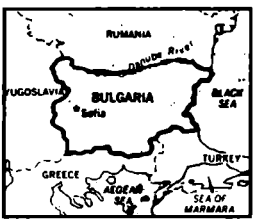


পূর্ব ইউরোপীয় দেশ বুলগেরিয়া এক সময় ওসমানী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন দেশটিতে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু ছিল। দেশটিতে বর্তমানে প্রায় ২০ লাখ তুর্কী বংশোদ্ভুত মুসলমান রয়েছে। কম্যুনিস্ট আমলে মুসলমানরা চরম নিষ্পেষণের মধ্যে ছিল। বর্তমান পুঁজিবাদী আমলেও মুসলমানদের প্রতি আচরণ পাল্টায় নি।

## ফ্রান্স

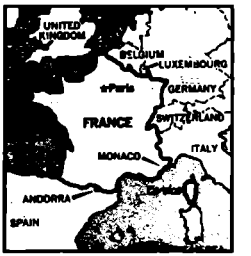


ফ্রান্সে বর্তমানে আনুমানিক প্রায় ৭২ লাখ মুসলমান রয়েছে। এদের মধ্যে অন্ততঃ ১০ লাখ ফরাসী বংশোদ্ভুত এবং বাকীরা প্রধানতঃ উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত ও তাদের বংশধর।

গুরুতর ধরনের ভোগবাদী প্রবণতার কারণে ফরাসীরা জন্মনিরোধের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িমূলকভাবে অগ্রসর হয়েছে।

www.pathagar.com

এক সন্তানের বেশী খুব কম পরিবারেই দেখা যায়। ফলে দিন দিন ফরাসী জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। সন্তান মানুষ করার জন্যে সরকার যেসব সামাজিক সুবিধা দিচ্ছে তা ফরাসী দম্পতিদের সন্তান জন্মদানে আগ্রহী করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে না। অন্যদিকে মুসলমানরা এসব সুবিধা পুরোপুরি গ্রহণ করছে। ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে ফরাসী খৃস্টানরা মুসলমানদের ওপর ভীষণ রুষ্ট এবং মুসলমানদের ভয়ে (ভবিষ্যত ভেবে) তারা ভীতও বটে। এ কারণে সেখানে ইসলাম বিরোধী প্রচারণা উত্তুঙ্গে উঠেছে এবং মুসলমানদের ধর্ম পালনেও বাধা দেয়া হচ্ছে। মুসলিম মেয়েদের মাথায় রুমাল বাঁধার অপরাধে স্কুল থেকে বহিষ্কারের ঘটনা বহু বার ঘটেছে। মসজিদ গড়তে না দেয়া বা মসজিদে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে।

ভোগবাদী ফরাসীদের মধ্যে ইসলামের প্রচারে সাফল্যের আশা কম। তবে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খৃস্টান ফরাসীদের জনসংখ্যা হ্রাসের কারণে আগামী অর্ধ শতাব্দী পরে ফ্রান্সে মুসলমানদের সংখ্যাগুরু হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

## বৃটেন

বৃটেনে আনুমানিক ২০ লাখ মুসলমান রয়েছে। এদের মধ্যে পাকিস্তানী বংশোদ্ভুতদের সংখ্যা বেশী; এরপর বাংলাদেশী ও ভারতীয় বংশোদ্ভুতদের সংখ্যা। অন্যান্য দেশের মুসলমানদের বংশধর এবং বৃটিশ বংশোদ্ভুত মুসলমানও রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সব সময়ই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসেছে। তাই বিশ্বব্যাপী ইসলাম-বিরোধী প্রচারণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে লন্ডন। মুরতাদ সালমান রুশদীর দ্বারা ইসলামের জন্যে অবমাননাকর বই লেখানো এবং তার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল বৃটিশ সরকারের আনুকূল্যে। অবশ্য শাসনতান্ত্রিক কারণে অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় মুসলমানরা যে স্বাধীনতা পাচ্ছে তা তারা পুরোপুরি কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। যেমন ঃ এই বৃটিশ মুসলমানদের আন্দোলনের কারণেই সালমান রুশদী মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার ভয়ে আত্মগোপন করে।

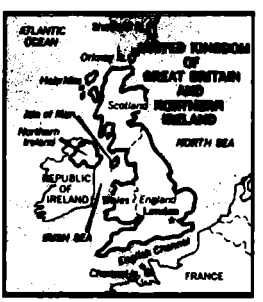


বৃটিশ মুসলমানরা তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুসলিম পার্লামেন্ট নামে একটি পরামর্শসভা গড়ে তুলেছে।

## অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে

ইউরোপের অন্যান্য দেশেও মুসলমান রয়েছে। গ্রীসের পার্লামেন্টে একজন মুসলিম সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু সেখানকার মুসলিম জনগণের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা সীমিত। এমন কি মসজিদ প্রতিষ্ঠায়ও বাধা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

জার্মানীতে বর্তমানে তিরিশ লক্ষাধিক মুসলমানের বাস। তবে এদের বেশীর ভাগ বহিরাগতদের বংশধর, বিশেষ করে তুর্কী। সেখানে নব্য নাজীরা বহিরাগতদের ওপর যে হামলা শুরু করেছে বিশেষভাবে মুসলমানরাই তার শিকার।

ইউরোপের অন্যান্য দেশেও মুসলমান রয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা কম।

## আমেরিকা ও কানাডা

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে আনুমানিক এক কোটি দশ লাখের মত মুসলমান রয়েছে। অবশ্য এদের বেশীর ভাগই বহিরাগত বা তাদের বংশধর। বর্তমানে খৃষ্টানদের পরে মুসলমানরা সেখানে দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু ধর্মীয় জনগোষ্ঠী।

আমেরিকান সরকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানী করছে। মিসরীয় অন্ধ হাফেয শেখ ওমর আবদুর রহমানকে কারাগারে নিক্ষেপের ঘটনা বিশ্ববাসী অবগত আছে। এছাড়া মার্কিন প্রচারমাধ্যমে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

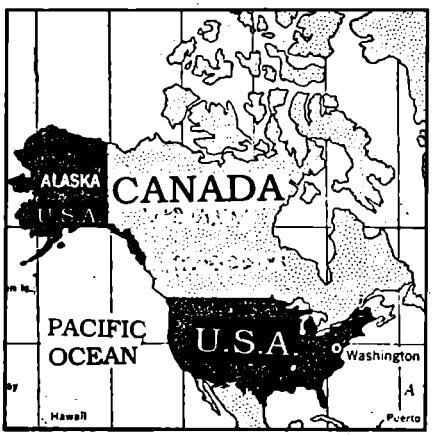


এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমেরিকার সাংবিধানিক স্বাধীনতার আওতায় সেখানকার মুসলমানরা ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্যে কাজ করছে এবং বহু আমেরিকান, বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গরা ইসলাম গ্রহণ করছে। কৃষ্ণাঙ্গ নেতা লুই ফাররাহ্ খানের নেতৃত্বে সেখানে স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

অতি সম্প্রতি মার্কিন সরকার মুসলমানদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করতে শুরু করেছে। সশস্ত্র বাহিনী ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমানরা চাকরি করছেন।

কানাডায় সাড়ে ৪ লাখ মুসলমান রয়েছে যদিও বেশীর ভাগই বহিরাগত বা তাদের বংশধর। তারাও ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্যে কাজ করছে, অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে, আবার অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের সাথে যৌথভাবে। বর্তমানে কানাডায় অভিবাসন সূত্রে মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের বহু পূর্বেই—কোন কোন সূত্র মতে ছয়শ' বছর পূর্বে—আফ্রিকা মহাদেশের কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানরা আমেরিকায় আগমন ও বসতি স্থাপন করে।[২৯] তারা প্রধানতঃ মধ্য আমেরিকায় অবস্থান নেয়।

www.pathagar.com

বর্তমানে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় কমবেশী প্রতিটি দেশেই মুসলমান রয়েছে। বিশেষ করে ভেনেজুয়েলায় ২০ লাখ, ব্রাজিলে ৬৯ লাখ, মেক্সিকোতে ১১ লাখ এবং কলম্বিয়ায় ৮ লাখ মুসলমান রয়েছে।

মধ্য আমেরিকার ছোট দেশগুলোতেও যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান রয়েছে এবং কোন কোন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায়ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে। যেমন ঃ পানামায় প্রায় তিন লাখ মুসলমান আছে। পানামার বীর পুরুষ জেনারেল ওমর তোরিখোস্ মার্কিন আধিপত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন।

এছাড়া ত্রিনিদাদ ও তোবাগোতে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানরা অধিষ্ঠিত আছে। অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকার ছোট দেশ ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট পদে একজন মুসলমান অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ আবু কারাম।

## অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ায় বর্তমানে পাঁচ লক্ষাধিক মুসলমান আছে যাদের বেশীর ভাগই অভিবাসী বা তাদের বংশধর। এদের মধ্যে বাংলাদেশী, পাকিস্তানী ও ভারতীয় মুসলমানদের ও তাদের বংশধরদের সংখ্যাই বেশী। এছাড়া বেশ কিছু দেশী মুসলমানও রয়েছে। তারা ইসলামের অনুসরণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর। অস্ট্রেলিয়ার খৃস্টানদের মধ্যে বর্ণবাদী মানসিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা উপেক্ষা করেই দেশটিতে প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

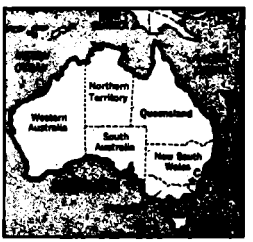


### পাদটীকা ঃ

১) এ সম্বন্ধে 'বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা ঃ একটি সমীক্ষা' শীর্ষক নিবন্ধে সংশ্লিষ্ট বিশেষ টীকা দ্রষ্টব্য।

২) তেহরানে কয়েক বছর আগে দিল্লীর একজন বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষক অত্র লেখকের নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, আপনারা বাংলাদেশীরা ও পাকিস্তানীরা কাশ্মীরের স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন করেন—এতে আমরা অসন্তুষ্ট। আমরা কাশ্মীরের স্বাধীনতার সমর্থন করি না। কাশ্মীরে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু; তাদের উচিত ছিল সারা ভারতের মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়া। তার পরিবর্তে তারা ভারত থেকে আলাদা হতে চায়। তারা যখন আমাদের কথা চিন্তা করে না তখন আমরা কেন তাদের জন্যে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের আক্রোশের শিকার হব? আমাদের—ভারতের মুসলমানদের—ভারতেই থাকতে হবে; আপনারা পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে আমাদেরকে জায়গা দিতে পারবেন না। অতএব আমরা যাতে ভালভাবে ভারতে থাকতে পারি সে চেষ্টাই করা উচিত। আমাদের এলাকা পাকিস্তানে পড়বে না তা জেনেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সমর্থন করে আমরা যে ভুল করেছি সে কারণে এখনো হিন্দুরা আমাদের সন্দেহের চোখে দেখে, পাকিস্তানের দালাল মনে করে। এরপর কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতার সমর্থন করলে তাদের আক্রোশই বৃদ্ধি করা হবে। তাই আমরা কাশ্মীরের স্বাধীনতার সমর্থন করি না। একারণেই কাশ্মীরীদের সমর্থনে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বিক্ষোভ হলেও ভারতীয় মুসলমানরা বিক্ষোভ করে না।

www.pathagar.com

৩) হংকং থেকে প্রকাশিত Muslim Unrest in China শীর্ষক একটি পুস্তক ষাটের দশকের শেষের দিকে অত্র গ্রন্থকারের হাতে এসেছিল। এতে সিনকিয়াং-এর চীনভুক্তির বিস্তারিত বিবরণ ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পুস্তকটি হারিয়ে যায়।

৪) *Muslim Unrest in China*

৫) International Herald Tribune: 16-8-1993. উল্লিখিত জনসংখ্যা ১৯৯২ সালের; বর্তমানে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সূত্রান্তরে (এসিয়াউইক/বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ১৪-১১-১৯৯৭) সিনকিয়াং-এর মুসলিম জনসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য সূত্র অনুযায়ী সিনকিয়াং-এ মুসলমানদেরকে ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে।

৬) প্রাগুক্ত।

৭) New Nation: 13-10-1993

৮) মিল্লাত ঃ ১৩-১০-১৯৯৩

৯) The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World

১০) جمهوری اسلامی ঃ ২৮-১১-১৯৯১

১১) প্রাগুক্ত ঃ ১৬-১১-১৯৯১

১২) Crescent International: August 1-15, 1991

১৩) ১৯৯২-র শুরুতে যে গণভোট হয় তাতে এ প্রজাতন্ত্রটির ভোটার-সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ। (Tehran Times : 28-3-1992) মোট জনসংখ্যা ভোটার-সংখ্যার কমপক্ষে দ্বিগুণ হলে ঐ সময় প্রজাতন্ত্রটির জনসংখ্যা ছিল ৫২ লাখ। কম পক্ষে বছরে শতকরা ১ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেলেও শতাব্দীশেষে প্রজাতন্ত্রটির জনসংখ্যা ৫৭ লাখের কাছাকাছি দাঁড়াবে।

১৪) Tehran Times: 28-3-1992

১৫) Crescent International: August 1-15, 1991

১৬) Daily Star: 31-10-1993

১৭) New Nation: 23-10-1993

১৮) جمهوری اسلامی ঃ ১৮-১১-১৯৯১

১৯) Time: 26-7-1993

২০) মিল্লাত ঃ ১৫-৬-১৯৯৩

২১) Time: 1-2-1993

২২) Morning Sun: 3-11-1993

২৩) Time: 20-7-1993

২৪) اقلیتهای مسلمان درجهان امروز ঃ পৃঃ ৮৯-৯০

২৫) কোন কোন তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে মনে করা হয়, এ উভয় এলাকায়ই হযরত রাসূলে আকরাম (সঃ)-এর জীবনকালেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছিল।

২৬) জনকণ্ঠ ঃ ১৭-৭-১৯৯৯

২৭) ইত্তেফাক ঃ ৮-৩-১৯৯৭; Iran News: 2-7-1997; Tehran Times: 2-7-1997

২৮) আল-ইসলাহ্/আলমুজাদ্দেদ ঃ ১৯-১-১৯৯৫

২৯) New Nation: 31-7-1993

www.pathagar.com

# মুসলিম মুক্তিযুদ্ধ

ইতিপূর্বে বিশ্বের মুসলিম সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমরা কিছুটা আভাস দিয়েছি। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রাম ও কসোভোর মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। চেচনিয়া সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। বর্তমানে চলমান মুক্তিযুদ্ধসমূহের মধ্যে থাইল্যান্ডের মুসলমানদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি বিধায় সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। অন্য মুক্তিযুদ্ধগুলো সম্বন্ধে এখানে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি।

## কাশ্মীর

পাকিস্তান ও ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন 'জম্মু ও কাশ্মীর' ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল না, বরং ইংরেজদের প্রতি অনুগত একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বৃটিশ সরকার জম্মু ও কাশ্মীর এবং এ ধরনের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যকে ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের বা স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার অধিকার প্রদান করে।

কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ দেশটিকে পাকিস্তানভুক্ত করার পরিবর্তে স্বাধীন রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু দেশের হিন্দু রাজা নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হওয়া

সত্ত্বেও এবং জনমত গ্রহণ না করে ভারতে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। পূর্বাহ্নিক গোপন সমঝোতা অনুযায়ী সীমান্তে অবস্থানরত ভারতীয় বাহিনী সাথে সাথে কাশ্মীরকে দখল করে নেয়। ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর হবার সাথে সাথে পাকিস্তানী বাহিনীও কাশ্মীরে প্রবেশ করে। ফলে ১৯৪৮-এর শুরুর দিকে দু'পক্ষে মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধবিরতি হয় এবং গণভোটের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরবাসীদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দানের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু ভারত এ প্রস্তাব কর্যকরী করে নি। অন্যদিকে

www.pathagar.com

ভারতের প্রতি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনের কারণে জাতিসংঘ ভারতকে এ প্রস্তাব কার্যকরী করণে বাধ্য করতে পারে নি।

এরপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ৯০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং ভারত এদেরকে নিজের কাছে নিয়ে যায়। ১৯৭২ সালে ভারতের সিমলায় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী কাশ্মীরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ-বিরতি-রেখা বরাবর দু'দেশের নিয়ন্ত্রণরেখা চিহ্নিত হয়। অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের দুই অংশকে পরোক্ষভাবে দুই দেশের ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। এর বিনিময়ে ভারত নব্বই হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিদান করে। কিন্তু এই ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে ইন্দিরা-ভুট্টো কেউই কাশ্মীরী জনগণের মতামত গ্রহণ করেন নি।

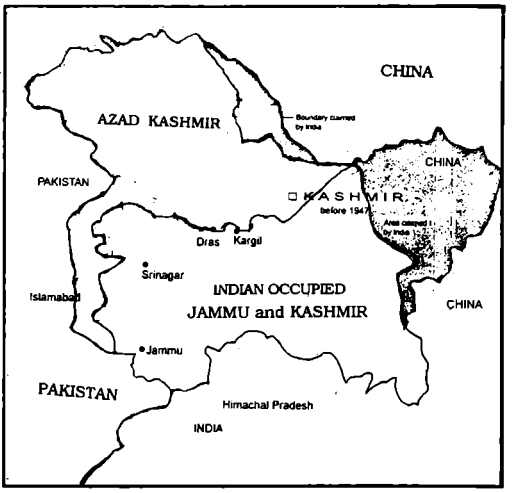


জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ প্রায় সকলেই মুসলমান। তারা স্বাধীন দেশ হিসেবে থাকার বা পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষপাতী। তাই তারা কোন দিনই ভারতের অংশ হিসেবে অধিকৃত কাশ্মীরকে স্বীকার করে নি। পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর অবশ্য এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানভুক্ত হয় নি, বরং 'আযাদ কাশ্মীর' নামে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে অর্ধ-স্বাধীনভাবে রয়েছে। আযাদ কাশ্মীরের আয়তন ৮৩ হাজার ৩০৭ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা পনর লাখ। আর ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরের আয়তন এক লাখ এক হাজার ৩৮৭ বর্গকিলোমিটার। ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের জনসংখ্যা ১৯৯০ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৮০ লাখ ছিল। সে হিসেবে ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরের জনসংখ্যা ২০০০ খৃষ্টাব্দের শেষে প্রায় এক কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে।

কাশ্মীরের মুসলিম জনগণ স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৯ সালে সূচিত এ যুদ্ধে ৬০ হাজারেরও বেশী লোক প্রাণ হারিয়েছে। এছাড়া হাজার হাজার মুসলমান কারাগারে রয়েছে।

www.pathagar.com

কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধ যথারীতি অব্যাহত রয়েছে। প্রায়ই সংঘর্ষ ও হতাহত হবার খবর আসে। যখন তখন ধর্মঘটে সবকিছু অচল হয়ে পড়ে। কার্যতঃ কেবল দিনের বেলা শুধু শহরগুলোতেই ভারতের কর্তৃত্ব রয়েছে। রাতের বেলা এবং শহরের বাইরে পুরোপুরি মুজাহিদদের কর্তৃত্ব চলছে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির গতিধারা দৃষ্টে কৌশলগত কারণে পাকিস্তান সরকার কাশ্মীরী মুজাহিদদেরকে সর্বাত্মক সাহায্য তথা ভারী অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য দিতে পারছে না যদিও পাকিস্তানী জনগণের সাথে সাথে সেদেশের সরকারও ভারত থেকে অধিকৃত কাশ্মীরের মুক্তি মনেপ্রাণে সমর্থন করে। এর ফলে কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধ আফগানিস্তানের সোভিয়েত-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় প্রচণ্ড আকার ধারণ করতে পারছে না। তাই মুক্তিযুদ্ধ কতদিন চলবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র সমর্থন থাকলেও এব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ধরনের। কাশ্মীরের বাইরে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুসলমান রয়েছে তারা প্রকাশ্যে কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতে পারছে না। কারণ, ভারত-বিভাগে ও পাকিস্তান সৃষ্টির প্রতি সমর্থনের কারণে ভারতীয় মুসলমানরা দেশের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের নিকট পাকিস্তানের এজেন্ট এবং পঞ্চম বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচারের পিছনে এটি অন্যতম কারণ বটে। এ অবস্থায় তারা ভারত থেকে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাকে সমর্থন করে নতুন করে সংখ্যাগুরুদের আক্রোশ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে না। অন্যদিকে ভারতীয় মুসলামানদের একটি অংশ মনে করে, পঁচিশ কোটি মুসলমানের দেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে কাশ্মীরের মুসলমানদের উচিত সারা ভারতের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধতা ও শক্তিবৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেয়া। মুসলিম সংখ্যাগুরু রাজ্যে হিসেবে কাশ্মীর সারা ভারতের মুসলমানদের জন্য শক্তিকেন্দ্রের ভুমিকা পালন করতে পারে। অবশ্য কাশ্মীর ভারতের অংশ ছিল না, সে হিসেবে কাশ্মীরীদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে স্বাধীনতার। কিন্তু তারা তাদের স্বাধীনতার অধিকারকে পঁচিশ কোটি মুসলমানের কল্যাণে উৎসর্গ করলে সেটাই অধিকতর কাম্য হত বলে ভারতীয় মুসলমানদের এ অংশটি মনে করে।

কাশ্মীরের জনগণ ভারত ও পাকিস্তানের সরকার এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক খেলার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অতীতে কাশ্মীরে গণভোট বাস্তবায়নের জন্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বহু বার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে ভেটো প্রয়োগ করে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনের প্রশ্নে যে ভুমিকা পালন করত সোভিয়েত ইউনিয়ন কাশ্মীর প্রশ্নে অনুরূপ ভুমিকা পালন করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর ভারত আমেরিকার একক নেতৃত্ব মেনে নিলে আমেরিকা কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের ওপর আর চাপ সৃষ্টি করে নি। বরং আমেরিকা স্বয়ং কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছে এবং এ লক্ষ্যে, যারা পাকিস্তানে যোগদানের পরিবর্তে স্বাধীন কাশ্মীর প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী তাদেরকে উস্কানি দিচ্ছে। শুধু তা-ই নয়,

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক কাশ্মীরের যে অংশ চীন ও পাকিস্তানভুক্ত রয়েছে (আযাদ কাশ্মীর ছাড়াও) তাকেও আমেরিকা বিতর্কিত বলে দাবী করে নতুন সংকট সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে যা পাকিস্তানের জন্য খুবই বিব্রতকর হবে।

১৯৯৩ সালে বেনযীর ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের পুনর্বিভক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন যা অনেক বেশী বাস্তবভিত্তিক ছিল। তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলে অধিকৃত কাশ্মীরের জম্মুর হিন্দুপ্রধান এলাকা ভারত পেয়ে যেত এবং মুসলিমপ্রধান বাকী এলাকা আযাদ-কাশ্মীরের সাথে মিলে, হয় পাকিস্তানভুক্ত হত, নয়ত স্বাধীন হত। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ভারত সরকার এ প্রস্তাবে সাড়া দেয় নি।

১৯৯৯-র মে মাসে পাকিস্তানী সৈন্যদের সহায়তায় কাশ্মীরী মুজাহিদরা কৌশলগত পার্বত্য এলাকা কারগিলের কয়েকটি জায়গা দখল করেছিল। কিন্তু আমেরিকার চাপে পাকিস্তান সৈন্য প্রত্যাহার করে এবং মুজাহিদদেরকেও সরে যেতে বাধ্য করে। তবে মুজাহিদদের অভিযান অব্যহত থাকে।

গত জুলাই মাসে (২০০০) ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জন্য অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব দিলে কাশ্মীরের বৃহত্তম মুজাহিদ সংগঠন 'হিজবুল মুজাহিদীন' আলোচনায় রাজী হয়ে যুদ্ধবিরতি করে। তবে অন্যান্য মুজাহিদ গ্রুপ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপর 'হিজবুল মুজাহিদীন' ও ভারত সরকারের মধ্যে এক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তবে আলোচনায় তেমন অগ্রগতি সাধিত হয় নি এবং নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে।

## আরাকান

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বৃহত্তর চট্টগ্রামের যেখানে ভারতীয় সীমান্ত শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্ত। এখান থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত দু'দেশের মধ্যে ২৭০ কিলোমিটার (১৭৬ মাইল) অভিন্ন সীমান্ত রয়েছে। এর পুরোটাই বার্মার আরাকান প্রদেশের সাথে। এর মধ্যে ৪৮ মাইল নাফ নদী দ্বারা প্রাকৃতিকভাবে চিহ্নিত, বাকী ১২৮ মাইল স্থলসীমান্ত।

গোটা আরাকানের আয়তন বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেকের সমান—২৫ হাজার ২৩৫ বর্গমাইল। বার্মা সরকার আরাকানের পূর্ব-উত্তর অংশকে আরাকান থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'আরাকান পার্বত্য এলাকা' নামকরণ করেছে। বর্তমান আরাকান প্রদেশের আয়তন ২০ হাজার বর্গমাইল।[১] শতাব্দীর শেষ নাগাদ আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৫১ লাখে উন্নীত হবে। এদের মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম জনসংখ্যা আনুমানিক যথাক্রমে ৩৫ লাখ ও ১৬ লাখে দাঁড়াবে। কিন্তু আরাকানী মুসলমানদের বেশীর ভাগই দেশ থেকে বিতাড়িত

www.pathagar.com

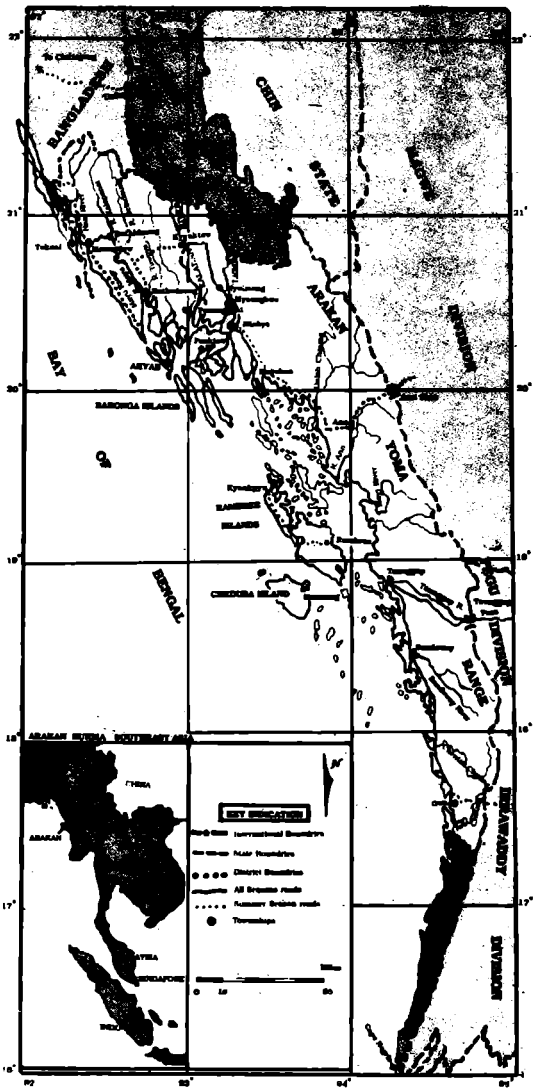


হয়েছে বা পালিয়ে গেছে এবং তাদের সংখ্যা আনুমানিক সাড়ে ১৮ লাখে দাঁড়িয়েছে। বাকী সাড়ে ১৬ লাখ আরাকানে আছে। আরাকানী মুসলমানরা 'রোহিঙ্গা' নামে পরিচিত।[২]

বঙ্গোপসাগরে দীর্ঘ ৩৬০ মাইল ব্যাপী উপকূলের অধিকারী পাহাড়-পর্বত ও সমভূমি বিশিষ্ট একটি অপ্রশস্ত ভূখণ্ড আরাকান বিশেষ এক কৌশলগত অবস্থানের অধিকারী। রাজধানী আকিয়াব একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী।

আরাকানে মুসলমানদের আগমন ঘটে চট্টগ্রামে তথা বাংলায় ইসলাম আগমনের কাছাকাছি বা সমসময়ে। কোন কোন সূত্রে হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত-কালে ৬৬০ খৃষ্টাব্দে আরাকানে ইসলামের প্রথম প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য কোন কোন সূত্রের বিশ্লেষণে হযরত রাসূলে আকরাম(সঃ)-এর সময়েই এখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটে বলে মনে হয়। ঐ সময় এবং আরো পরে দীর্ঘ বহু বছর যাবত বার্মায় বা আরাকানে কোন রাষ্ট্র ও সরকার ছিল না, অর্থাৎ এটা একদেশ ছিল না।

এরপর ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানে প্রথম বারের মত চন্দ্রবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বার্মায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ৮৫০ খৃষ্টাব্দে। ৯৫৭ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলদের হাতে আরাকানের চন্দ্রবংশের বিলুপ্তি ঘটে। এরপর পাঁচ শতাব্দী এখানে কোন বিধিবদ্ধ রাজত্ব

www.pathagar.com

ছিল না। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে সেখানে বাংলার মোগল রাজত্বের প্রভাবাধীন একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আরাকানের রাজারা মোগলদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার জন্যে মুসলমানী নাম ধারণ করতেন এবং অনেক বড় বড় রাজপদে মুসলমানরা অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৭৮৪ সালে বার্মার রাজা আরাকান দখল করে একে বার্মাভুক্ত করেন। কিন্তু ১৮২৫ সালে বাংলার ইংরেজরা আরাকান দখল করে নেয়। অর্থাৎ আরাকান মাত্র ৪১ বছরের জন্যে বার্মাভুক্ত ছিল। ১৮২৫ থেকে আরাকানকে বাংলাভুক্ত বলা চলে। অবশ্য ১৮৮৫তে ইংরেজরা বার্মাকেও দখল করে নেয়। ঐ সময় থেকে বার্মা বৃটিশ-ভারতের অংশ বলে গণ্য হতে থাকে। ১৯৩৫-এ বৃটেন যখন ভারতবাসীদের জন্যে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তখন বার্মাকে আলাদাভাবে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় এবং আরাকানকে বার্মাভুক্ত করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা প্রদানকালে ইংরেজরা মুসলিম-সংখ্যাগুরু আরাকানকে পাকিস্তানভুক্ত না করে বার্মাভুক্ত রেখে দেয়। ১৯৪৮-এ বৃটেন বার্মাকে (আরাকানসহ) স্বাধীনতা প্রদান করে।

১৯৪৭ সালে বার্মার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নেতাদের এক সম্মেলনে বার্মাকে স্বাধীনতার পর একটি ইউনিয়ন রাষ্ট্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু এ সম্মেলনে রেহিঙ্গা-নেতাদের দাওয়াত করা হয় নি।[৩] বরং রেহিঙ্গাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে গণ্য করা হয়। শুধু তা-ই নয়, তাদের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমিক হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও বিতাড়ন অভিযান শুরু হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত পনরটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে।[৪] ১৯৪২ সালে আরাকানে মোট এক লাখ মুসলমানকে হত্যা করা হয়। এতদসহ এপর্যন্ত এক লাখ আশি হাজার লোককে হত্যা[৫] ও ১৫ লক্ষ লোককে বিতাড়িত করা হয়েছে।[৬] এছাড়া ৭১৫টি গ্রাম ধ্বংস, ৬ হাজার ৭০০ বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ, ১৯৭৫টি মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস, ২৬০০ নারীকে ধর্ষণ, ৬০০ নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা, সাড়ে চার হাজার লোককে গ্রেফতার এবং সাড়ে ২১ হাজার জনকে নিখোঁজ করে দেয়া হয়।[৭]

এরপর ১৯৭৮ সালে তিন লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অবশ্য তাদের মধ্যে থেকে এক লাখ ৯৩ হাজার জনকে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হয়।[৮] কিন্তু ১৯৯১-৯২-এ পুনরায় ২ লাখ ৬৫ হাজার রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়। বাংলাদেশ ও বার্মা সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এদের প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া শুরু হলে বর্মী সরকারের জুলুম-অত্যাচারের ভয়ে অনেকে শরণার্থীশিবির থেকে পালিয়ে যায়। ১৯৯৩-র অক্টোবর পর্যন্ত এরূপ পলায়নকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ হাজারে।[৯]

১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতা লাভের পর আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়। অবশ্য রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে উৎখাত অভিযান

www.pathagar.com

শুরু হয় ১৯৪২ সালে। তবে স্বাধীনতার পর আরাকানে মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে উৎখাত অভিযান শুরু হয়।[১০]

অবশ্য ১৯৪২-এর গণহত্যার প্রেক্ষাপটে বার্মার স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই ১৯৪৭ সালেই আরাকানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।[১১] প্রথমে কাওয়াল জাফর ও কাসেম রাজার নেতৃত্বে আরাকানের মুক্তিযুদ্ধের সুচনা হয়। কিন্তু এ যুদ্ধে আরাকানী মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্বের কোন স্থান থেকেই, এমন কি প্রতিবেশী মুসলিম দেশ পাকিস্তান—যা ছিল তখন বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র—থেকেও কোনরূপ সাহায্য বা রাজনৈতিক সমর্থন পায় নি। শুধু তা-ই নয়, বর্মী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের এক পর্যায়ে কাসেম রাজা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) এসে আশ্রয় নিলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে দস্যু-সরদার নামে আখ্যায়িত করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। তিনি বহু বছর এখানকার কারাগারে কাটান। এরপর একসময় তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু মুক্তিলাভের পর পরই তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।[১২]

১৯৪৭ থেকে শুরু করে আরাকানে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে বিভিন্ন জঙ্গী দল গড়ে ওঠে। কিন্তু এসব দল মুসলিম জাহানের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। অবশ্য সত্তরের দশকে কর্নেল গাদ্দাফীর নেতৃত্বাধীন লিবিয়া আরাকানের মুক্তিযুদ্ধে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য প্রদানে এগিয়ে আসে। এক পর্যায়ে আকিয়াব ছাড়া প্রায় গোটা আরাকানই মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কিন্তু বিমানসহায়তা ছাড়া আকিয়াব দখল করে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। আর বাংলাদেশের সহায়তা ছাড়া বাইরের কোন দেশের পক্ষে (যেমন ঃ লিবিয়া) বিমানসহায়তা দেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার বার্মার সাথে বিরোধে জড়াতে রাজী ছিল না। তাই মুক্তিযোদ্ধারা আকিয়াব দখল ও স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে বিরত থাকে।

এমতাবস্থায় বর্মী বাহিনী আকিয়াবের বাইরে গোটা আরাকানে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে 'অপারেশন নাগামিন্' নামে আরাকানের রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক হত্যা, ধ্বংস, দমন ও বিতাড়ন অভিযান শুরু করে। এর ফলে প্রাণভয়ে তিন লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়। পরে বাংলাদেশ-বার্মা সমঝোতার ভিত্তিতে এক লাখ ৯৩ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান আরাকানে ফিরে যেতে সক্ষম হয়।[১৩] বাকী এক লাখ দশ হাজার বাংলাদেশে থেকে যায় এবং এদের একাংশ এখান থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যারা দেশে ফিরে যায় তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা অপরিবর্তিত থাকে। তেমনি তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচারের অবসান হয় নি। এরপর ১৯৯১-৯২-র অভিযানে পুনরায় ২ লাখ ৬৫ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

আরাকানের মুসলমানদের অবস্থা ফিলিপাইন, কাশ্মীর, থাইল্যান্ড বা অন্য যে কোন দেশের মজলুম মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র। রোহিঙ্গা মুসলমানরা নিজ দেশে নাগরিক হিসেবেই স্বীকৃত নয়। বার্মা সরকার তাদেরকে 'বহিরাগত ও তাদের বংশধর' দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করে থাকে—যাদের ঐ দেশে বসবাসের অধিকার যে কোন সময় সরকার বাতিল করতে পারে।

আরাকানে মগ্‌দের ও অন্যান্য উপজাতীয় বর্মীদের এনে পুনর্বাসিত করে রোহিঙ্গাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার এবং পরিকল্পিত হত্যা, নির্যাতন ও বহিষ্কারের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে বর্মী সরকার চেষ্টা করছে। এছাড়া রোহিঙ্গারা নিজ নিজ গ্রাম বা বসতি থেকে সুনির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া যেতে পারে না। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেকার জেনারেল নে উইনের একদলীয় সরকার এবং বর্তমান সামরিক সরকারের আচরণের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না বা নেই। এমন কি গণতন্ত্রপন্থীরা—যারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে চেষ্টা করছে, তারা ক্ষমতায় এলেও রোহিঙ্গা-পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না।

এমতাবস্থায় রোহিঙ্গা মুসলমানদের সামনে স্বাধীনতা অর্জন বা কালের প্রবাহে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। তাই আরাকানী মুসলমানরা তাদের মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু বাইরের কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত এ যুদ্ধে জয়লাভ করার সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় বার্মার সাথে শত্রুতা এড়াতে বাংলাদেশ সরকারের অনড় মনোভাব দৃষ্টে এবং চলমান বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রোহিঙ্গা-নেতাদের অনেকে আরাকানকে রোহিঙ্গাদের জন্যে নিরাপদ এলাকায় পরিণত করাকে সমস্যার আপাততঃ সমাধান বলে মনে করছেন। এ জন্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নিশ্চয়তা প্রয়োজন। তেমনি বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের আরাকানে স্থায়ী প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রেও জাতিসংঘের উদ্বাস্তু হাইকমিশনের তদারকীই যথেষ্ট নয়, বরং নিরাপত্তা পরিষদের গ্যারান্টি ও তত্ত্বাবধান তথা আরাকানকে নিরাপদ এলাকা ঘোষণা অপরিহার্য। এ জন্যে বিষয়টি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে উত্থাপন করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ভৌগলিক অখণ্ডত্ব এবং আর্থ-সামাজিক স্বার্থের জন্যে আরাকানের স্বাধীনতা অপরিহার্য। কারণ, বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে কয়েক বছর পর পরই বাংলাদেশকে রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। অন্যদিকে অংশতঃ হলেও চট্টগ্রাম এক সময় আরাকানের অংশ ছিল।[১৪] এ ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রায় গোটা চট্টগ্রাম এলাকার ওপর বার্মার দাবী রয়েছে। ১৯৭৮-এ তিন লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার পর রেঙ্গুনের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশ-বিরোধী যে প্রচার চালানো হয় তাতে এ দাবী উত্থাপন করা হয়।[১৫]

www.pathagar.com

বার্মা জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশের সামান্য বেশী। কিন্তু তার সামরিক শক্তি বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশী। বিশেষভাবে ১৯৯১-এ রোহিঙ্গা বিতাড়ন অভিযানকালে বার্মা তার সামরিক শক্তি অনেক বৃদ্ধি করেছে যা বাংলাদেশের জন্যে হুমকিস্বরূপ। বিশেষ করে চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা বার্মার মানবতাবিরোধী সামরিক সরকারের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি করেছে। এমতাবস্থায় বার্মার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশের ভৌগলিক অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্যে একদিকে স্বীয় সামরিক শক্তিকে প্রয়োজনীয় পর্যায়ে বৃদ্ধি করা, অন্যদিকে আরাকান সমস্যার আন্তর্জাতিকীকরণ অপরিহার্য।

## সিনকিয়াং

সিনকিয়াং-এর মুসলমানদের সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, চীনের কম্যুনিস্ট শাসনের লৌহপ্রাচীর অতিক্রম করে কদাচিত সঠিক খবর বাইরে আসতে পারে। তাই সিনকিয়াং-এর মুসলমানদের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধেও কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পাশ্চাত্য সূত্র থেকে যেসব খবর পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করলে দু'টি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রথমতঃ সিনকিয়াং-এর মুসলিম জনগণ হান চীনদের দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত বিধায় তারা চীনের ওপর অসন্তুষ্ট এবং চীনা শাসন থেকে স্বাধীন হতে চায়। দ্বিতীয়তঃ একটি সংঘবদ্ধ গেরিলা গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধ চালাচ্ছে। তবে এ গেরিলা গোষ্ঠীর সংখ্যাশক্তি খুব বেশী বলে মনে হয় না। তেমনি তাদের অস্ত্রশস্ত্রের মান এবং পরিমাণও চীনের মত পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া তারা নিয়মিত নয়, মাঝে মাঝে

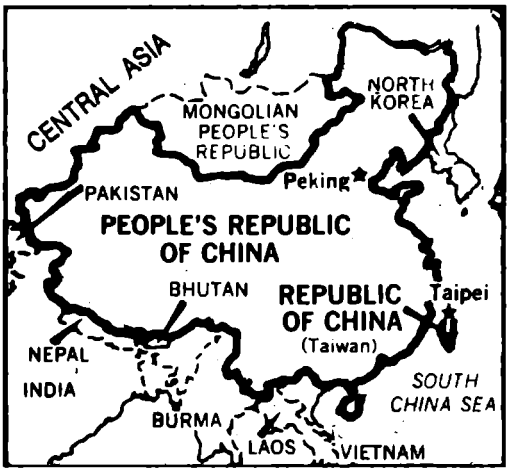

www.pathagar.com

হামলা চালাচ্ছে। এ সত্ত্বেও ভবিষ্যতে কখনো কার্যকর যুদ্ধের পরিবেশ তৈরী হবার আশায় গেরিলা-হামলা ধীর গতিতে হলেও অব্যাহত রেখেছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৪ সালে সিনকিয়াং-এর উইগূর বংশোদ্ভুত মুসলমানরা পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র নাম দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু খুব শীঘ্রই মস্কোতে অধ্যায়নকারী কমরেড সাইফুদ্দীন প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী ও পরে প্রেসিডেন্ট পদ দখল করতে সক্ষম হন। এরপর ১৯৪৯ সালে চীনে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সফল হলে তিনি সিনকিয়াং কে চীনের সাথে একীভূত করেন। অতঃপর প্রতিরোধকারী মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করেই চীন সরকার ক্ষান্ত থাকে নি, বরং ভবিষ্যতে যাতে ১৯৪৪-এর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে সে লক্ষ্যে সিনকিয়াং-এ ব্যাপকভাবে হান চীনাদের পুনর্বাসন শুরু করে।

কোন কোন সূত্র মতে, ইতিমধ্যেই সিনকিয়াং-এ হান চীনারা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৫৩ সালে চীনাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৬ ভাগ, ১৯৯০ সালে দাঁড়ায় শতকরা ৫৩ ভাগে। প্রতিদিন গড়ে ৭ হাজার চীনা সিনকিয়াং-এ প্রবেশ করছে ও বসতি স্থাপন করেছে। চীন সরকার বিশালায়তন ও তেলসমৃদ্ধ সিনকিয়াং-এ দশ কোটি চীনাকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে মুসলমানদের সংখ্যাশক্তি হ্রাস করার লক্ষ্যে জবরদস্তিমূলক একসন্তান-নীতি ও মিশ্রবিবাহ কার্যকরকরণ অব্যাহত রেখেছে। অথচ চীনা দম্পতিদের জন্য দুই সন্তান অনুমোদিত এবং মিশ্র দম্পতিদের সন্তানদের বাধ্যতামূলকভাবে চীনা নামসহ চীনাদের স্কুলে ভতি করা হয়।[১৬] সিনকিয়াং-এর মুসলমানদের মধ্যে চীন-বিরোধী মনোভাব অব্যাহত থাকার প্রধান কারণ এটাই।

বর্তমানেও সিনকিয়াং-এ শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নতৎপরতা সূত্রে হান চীনাদের পুনর্বাসন ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম চাষীদের জমির পরিমাণ দশমিক ৪৮ হেক্টর থেকে কমিয়ে দশমিক ২৮ হেক্টর করা হয়েছে।[১৭] এভাবে তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকেও কঠোর চাপের মধ্যে রাখা হয়েছে।

সিনকিয়াং-এর মুসলিম গেরিলারা যাতে পার্শ্ববর্তী দেশ তাজিকিস্তানে আশ্রয় নিতে না পারে সে লক্ষ্যে চীন সরকার তাজিকিস্তানের কম্যুনিস্ট সরকারের সাথে তথাকথিত সশস্ত্র মৌলবাদী দস্যু ও সন্ত্রাসী দমনে সহযোগিতার জন্যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া সীমান্ত এলাকায় দুই লক্ষাধিক সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে এবং লাখ লাখ মুসলমানকে উৎখাত করা হয়েছে।

তবে তাজিকিস্তানে সরকার ও ইসলামপন্থীদের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত ও যৌথ কমিশন গঠিত হবার পর সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে সেখানে ইসলামী সরকার গঠিত হলে সিনকিয়াং-এর মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

## থাইল্যান্ড

থাইল্যান্ডের মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে ২২ লাখ, ৪০ লাখ এবং সোয়া এক কোটি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের পাঁচটি প্রদেশে বিপুল সংখ্যক মুসলমান বসবাস করে। এক সময় এখানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল। পরে তা থাই বৌদ্ধ রাজাদের দখলে চলে যায়।

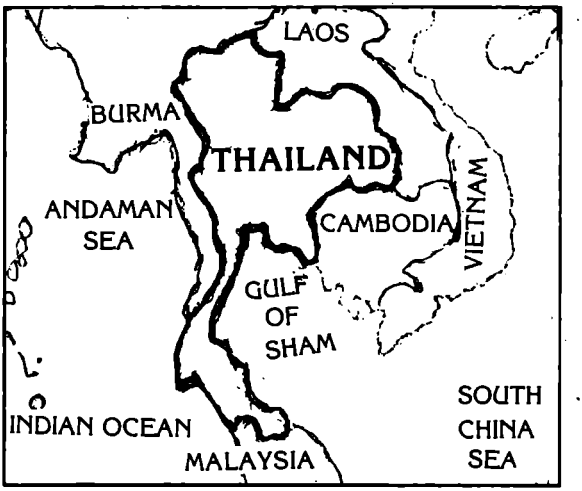


১৯৪৭ সালে প্রথম বারের মত দক্ষিণ থাই-ল্যান্ডের মুসলিম নেতারা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেন। তবে তা বেশী দূর এগোয় নি। পরে ১৯৬৮ সালে পাত্তানী ইউনাইটেড মুসলিম লিবারেশন অর্গানাইযেশন (পিইউএমএলও) গঠিত হয় এবং স্বাধীন পাত্তানী রাষ্ট্র গড়ার জন্যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধ এখনো অব্যাহত রয়েছে। তবে বাইরের সহায়তা না পাওয়ায় এবং থাই মুসলমানদের চেতনার অভাবে ও অন্য কতক কারণে তা তীব্র আকার ধারণ করতে পারে নি। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের মধ্যে কর্মপদ্ধতিগত মতপার্থক্য।

থাইল্যান্ডের মুসলমানরা কিছু কিছু বিষয়ে (যেমন ঃ ক্ষেত্রবিশেষে আরবী ভাষায় নাম রাখতে না দেয়া) চাপের মধ্যে থাকলেও সার্বিকভাবে মোটামুটি স্বাধীন। তাই সাম্প্রতিককালে অনেকে দক্ষিণ থাইল্যান্ডের স্বাধীনতার পরিবর্তে সমগ্র থাইল্যান্ডে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের পক্ষপাতী। বিশেষ করে উত্তর থাইল্যান্ডের মুসলমানরা এ ধারণারই সমর্থক। ফলে পাত্তানীর স্বাধীনতাযুদ্ধ তেমন তীব্র হয়ে উঠছে না।

## ফিলিপাইন

দক্ষিণ ফিলিপাইনের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে।

ফিলিপাইনের মুসলমানরা দীর্ঘ তিন শ' বছর স্পেনীয় দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়েছে। একারণেই স্পেনীয়দের পক্ষে তাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত

www.pathagar.com

করা সম্ভব হলেও স্পেনের মত নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় নি। এরপর তারা আমেরিকান দখলদারদের বিরুদ্ধেও ৪০ বছর যাবত যুদ্ধ করেছে।

ফিলিপাইন স্বাধীন হবার পর মুসলমানরা খৃস্টান সংখ্যাগুরুদের সাথে মিলেমিশে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদেরকে তাদের ঈমানী চেতনা বিরোধী কাজে ব্যবহারের জন্যে চেষ্টা করা হলে তারা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে ও স্বাধীনতার দাবী তোলে।

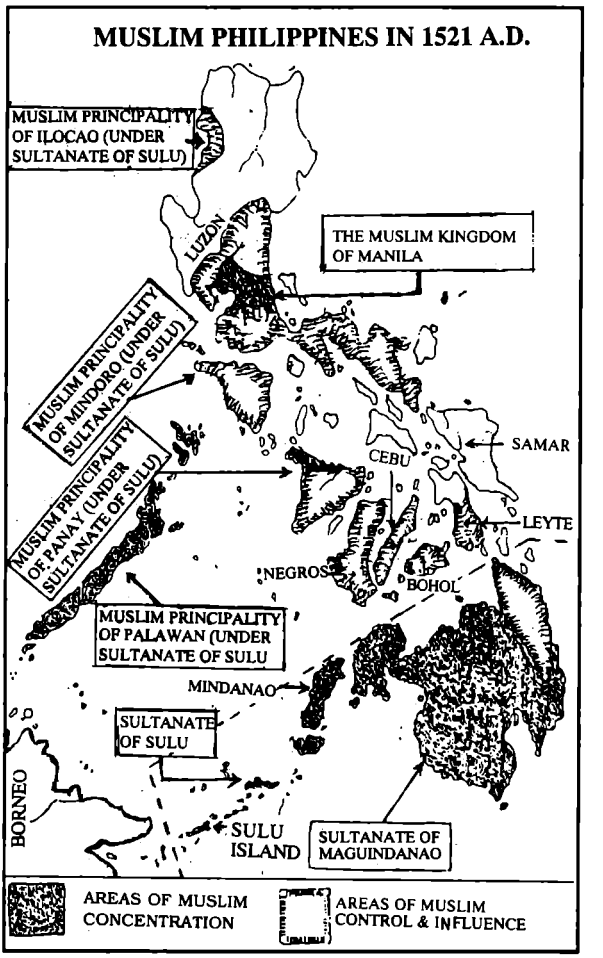


১৯৬৯ সালে ফিলিপাইনের সামরিক একনায়ক ফার্দিনান্দ মার্কোস মালয়েশিয়ায় নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর পদক্ষেপ নেন। তিনি মুসলমানদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে প্রশিক্ষণের পর নাশকতার জন্যে মালয়েশিয়ার অরণ্যে পাঠান। মরো মুসলমানরা একটি ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে অস্বীকৃতি জানায়। এ কারণে মুসলমান সৈন্যদের হত্যা করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় অধ্যাপক নূর মিসুয়ারীর নেতৃত্বে দক্ষিণ ফিলিপাইনের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

অধ্যাপক নূর মিসুয়ারীর নেতৃত্বে মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (এমএনএলএফ)-এর মুক্তিযুদ্ধে কর্নেল গাদ্দাফীর শাসনাধীন লিবিয়া সাহায্য করায় মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হয়। এমতাবস্থায় ওআইসি-র মধ্যস্থতায় ফিলিপাইন সরকার ও এমএনএলএফ-এর মধ্যে

www.pathagar.com

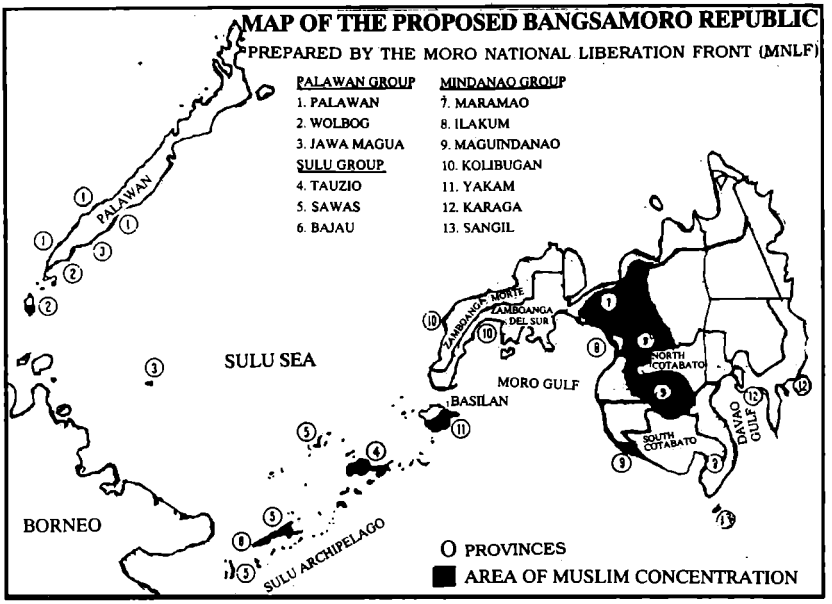


আলোচনা ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিমধ্যে যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে ম্যানিলা-সরকার দক্ষিণ ফিলিপাইনে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং চুক্তি অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন দেয়ার পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগে দক্ষিণ ফিলিপাইনে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ফলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে এবং এতে হাজার হাজার লোক নিহত হয়।

পরবর্তী সময়ে আলোচনা ও যুদ্ধ পাশাপাশি চলতে থাকে। এরপর মার্কোসের স্বৈরশাসন উৎখাত ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভবিষ্যত কর্মকৌশল প্রশ্নে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। একদল মনে করেন যে, দক্ষিণ ফিলিপাইনকে স্বাধীন করার পরিবর্তে নতুন পরিস্থিতিতে সমগ্র ফিলিপাইনে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের এবং সারা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। এঁরা অস্ত্র ত্যাগ করে প্রচারমূলক কাজে মনোনিবেশ করেন। অন্যরা মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত রাখেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অধ্যাপক নূর মিসুয়ারীর নেতৃত্বাধীন মূলধারা মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে নূর মিসুয়ারীর নেতৃত্বাধীন মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (এমএনএলএফ) থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট (এমআইএলএফ) গঠন করে এবং পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচনা বর্জন করে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে।

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬-র সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ ফিলিপাইনের ১৩টি প্রদেশ নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠনের চুক্তি হয়। নূর মিসুয়ারী এ অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। কিন্তু হাসেম সালামতের নেতৃত্বাধীন এমআইএলএফ স্বাধীনতার দাবীতে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। তবে স্বাভাবিকভাবেই সংঘর্ষের তীব্রতা হ্রাস পায়।

কিন্তু ১৯৯৯-র দ্বিতীয়ার্ধে এমআইএলএফ-এর তৎপরতা নতুন করে বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকারী বাহিনী ও এমআইএলএফ-গেরিলাদের মধ্যে যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে এমআইএলএফ কিছুসংখ্যক বিদেশীকে পণবন্ধী করলে একদিকে যেমন যুদ্ধ আরো তীব্রতর হয়, অন্যদিকে আলোচনার ক্ষেত্রও তৈরী হতে থাকে। এমআইএলএফ প্রথমে বেশ সাফল্যের অধিকারী হলেও পরে যুদ্ধে বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সরকারী সূত্রের দাবী অনুযায়ী, ১৯৯৯-র ডিসেম্বরে যেখানে এমআইএলএফ-এর গেরিলা যোদ্ধা সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৬০০ জন সেখানে ২০০০-এর জুলাই-র মাঝামাঝি তা হ্রাস পেয়ে মাত্র ৫০০০-এ দাঁড়ায়।[১৯]

এমআইএলএফ প্রথমে স্বাধীনতার প্রশ্নে অনড় থাকলেও পরে বর্ধিত স্বায়ত্তশাসনে রাযী হয় এবং এজন্য ২০০০-এর জুনের চতুথ সপ্তাহে সরকারের সাথে আলোচনায় বসে।[২০] তবে সংঘর্ষের পুরোপুরি অবসান হয় নি।

১৯৯৭-র শুরুর দিক পর্যন্ত ফিলিপাইনের মুক্তিযুদ্ধে মোট দুই লাখ মুসলমান নিহত হয়। এছাড়া ৩০ লাখ মুসলমান দেশত্যাগ করে মালয়েশিয়ার সাবাহ্ প্রদেশে আশ্রয় নেয়।[২১]

অধ্যাপক নূর মিসুয়ারীকে তিন বছরের জন্য দক্ষিণ ফিলিপাইনের আঞ্চলিক প্রশাসকের দায়িত্ব দেয়া হয় যার মেয়াদ ১৯৯৯-র শেষ নাগাদ শেষ হয়। এরপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতেও তিনি জনগণের রায় লাভ করে আঞ্চলিক গভর্নর নির্বাচিত হন।

অধ্যাপক নূর মিসুয়ারীর সাফল্যের ওপরে নির্ভর করছে দক্ষিণ ফিলিপাইনে মুক্তিযুদ্ধের পুরোপুরি অবসান হবে কিনা। আর তাঁর সাফল্য নির্ভর করছে ম্যানিলা-সরকারের আন্তরিকতার ওপর। অবশ্য এমআইএলএফ-এর অস্তিত্ব ও চাপ ম্যানিলা-সরকারকে দক্ষিণ ফিলিপাইনের সমস্যাবলীর সমাধান ও উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে অধিকতর যত্নবান করে তুলতে পারে।

## পাদটীকা ঃ

১) *Manifesto of Arakan Rohingya Islamic Front*, Arakan, 2nd Edition, P.1

www.pathagar.com

২) প্রাগুক্ত সূত্র (পৃঃ২) অনুযায়ী বার্মার মোট মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৮০ লাখ। অন্যদিকে আরাকানের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪০ লাখ। এদের মধ্যে রোহিঙ্গারা ছিল শতকরা ৬৯ ভাগ। বাকী ৩১ ভাগের মধ্যে রাখাইন (মগ) ছিল ২৬ ভাগ এবং অন্যান্য উপজাতি ৫ ভাগ। সে হিসেবে ঐ সময় রোহিঙ্গা মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২৭ লাখ ৬০ হাজার। উক্ত সূত্র অনুযায়ী তখন পর্যন্ত বাইরে বিতাড়িতদের সংখ্যা ছিল ১৫ লাখ। তাদেরকে বাদ দিয়ে মুসলিম ও অমুসলিম সংখ্যা প্রায় সমান সমান দাঁড়িয়েছিল। উক্ত জনসংখ্যা আশির দশকের শেষ দিককার। সে হিসেবে শতাব্দীশেষে বার্মার মোট মুসলিম জনসংখ্যা সাড়ে ৯৬ লাখে দাঁড়াবে। এদের মধ্যে অ-আরাকানী হবে ৬০ লাখের ওপরে। আরাকানীদের মধ্যে ( পরবর্তীকালীন বিতাড়িতগণসহ) বাইরে অবস্থানরতদের সংখ্যা দাঁড়াবে সাড়ে ১৮ লাখের মত এবং আরাকানে অবস্থানরতদের সংখ্যা দাঁড়াবে আনুমানিক সাড়ে ১৬ লাখে।

৩) প্রাগুক্ত— পৃঃ ৮

৪) পাক্ষিক পালাবদল ঃ ১ম বর্ষ ১৭তম সংখ্যা ঃ ১-১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

৫) প্রাগুক্ত

৬) *Manifesto of Arakan Rohingya Islamic Front*, P.2. উল্লেখ্য, এ সংখ্যা ১৯৯১-৯২-এর সর্বশেষ বিতাড়নের পূর্বেকার। এ দফায় ২ লাখ ৬৫ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়। তাদের মধ্যে অন্ততঃ ৩০/৩৫ হাজার লোক শরণার্থীশিবির থেকে সরে পড়ে বা আদৌ শিবিরে যায় নি। এছাড়া ১৯৯৯-র মাঝামাঝি পর্যন্ত আরো ২২ হাজার জন শরণার্থীশিবিরে রয়ে যায়। (বাকীদেরকে প্রত্যাবাসন করা হয়।)

৭) পালাবদল ঃ ১-১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

৮) *Manifesto of Arakan Rohingya Islamic Front*, P.15

৯) Telegraph: 7-11-1993

১০) পালাবদল ঃ ১-১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

১১) Bangladesh Today: Vol. 2, issue 1 & 2, April 1-30, 1984

১২) প্রাগুক্ত

১৩) *Manifesto of Arakan Rohingya Islamic Front*, P.15

১৪) পালাবদল ঃ ১-১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

১৫) ঐ সময় সাপ্তাহিক জাহানে নও-এ এ সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল।

১৬) *The Spread of Islam*. P. 495

১৭) Ibid.

১৮) Ibid. P. 484

১৯) AFP/Financial Express : 25-7-2000

২০) এপি/ সংগ্রাম ঃ ৩-৬-২০০০

২১) ইত্তেফাক ঃ ৮-৩-১৯৯৭। ১৯৯৭-র মার্চ হতে ২০০০ সালের জুলাই পর্যন্ত কম পক্ষে আরো দশ হাজার নিহত হয়ে থাকলে (F. Express : 25-7-2000) মোট নিহতের সংখ্যা দুই লাখ দশ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা ঃ একটি সমীক্ষা

সংখ্যা বড় কথা নয়, গুণগত মানই বড় কথা। এটা অনস্বীকার্য। তবে সংখ্যার তুলনায় গুণের গুরুত্ব অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যা কিছুই নয়, সংখ্যার কোন মূল্য নেই—এমনটি নিশ্চয়ই কেউ দাবী করবেন না। স্বয়ং সংখ্যাও একটি গুণ; সংখ্যা অনেক সময় অন্য গুণাবলীর অভাবের কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে সক্ষম হয়। তাই নিঃসন্দেহে সংখ্যা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সংখ্যা হচ্ছে শক্তির প্রতীক। এই পারমাণবিক যুগেও জনসংখ্যার সামরিক গুরুত্ব হ্রাস পায় নি। বরং পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারীরাই এ অস্ত্রের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্য হাসিলের জন্যে গলদঘর্ম হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে যুদ্ধে, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে, জনশক্তি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। আর তাতে শুধু যোদ্ধা হিসেবেই নয়, যোদ্ধাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যেও জনসংখ্যার গুরুত্ব অনেক। বসনিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা ২০ লাখ না হয়ে এক কোটি ২০ লাখ হলে হয়তো বসনিয়ার জাতিগত গৃহযুদ্ধ সংঘটিতই হত না। তেমনি চেচনিয়ার জনগণ যে বীরত্ব দেখিয়েছে তাতে সেখানকার জনসংখ্যা সাড়ে এগার লাখ না হয়ে এক কোটি হলে সম্ভবতঃ তাদের স্বাধীনতা ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন ও বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃত হত। ।

জনসংখ্যার রাজনৈতিক গুরুত্বও অনেক। এই গুরুত্বের কারণেই নাইজেরিয়ায় খৃষ্টানদেরকে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার লক্ষ্যে ক্রুসেডার-বিশ্বের খৃস্টান মিশনারীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইরিত্রিয়ার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরিণতিতে ইথিওপিয়ার মত বিরাট দেশে মুসলমানদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফ্রান্সে ফরাসী খৃস্টানদের সংখ্যার ক্রমহ্রাস ও সেখানকার মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত ক্রমবৃদ্ধি দেশটির মুসলিম-বিদ্বেষীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিশেষভাবে বিশ্বে মুসলমানদের অনুপাতে শ্বেতাঙ্গ খৃস্টানদের হারের দ্রুত হ্রাসপাপ্তি পাশ্চাত্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সমাজতাত্ত্বিকদের দুর্ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। তাঁরা শ্বেতাঙ্গ জনশক্তি বৃদ্ধির জন্যে আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা প্রদানসহ বহুবিধ পন্থায় উৎসাহ প্রদান করে চলেছেন এবং তৃতীয় বিশ্বের, বিশেষতঃ মুসলিম দেশসমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিকে শ্লথ করার জন্যে অঢেল অর্থ ব্যয় করছেন।

মোদ্দা কথা, জনসংখ্যার তুলনায় গুণগত মানের গুরুত্ব যে অনেক বেশী তা স্বীকার করেও বলা যায় যে, জনসংখ্যা যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী। তাই অনেকের মনেই বিভিন্ন দেশের মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা রয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যথাযথ ও সমন্বিত তথ্যের খুবই অভাব রয়েছে। ফলে বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে অস্পষ্টতার

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যা কেউ বলেন একশ' কোটি, কেউ বলেন সোয়াশ' কোটি, কেউ আরো বেশী বলেন। ফলে অনেকের নিকটই ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হয়। বিশেষ করে অমুসলিম-প্রধান দেশসমূহের সংখ্যালঘু মুসলমানদের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি অনেক বেশী। শুধু তা-ই নয়, মুসলিম-সংখ্যাগুরু দেশের জনসংখ্যা নিয়েও বিভ্রান্তি কম নয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র সদস্য কোন কোন আফ্রিকান দেশ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে মুসলিম জনসংখ্যার হার শতকরা ৫০-এর বেশ নীচে দেখা যাচ্ছে। (হয়ত খৃস্টান ও প্রকৃতিপূজারীদের মোকাবিলায় মুসলমানরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে থাকবে।)

বিশ্বের খুব কমসংখ্যক দেশেই নিয়মিত জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান রাখা হয়। এ জন্যে প্রয়োজনীয় সিস্টেমেটিক তথ্যসংগ্রহ ও বিন্যাস কাঠামো অনেক দেশেই নেই। যেসব দেশে প্রতিটি নাগরিকের জন্যে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ ও জাতীয়তা-সনদ বহন বাধ্যতামূলক সেসব দেশে জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি মোটামুটি নিখুঁতভাবে মওজূদ থাকে এবং সরকারের পক্ষে শুধু এর ভিত্তিতেও কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান বের করা সম্ভবপর। কিন্তু বাংলাদেশের মত যেসব দেশে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ বা জাতীয়তা-সনদ বহন বাধ্যতামূলক নয় সেসব দেশে এভাবে পরিসংখ্যান সংগ্রহ সম্ভব নয়। এ ধরনের দেশসমূহে জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের ব্যাপারে শুধু আদমশুমারীর ওপরে নির্ভর করতে হয়।

কিন্তু আদমশুমারীর ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা ও দুর্বলতা পরিদৃষ্ট হয়। ফলে এ থেকে কখনোই পুরোপুরি সঠিক অবস্থা জানা যায় না; মোটামুটিভাবে সঠিক অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছা যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে তাতে পরিবর্তন সাধন করা হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে অনেক দেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে এরূপটি ঘটছে।

আমাদের প্রতিবেশী ভারতের মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। সেখানকার মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে শতকরা ৮ ভাগ, ১২ ভাগ, ১৫ ভাগ ও ২০ ভাগ বলে দাবী করা হয়েছে। এমন কি শতকরা ২৫ ভাগের উল্লেখও দেখা যায়। তেমনি বিভ্রান্তি রয়েছে বার্মা, চীন, রাশিয়া, মেসিডোনিয়া, থাইল্যান্ড, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া এবং আরো অনেক দেশের মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে। কোন কোন দেশের মোট জনসংখ্যা সম্বন্ধেও বিভ্রান্তি রয়েছে।

জাতিসংঘভিত্তিক একটি দলীলে নাইজেরিয়ার জনসংখ্যা ১৯৯০ সালে ১১ কোটি ৩ লাখ ৪৩ হাজার ছিল বলে অনুমিত হয়েছে। কিন্তু 'দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এ্যাটলাস ১৯৯৪'-এ ১৯৯২ সালে একই দেশের জনসংখ্যা ১০ কোটি ১৮ লাখ ৮৪ হাজার উল্লেখ

www.pathagar.com

করা হয়েছে, যদিও নাইজেরিয়া উচ্চ জনসংখ্যাবৃদ্ধিহারের দেশ এবং এই দ্বিতীয়োক্ত দলিলেও নাইজেরিয়ার বার্ষিক জনসংখ্যাবৃদ্ধিহার শতকরা ২ দশমিক ৯ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রের ভিত্তিতে সাপ্তাহিক 'এসিয়াউইক'-এর ৫ই জানুয়ারী ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত পরিসংখ্যানে নাইজেরিয়ার জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে মাত্র ১০ কোটি, যদিও বৃদ্ধিহার অভিন্ন অর্থাৎ শতকরা ২ দশমিক ৯ দেখানো হয়েছে।

এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে হিসাব-নিকাশ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিম জনসংখ্যা বের করার প্রয়াস পেয়েছি। এক্ষেত্রে শুধু সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে সূত্রবিহীন পরিসংখ্যান উল্লেখের পরিবর্তে বিশেষজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের প্রয়োজনও যাতে পূরণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে, সূত্র উল্লেখ ও পরিসংখ্যান নির্ণয়ের প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশেষ নোটসহ চার্ট আকারে তথ্যাবলী উপস্থাপনকেই সঙ্গত মনে করেছি। অবশ্য তথ্য সংগ্রহ করতে না পারায় অনেকগুলো দেশের মুসলিম সংখ্যালঘু জনসংখ্যা উল্লেখ করা যায় নি। তবে এতে কোন বড় মুসলিম জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশ বাদ পড়ে নি। তাই এ ধরনের ঘাটতির ফলে মোট ফল তেমন একটা প্রভাবিত হয় নি এটা নিশ্চয়তার সাথে বলা চলে।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যে বিন্যাসগত দুর্বলতার কারণে তা ব্যবহার করা যায় নি। যেমন ঃ তিনটি বাল্টিক প্রজাতন্ত্রে—লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ায় ১৯৯২ সালে মোট ২০ হাজার মুসলমান ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোন্ দেশে কত তা উল্লেখ নেই বিধায় তা চার্টের অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি।

দাক্ষিণ আমেরিকান দেশ ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট পদে কিছুদিন আগেও একজন মুসলমান অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু দেশটির মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাওয়া যায় নি।

আর্মেনিয়ায় ১৯৯০ সালে দশ হাজার মুসলমান ছিল। কিন্তু নগোর্নো-কারাবাগ নিয়ে আর্মেনিয়া ও আযারবাইজানের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় সে সময় আর্মেনিয়ার মুসলমানদের হত্যা ও বিতাড়িত করা হয় বলে কোন কোন সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এর পরেও সেখানে কিছু মুসলমান আছে কি? এ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তাই চার্টে আর্মেনিয়া প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছি।

সাবেক বৃটিশ শাসনাধীন হংকং-এ লক্ষাধিক মুসলমান রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে হংকং চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় স্বতন্ত্রভাবে হংকং-এর উল্লেখ বাদ দিয়েছি। এ ধরনের আরো কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে।

www.pathagar.com

যা-ই হোক, সামগ্রিকভাবে তথ্যসূত্রসমূহের দুর্বলতা সত্ত্বেও এ সমীক্ষা থেকে বিশ্বের ও বিভিন্ন দেশের মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি সঠিক ধারণা লাভ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, মুসলিম সংখ্যাগুরু ও ওআইসিভুক্ত দেশসমূহকে মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে। কিন্তু ওআইসি–বহির্ভূত অমুসলিম-প্রধান দেশসমূহকে মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে নয়, বরং মুসলিম জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা তয়েছে। এছাড়া চার্টে তথ্যসূত্র ও বিশেষ নোটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রমিক নম্বর দেয়া হয়েছে এবং পরে তা স্বতন্ত্রভাবে সংযোজিত করা হয়েছে। বিশেষ নোট-এ তথ্য সংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা অতিরিক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তথ্যসূত্রে যে বছরের জনসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তাকে ভিত্তি সাল হিসাবে ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারের ভিত্তিতে ২০০০ খৃষ্টাব্দের শেষের জনসংখ্যা অনুমিত হয়েছে। যেসব সূত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, সংশ্লিষ্ট দেশের জনসংখ্যা পরিসংখ্যানটি কোন্ বছরের সেক্ষেত্রে তথ্যটি প্রকাশ বা পরিবেশন কালের ভিত্তিতে ভিত্তিসাল ধরে নেয়া হয়েছে। অবশ্য সাধারণতঃ কোন বছরের জনসংখ্যা বলতে ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ের জনসংখ্যা বলে ধরে নিয়েছি। তবে যেখানে সুস্পষ্টভাবে বছরের শুরুর বা শেষের জনসংখ্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে আমরাও তাকে বছরের শুরুর বা শেষের জনসংখ্যা গণ্য করেছি। অন্যদিকে 'এসিয়াউইক'-এর সূত্রে বর্ণিত তথ্যাদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত সর্বশেষ তথ্য বলে দাবী করা হয়েছে; আমরাও সংশ্লিষ্ট তথ্যকে সেভাবেই নিয়েছি। এরপর বার্ষিক বৃদ্ধিহারের ভিত্তিতে ২০০০ খৃষ্টাব্দের শেষের সম্ভাব্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি।

www.pathagar.com

## ওআইসিভুক্ত ও মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশসমূহ

| ক্রমিক নং | দেশ | মহাদেশ | ভিত্তিসাল | জনসংখ্যা (হাজারে) | সূত্রনির্দেশ | বৃদ্ধির হার (শতকরা) | সূত্রনির্দেশ | ২০০০ সালের শেষে জনসংখ্যা (হাজারে) | মুসলিম জনসংখ্যা (শতকরা) | সূত্রনির্দেশ | ২০০০ সালের শেষে মুসলিম জনসংখ্যা (হাজারে) | সূত্রনির্দেশ | ২০০০ সালের শেষে অমুসলিম জনসংখ্যা (হাজারে) | সূত্রনির্দেশ | টীকানির্দেশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ইন্দোনেশিয়া | এশিয়া | ১৯৯৭ | ২০,২০,০০ | ৩৭ | ১.৬ | ৩ | ২১,৩৫,৪৭ | ৯০.০ | ২ | ১৯,২১,৯২ | ৫ | ২,১৩,৫৫ | ৫ | ১ |
| ২ | পাকিস্তান | " | ১৯৯৭ | ১৪,০০,০০ | ৩৮ | ২.৭ | ৩৮ | ১৫,১৬,৪৯ | ৯৭.০ | ২ | ১৪,৭০,৯৯ | ৫ | ৪৫,৫০ | ৫ | ২ |
| ৩ | বাংলাদেশ | " | ১৯৯৮ | ১২,৭২,০০ | ৩ | ২.২ | ৩ | ১৩,৪৩,২০ | ৮৮.৩ | ৩০ | ১১,৮৬,০৪ | ৫ | ১,৫৭,১৬ | ৫ | ৩ |
| ৪ | নাইজেরিয়া | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১১,৪৫,৬৮ | ১ | ২.৯ | ১ | ১৩,০৩,১০ | ৬৫.০ | ৩৯ | ৮,৪৭,০১ | ৫ | ৪,৫৬,০৯ | ৫ | ৪ |
| ৫ | ইরান | এশিয়া | ১৯৯৭ | ৬,৫০,০০ | ৩৭ | ২.৫ | ১ | ৭,২৬,৪৫ | ৯৮.৮ | ২ | ৭,১৭,৭৩ | ৫ | ৮,৭২ | ৫ | ৫ |
| ৬ | তুরস্ক | ইউরেশিয়া | ১৯৯৬ | ৬,২৬,৯৭ | ১ | ১.৪৭ | ৪০ | ৬,৬৯,৫৪ | ৯৯.০ | ২ | ৬,৬২,৮৪ | ৫ | ৬,৭০ | ৫ | |
| ৭ | মিসর | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৫,৯২,৭২ | ১ | ২.০ | ১ | ৬,৪৭,৯৯ | ৯৩.০ | ২ | ৬,০২,৬৩ | ৫ | ৪৫,৩৬ | ৫ | |
| ৮ | ইথিওপিয়া | " | ১৯৯৬ | ৫,৮২,৩৪ | ১ | ২.২ | ১ | ৬,২৮,৪৭ | ৬০.০ | ৪১ | ৩,৭৭,০৮ | ৫ | ২,৫১,৩৯ | ৫ | ৬ |
| ৯ | তাঞ্জানিয়া | " | ১৯৯৬ | ৩,০৪,৯৪ | ১ | ৩.০ | ১ | ৩,৪৮,৩৬ | ৫০.০ | ৮৪ | ১,৭৪,১৮ | ৫ | ১,৭৪,১৮ | ৫ | ৭ |
| ১০ | আলজেরিয়া | " | ১৯৯৬ | ২,৮৭,৩৪ | ১ | ২.৩ | ১ | ৩,১৮,৩২ | ৯৯.০ | ২ | ৩,১৫,১৪ | ৫ | ৩,১৮ | ৫ | |
| ১১ | সুদান | " | ১৯৯৬ | ২,৭২,৭২ | ১ | ২.১ | ১ | ২,৯৯,৪৭ | ৮১.০ | ৮৪ | ২,৪২,৫৭ | ৫ | ৫৬,৯০ | ৫ | ৮ |
| ১২ | মরোক্কো | " | ১৯৯৬ | ২,৭০,২০ | ১ | ১.৯ | ১ | ২,৯৪,১০ | ৭৯.০ | ২ | ২,৩২,৩৪ | ৫ | ৬১,৭৬ | ৫ | |
| ১৩ | আফগানিস্তান | এশিয়া | ১৯৯৬ | ২,৪১,৬৭ | ১ | ২.৮ | ১ | ২,৭৩,৬৭ | ১০০.০ | ২ | ২,৭৩,৬৭ | - | - | - | ৯ |
| ১৪ | উযবেকিস্তান | " | ১৯৯৬ | ২,৩২,২৮ | ১ | ২.১ | ১ | ২,৫৫,০৭ | ৯১.৭ | ৩৯ | ২,৩৩,৯০ | ৫ | ২১,১৭ | ৫ | ১০ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৫ | ইরাক | এশিয়া | ১৯৯৬ | ২,১৩,৬৬ | ১ | ২.৮ | ১ | ২,৪১,৯৫ | ৯৬.০ | ৪ | ২,৩২,২৭ | ৫ | ৯,৬৮ | ৫ | |
| ১৬ | মালয়েশিয়া | " | ১৯৯৮ | ২,১৯,০০ | ৩ | ২.৪ | ৩ | ২,৩২,৩৯ | ৫৫.০ | ২ | ১,২৭,৮১ | ৫ | ১,০৪,৫৮ | ৫ | ১১ |
| ১৭ | উগান্ডা | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১,৯৭,৪১ | ১ | ৩.২ | ১ | ২,২৭,৫০ | ২৭.০ | ৮৪ | ৬১,৪২ | ৫ | ১,৬৬,০৮ | ৫ | ১২ |
| ১৮ | সউদী আরব | এশিয়া | ১৯৯৮ | ১,৯৬,০০ | ৩ | ৪.৩ | ৩ | ২,১৭,৮০ | ৯৯.০ | ২ | ২,১৫,৬২ | ৫ | ২,১৮ | ৫ | |
| ১৯ | মোযাম্বিক | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১,৮০,২৮ | ১ | ৪.০ | ১ | ২,১৫,১২ | ৫২.০ | ৮৪ | ১,১১,৮৬ | ৫ | ১,০৩,২৬ | ৫ | ১৩ |
| ২০ | ঘানা | " | ১৯৯৬ | ১,৭৫,২২ | ১ | ২.৭ | ১ | ১,৯৭,৫৫ | ৫০.০ | ৪৪ | ৯৮,৭৮ | ৫ | ৯৮,৭৭ | ৫ | ১৪ |
| ২১ | ইয়েমেন | এশিয়া | ১৯৯৬ | ১,৫৭,৭৮ | ১ | ৪.৭ | ১ | ১,৯৪,০৬ | ৯৯.০ | ২ | ১,৯২,১২ | ৫ | ১,৯৪ | ৫ | |
| ২২ | সিরিয়া | " | ১৯৯৬ | ১,৪৫,০২ | ১ | ৩.০ | ১ | ১,৬৫,৬৭ | ৮৮.০ | ২ | ১,৪৫,৫৮ | ৫ | ২০,০৯ | ৫ | |
| ২৩ | আইভরি কোস্ট | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১,৪৩,৪৭ | ১ | ৩.০ | ১ | ১,৬৩,৮৯ | ৫০.০ | ৮৪ | ৮১,৯৫ | ৫ | ৮১,৯৪ | ৫ | ১৫ |
| ২৪ | কাজাকিস্তান | এশিয়া | ১৯৯৬ | ১,৬৪,৭১ | ১ | -০.৩ | ১ | ১,৬২,৫০ | ৫১.০ | ৩৯ | ৮২,৮৮ | ৫ | ৭৯,৬২ | ৫ | ১৬ |
| ২৫ | ক্যামেরুন | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১,৩৬,৭৬ | ১ | ২.৯ | ১ | ১,৫৫,৫৫ | ৫৫.০ | ৪২ | ৮৫,৫৫ | ৫ | ৭০,০০ | ৫ | |
| ২৬ | বুরকিনা ফাসো | " | ১৯৯৬ | ১,০৬,৬৯ | ১ | ২.৮ | ১ | ১,২০,৮২ | ৫০.০ | ৮৪ | ৬০,৪১ | ৫ | ৬০,৪১ | ৫ | ১৭ |
| ২৭ | মালী | " | ১৯৯৬ | ৯৯,৯৯ | ১ | ২.৮ | ১ | ১,১৩,২৩ | ৯০.০ | ২ | ১,০১,৯১ | ৫ | ১১,৩২ | ৫ | |
| ২৮ | মালাভী | " | ১৯৯৬ | ১,০০,১৬ | ১ | ২.৭ | ১ | ১,১২,৯৩ | ৫০.০ | ৪৮ | ৫৬,৪৭ | ৫ | ৫৬,৪৬ | ৫ | ১৮ |
| ২৯ | নাইজার | " | ১৯৯৬ | ৯৩,৩৫ | ১ | ৩.৩ | ১ | ১,০৮,০৫ | ৮৫.০ | ২ | ৯১,৮৪ | ৫ | ১৬,২১ | ৫ | |
| ৩০ | সোমালিয়া | " | ১৯৯৬ | ৯৮,০৫ | ১ | ২.১ | ১ | ১,০৭,৬৭ | ৯৯.০ | ২ | ১,০৬,৫৯ | ৫ | ১,০৮ | ৫ | |
| ৩১ | তিউনিসিয়া | " | ১৯৯৬ | ৯১,৩২ | ১ | ১.৯ | ১ | ৯৯,৪০ | ৯৮.০ | ২ | ৯৭,৪১ | ৫ | ১,৯৯ | ৫ | |
| ৩২ | সেনেগাল | " | ১৯৯৬ | ৮৫,৩৪ | ১ | ২.৫ | ১ | ৯৫,৩৮ | ৯৫.০ | ৮৪ | ৯০,৬১ | ৫ | ৪,৭৭ | ৫ | ১৯ |
| ৩৩ | আযারবাইজান | এশিয়া | ১৯৯৬ | ৭৫,৮১ | ১ | ১.০ | ১ | ৭৯,২৮ | ৮১.০ | ৫ | ৬৪,২২ | ৫ | ১৫,০৬ | ৫ | ২০ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৪ | গিনি | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৬৭,৫৯ | ১ | ২.৭ | ১ | ৭৬,২১ | ৮৫.০ | ২ | ৬৪,৭৮ | ৫ | ১১,৪৩ | ৫ | |
| ৩৫ | শাদ | " | ১৯৯৬ | ৬৬,১১ | ১ | ২.৫ | ১ | ৭৩,৮৯ | ৫০.০ | ৭০ | ৩৬,৯৫ | ৫ | ৩৬,৯৪ | ৫ | ২১ |
| ৩৬ | তাজিকিস্তান | এশিয়া | ১৯৯৬ | ৫৯,২৭ | ১ | ১.৯ | ১ | ৬৪,৫১ | ৯২.৪ | ৩৯ | ৫৯,৬১ | ৫ | ৪,৯০ | ৫ | |
| ৩৭ | বেনিন | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৫৬,৩২ | ১ | ২.৯ | ১ | ৬৪,০৬ | ৫০.০ | ৮৪ | ৩২,০৩ | ৫ | ৩২,০৩ | ৫ | ২২ |
| ৩৮ | লিবিয়া | " | ১৯৯৬ | ৫১,৬৭ | ১ | ২.৫ | ১ | ৫৭,৭৫ | ৯৭.০ | ২ | ৫৬,০২ | ৫ | ১,৭৩ | ৫ | |
| ৩৯ | তুর্কমানিস্তান | এশিয়া | ১৯৯৬ | ৪৫,৯৮ | ১ | ৩.৮ | ১ | ৫৪,৩৯ | ৯০.৫ | ৩৯ | ৪৯,২২ | ৫ | ৫,১৭ | ৫ | |
| ৪০ | জর্দান | " | ১৯৯৬ | ৪৩,১২ | ১ | ৫.১ | ১ | ৫৩,৯৫ | ৯৫.০ | ২ | ৫১,২৫ | ৫ | ২,৭০ | ৫ | |
| ৪১ | সিয়েরা লিওন | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৪৬,৩০ | ১ | ২.৪ | ১ | ৫১,৫২ | ৮০.০ | ৩৯ | ৪১,২২ | ৫ | ১০,৩০ | ৫ | ২৩ |
| ৪২ | তোগো | " | ১৯৯৬ | ৪২,৩০ | ১ | ৩.০ | ১ | ৪৮,৩২ | ৫০.০ | ৮৪ | ২৪,১৬ | ৫ | ২৪,১৬ | ৫ | ২৪ |
| ৪৩ | লেবানন | এশিয়া | ১৯৯৬ | ৪০,৭৯ | ১ | ১.৯ | ১ | ৪৭,৪৯ | ৭০.০ | ৪৫ | ৩৩,২৪ | ৫ | ১৪,২৫ | ৫ | ২৫ |
| ৪৪ | কিরগিজিস্তান | " | ১৯৯৬ | ৪৫,৭৫ | ১ | ০.৭ | ১ | ৪৭,২২ | ৭৩.৬ | ৩৯ | ৩৪,৭৫ | ৫ | ১২,৪৭ | ৫ | |
| ৪৫ | বসনিয়া-হার্যেগোভিনা | ইউরোপ | ১৯৯২ | ৪৩,৮৩ | ১ | ০.২ | ১ | ৪৪,৫৮ | ৪৩.০ | - | ১৯,১৭ | ৫ | ২৫,৪১ | ৫ | ২৬ |
| ৪৬ | ইরিত্রিয়া | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৩৬,৯৮ | ১ | ২.৭ | ১ | ৪১,৬৯ | ৭০.০ | ৪১ | ২৯,১৮ | ৫ | ১২,৫১ | ৫ | |
| ৪৭ | ফিলিস্তিন | এশিয়া | ১৯৯২ | ৩৫,০০ | ৫ | ৩.০ | - | ৩৯,৯৮ | ৮৭.৯২ | ৫ | ৩৫,১৫ | ৫ | ৪,৮৩ | ৫ | ২৭ |
| ৪৮ | মধ্যআফ্রিকা প্রঃ | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৩৩,৪৪ | ১ | ২.২ | ১ | ৩৬,৮৮ | ৫০.০ | ৮৪ | ১৮,৪৪ | ৫ | ১৮,৪৪ | ৫ | ২৮ |
| ৪৯ | আলবেনিয়া | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৩২,৮৬ | ১ | ০.০ | ১ | ৩২,৮৬ | ৭৯.০ | ৮৪ | ২৯,২৫ | ৫ | ৩,৬১ | ৫ | ২৯ |
| ৫০ | আরব আমিরাত | এশিয়া | ১৯৯৬ | ২৫,৩২ | ১ | ৫.৩ | ১ | ৩১,৯৫ | ৯৬.৭ | ২ | ৩০,৯০ | ৫ | ১,০৫ | ৫ | ৩০ |
| ৫১ | ওমান | " | ১৯৯৬ | ২১,৭৩ | ১ | ৪.৮ | ১ | ২৬,৮৪ | ৯৯.০ | ২ | ২৬,৫৭ | ৫ | ২৭ | ৫ | |
| ৫২ | মাওরিতানিয়া | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ২৩,৩২ | ১ | ২.৫ | ১ | ২৬,০৬ | ১০০.০ | ৪৬ | ২৬,০৬ | - | - | - | |

www.pathagar.com

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫৩ | মেসিডোনিয়া | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ১৯,৮০ | ১ | ০.৭ | ১ | ২০,৪৩ | ৬০.০ | ১১ | ১২,২৬ | ৫ | ৮,১৭ | ৫ | ৩১ |
| ৫৪ | কুয়েত | এশিয়া | ১৯৯৬ | ১৫,৯০ | ১ | ৩.০ | - | ১৮,১৬ | ৯২.০ | ৪ | ১৬,৭১ | ৫ | ১,৪৫ | ৫ | ৩২ |
| ৫৫ | গাম্বিয়া | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১১,৪৭ | ১ | ৩.৭ | ১ | ১৩,০৩ | ৯০.০ | ২ | ১১,৭৩ | ৫ | ১,৩০ | ৫ | |
| ৫৬ | গ্যাবন | " | ১৯৯৬ | ১১,২৫ | ১ | ২.৬ | ১ | ১২,৬৩ | ৩০.০ | ৮৪ | ৩,৭৯ | ৫ | ৮,৮৪ | ৫ | ৩৩ |
| ৫৭ | গিনি বিসাউ | " | ১৯৯৬ | ১০,৯৪ | ১ | ২.১ | ১ | ১২,০১ | ৮০.০ | ৩৯ | ৯,৬১ | ৫ | ২,৪০ | ৫ | ৩৪ |
| ৫৮ | পশ্চিম সাহারা | " | ১৯৮৪ | ৭,৫০ | ৮৪ | ২.৮ | ১৭ | ১১,৯৯ | ৯৪.০ | ৮৪ | ১১,২৭ | ৫ | ৭২ | ৫ | ৩৫ |
| ৫৯ | চেচনিয়া | এশিয়া | ১৯৯২ | ১১,০০ | ৭৬ | ১.০ | - | ১১,৯৭ | ৯০.০ | ৭৪ | ১০,৭৭ | ৫ | ১,২০ | ৫ | ৩৬ |
| ৬০ | আবখাযিয়া | " | ১৯৯২ | ৬,৬২ | - | ১.০ | - | ৭,২০ | ৩১.০ | - | ২,২৩ | ৫ | ৪,৯৭ | ৫ | ৩৭ |
| ৬১ | জিবুতী | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৬,১৯ | ১ | ৩.০ | ১ | ৭,০৭ | ৯৭.০ | ৮৪ | ৬,৮৬ | ৫ | ২১ | ৫ | ৩৮ |
| ৬২ | কাতার | এশিয়া | ১৯৯৬ | ৬,৫৮ | ১ | ১.২ | ১ | ৬,৯৪ | ৯৮.০ | ২ | ৬,৮০ | ৫ | ১৪ | ৫ | |
| ৬৩ | বাহ্‌রাইন | " | ১৯৯৬ | ৫,৯৯ | ১ | ২.৯ | ১ | ৬,৬৩ | ১০০.০ | ২ | ৬,৬৩ | - | - | - | ৩৯ |
| ৬৪ | কমোরো | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৫,০৫ | ১ | ২.৬ | ১ | ৫,৬৭ | ১০০.০ | ২ | ৫,৬৭ | - | - | - | |
| ৬৫ | সুরিনাম | দঃ আমেরিকা | ১৯৯৬ | ৪,৩২ | ১ | ১.১ | ১ | ৪,৫০ | ২৭.০ | ২ | ১,২১ | ৫ | ৩,২৯ | ৫ | |
| ৬৬ | ব্রুনাই | এশিয়া | ১৯৯৬ | ২,৯০ | ১ | ২.০ | ১ | ৩,১৭ | ৬০.০ | ২ | ১,৯০ | ৫ | ১,২৭ | ৫ | |
| ৬৭ | মালদ্বীপ | " | ১৯৯৬ | ২,৫৬ | ১ | ২.৯ | ১ | ২,৯১ | ৯৯.০ | ২ | ২,৮৮ | ৫ | ৩ | ৫ | |
| ৬৮ | তুর্কী সাইপ্রাস | ইউরেশিয়া | ১৯৯২ | ১,৪৮ | ৫ | ১.০ | ১ | ১,৫৬ | ১০০.০ | ২ | ১,৫৬ | ৫ | - | - | ৪০ |
| ৬৯ | মায়োত্‌ দ্বীপ | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১,০৮ | ১ | ৩.৭ | ১ | ১,২৭ | ৯৮.০ | ৭১ | ১,২৪ | ৫ | ৩ | ৫ | ৪১ |
| | | | | | | | মোট | ১৪৮,৩৭,৭৩ | | | ১২১,৭৪,৪১ | | ২৬,৬৩,৩২ | | |

## মুসলিম সংখ্যালঘু

| ক্রমিক নং | দেশ | মহাদেশ | ভিত্তিসাল | জনসংখ্যা (হাজারে) | সূত্র ভিত্তিক | বার্ষিক বৃদ্ধি (শতকরা) | সূত্রভিত্তিক | ২০০০ সালের শেষে জনসংখ্যা (হাজারে) | মুসলিম জনসংখ্যা (শতকরা) | সূত্রভিত্তিক | ২০০০ সালের শেষে মুসলিম জনসংখ্যা (হাজারে) | সূত্রভিত্তিক | ২০০০ সালের শেষে অমুসলিম জনসংখ্যা (হাজারে) | সূত্রভিত্তিক | টীকাভিত্তিক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ভারত | এশিয়া | ১৯৯৬ | ৯৪,৪৫,০০ | ৪৭ | ২.১ | ৩ | ১০৩,৭১,৪৯ | ২৫.০ | ৭৮ | ২৫,৯২,৮৭ | ৫ | ৭৭,৭৮,৬২ | ৫ | ৪২ |
| ২ | চীন | " | ১৯৯৬ | ১২৩,২০,০০ | ৪৭ | ১.২ | ৩ | ১২৯,৯৯,৬২ | ৮.০ | - | ১০,৩৯,৯৭ | ৫ | ১১৯,৫৯,৬৫ | ৫ | ৪৩ |
| ৩ | ফিলিপাইন | " | ১৯৯৮ | ৭,২৬,০০ | ৩ | ২.৩ | ৩ | ৭,৬৮,৫২ | ২৮.৫ | ৫ | ২,১৯,০৩ | ৫ | ৫,৪৯,৪৯ | ৫ | ৪৪ |
| ৪ | রাশিয়া | ইউরেশিয়া | ১৯৯৬ | ১৪,৭৭,০০ | ৪৭ | ০.৪ | ৩ | ১৫,০৩,৭৮ | ১৪.১২ | ৫ | ২,১২.৩৩ | ৫ | ১২,৯১,৪৫ | ৫ | ৪৫ |
| ৫ | থাইল্যান্ড | এশিয়া | ১৯৯৬ | ৬,০০,০৩ | ১ | ১.৩ | ১ | ৬,৩৫,৯৫ | ২০.০ | ৭৯ | ১,২৭,১৯ | ৫ | ৫,০৮,৭৬ | ৫ | ৪৬ |
| ৬ | যুক্তরাষ্ট্র | উঃ আমেরিকা | ১৯৯৮ | ২৭,১০,০০ | ৮০ | ১.০ | ৩ | ২৭,৬৪,৪৭ | ৪.০ | ৮৪ | ১,১০,৫৮ | ৫ | ২৬,৫৩,৮৯ | ৫ | ৪৭ |
| ৭ | বার্মা | এশিয়া | ১৯৯৮ | ৪,৮৮,০০ | ৩ | ২.১ | ৩ | ৫,১৪,০৫ | ১৮.৭৬ | ৫ | ৯৬,৪৪ | ৫ | ৪,১৭,৬১ | ৫ | ৪৮ |
| ৮ | কেনিয়া | আফ্রিকা | ১৯৯৮ | ৩,০৩,০০ | ৩ | ৩.৪ | ৩ | ৩,২৯,৪৬ | ২৪.০ | ২ | ৭৯,০৭ | ৫ | ২,৫০,৩৯ | ৫ | ৪৯ |
| ৯ | ফ্রান্স | ইউরোপ | ১৯৯৮ | ৫,৮৭,০০ | ৩ | ০.৬ | ৩ | ৫,৯৫,৮৫ | ১২.০ | ৫ | ৭১,৫০ | ৫ | ৫,২৪,৩৫ | ৫ | ৫০ |
| ১০ | ব্রাজিল | দঃ আমেরিকা | ১৯৯৬ | ১৬,১৩,৬৫ | ১ | ১.৪ | ১ | ১৭,১৭,৮৭ | ৪.০ | ৮৪ | ৬৮,৭১ | ৫ | ১৬,৪৯,১৬ | ৫ | ৫১ |
| ১১ | কঙ্গো (গণঃ প্রঃ) | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৪,৫২,৩৪ | ১ | ৩.২ | ১ | ৫,২১,২৯ | ১১.০ | ৮৪ | ৫৭,৩৪ | ৫ | ৪,৬৩,৯৫ | ৫ | ৫২ |
| ১২ | এ্যাঙ্গোলা | " | ১৯৯৬ | ১,১১,০০ | ১ | ৩.১ | ১ | ১,২৭,৩৬ | ২৭.০ | ৮৪ | ৩৪,৩৯ | ৫ | ৯২,৯৭ | ৫ | |
| ১৩ | মাদাগাস্কার | " | ১৯৯৬ | ১,৩৭,০৫ | ১ | ২.৭ | ১ | ১,৫৪,৫২ | ১৯.০ | ৮৪ | ২৯,৩৬ | ৫ | ১,২৫,১৬ | ৫ | ৫৩ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৪ | জাপান | এশিয়া | ১৯৯৮ | ১২,৬১,০০ | ৩ | ০.৩ | ৩ | ১২,৭৮,১১ | ২.০ | ৫২ | ২৫,৫৬ | ৫ | ১২,৫২,৫৫ | ৫ | ৫৪ |
| ১৫ | যুগোস্লাভিয়া | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ১,০৫,৭৪ | ১ | ০.১ | ১ | ১,০৬,২২ | ২৩.৮৮ | ৫ | ২৫,৩৭ | ৫ | ৮০,৮৫ | ৫ | ৫৫ |
| ১৬ | জার্মানী | " | ১৯৯৮ | ৮,২৬,০০ | ৩ | ০.৭ | ৩ | ৮,৪০,৫৪ | ৩.০ | ৭ | ২৫,২২ | ৫ | ৮,১৫,৩২ | ৫ | |
| ১৭ | স্পেন | " | ১৯৯৬ | ৩,৯২,৬০ | ১ | ০.২ | ১ | ৩,৯৬,১৫ | ৬.০ | ৫৭ | ২৩,৭৭ | ৫ | ৩,৭২,৩৮ | ৫ | |
| ১৮ | কম্বোডিয়া | এশিয়া | ১৯৯৮ | ১,০৩,০০ | ৩ | ২.৫ | ৩ | ১,০৯,৫৭ | ২০.০ | ৮৪ | ২১,৯১ | ৫ | ৮৭,৬৬ | ৫ | ৫৬ |
| ১৯ | বুলগেরিয়া | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৮৩,৫৬ | ১ | -০.৭ | ১ | ৮০,৮০ | ২৫.০ | ৫১ | ২০,২০ | ৫ | ৬০,৬০ | ৫ | ৫৭ |
| ২০ | বৃটেন | " | ১৯৯৮ | ৫,৮৬,০০ | ৩ | ০.৩ | ৩ | ৫,৯০,৪১ | ৩.৪ | ৫ | ২০,০৭ | ৫ | ৫,৭০,৩৪ | ৫ | ৫৮ |
| ২১ | ভেনেজুয়েলা | দঃ আমেরিকা | ১৯৯৬ | ২,২৩,১১ | ১ | ২.২ | ১ | ২,৪৬,০৮ | ৮.০ | ৭৩ | ১৯,৬৯ | ৫ | ২,২৬,৩৯ | ৫ | |
| ২২ | জর্জিয়া | এশিয়া | ১৯৯৬ | ৫৪,১১ | ১ | -০.২ | ১ | ৫৩,৬২ | ৩৪.৪৫ | ৫ | ১৮,৪৭ | ৫ | ৩৫,১৫ | ৫ | ৫৯ |
| ২৩ | জিম্বাবে | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১,১২,৪৮ | ১ | ২.৪ | ১ | ১,২৫,১৬ | ১৪.০ | ৮৪ | ১৭,৫২ | ৫ | ১,০৭,৬৪ | ৫ | ৬০ |
| ২৪ | শ্রীলঙ্কা | এশিয়া | ১৯৯৮ | ১,৮৬,০০ | ৩ | ১.২ | ২ | ১,৯১,৬৩ | ৮.০ | ৪ | ১৫,৩৩ | ৫ | ১,৭৬,৩০ | ৫ | |
| ২৫ | লাইবেরিয়া | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ২৮,১০ | ১ | ২.৪ | ১ | ৩১,২৭ | ৪৫.০ | ২৯ | ১৪,০৭ | ৫ | ১৭,২০ | ৫ | ৬১ |
| ২৬ | তাইওয়ান | এশিয়া | ১৯৯৮ | ২,১৯,০০ | ৩ | ১.০ | ৩ | ২,২৪,৫২ | ৬.০ | ৮৪ | ১৩,৪৭ | ৫ | ২,১১,০৫ | ৫ | ৬২ |
| ২৭ | জাম্বিয়া | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৯২,১৫ | ১ | ২.৮ | ১ | ১,০৪,৩৫ | ১১.০ | ৫ | ১১,৪৮ | ৫ | ৯২,৮৭ | ৫ | |
| ২৮ | মেক্সিকো | উঃ আমেরিকা | ১৯৯৬ | ৯,৩১,৮২ | ১ | ১.৮ | ১ | ১০,০৯,৭৫ | ১.০৫ | ৫ | ১০,৬০ | ৫ | ৯,৯৯,১৫ | ৫ | ৬৩ |
| ২৯ | দঃ কোরিয়া | এশিয়া | ১৯৯৬ | ৪,৫৫,৪৫ | ১ | ১.০ | ১ | ৪,৭৬,৩১ | ২.০ | ৮৩ | ৯,৫৩ | ৫ | ৪,৬৬,৭৮ | ৫ | |
| ৩০ | দঃ আফ্রিকা | আফ্রিকা | ১৯৯৮ | ৪,৩৫,০০ | ৩ | ২.২ | ৩ | ৪,৫৯,৩৫ | ২.০ | ২৪ | ৯,১৯ | ৫ | ৪,৫০,১৬ | ৫ | ৬৪ |
| ৩১ | নেপাল | এশিয়া | ১৯৯৮ | ২,২১,০০ | ৩ | ২.৩ | ৩ | ২,৩৩,৯৪ | ৩.৮ | ৩৫ | ৮,৮৯ | ৫ | ২,২৫,০৫ | ৫ | ৬৫ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩২ | সিঙ্গাপুর | এশিয়া | ১৯৯৮ | ৩১,০০ | ৩ | ২.০ | ৩ | ৩১,৯৫ | ২৭.০ | ৮৪ | ৮,৬৩ | ৫ | ২৩,৩২ | ৫ | ৬৬ |
| ৩৩ | ভিয়েৎনাম | " | ১৯৯৮ | ৭,৭৮,০০ | ৩ | ২.৩ | ৩ | ৮,৬১,৮৮ | ১.০ | ৭১ | ৮,৬২ | ৫ | ৮,৫৩,২৬ | ৫ | |
| ৩৪ | কলম্বিয়া | দঃ আমেরিকা | ১৯৯৬ | ৩,৭৪,৫১ | ১ | ১.৮ | ১ | ৪,০৫,৮৩ | ২.০ | ৭৩ | ৮,১২ | ৫ | ৩,৯৭,৭১ | ৫ | |
| ৩৫ | লাওস | এশিয়া | ১৯৯৬ | ৪৭,২৬ | ১ | ২.৬ | ১ | ৫৩,০৫ | ১৫.০ | ৮৪ | ৭,৯৬ | ৫ | ৪৫,০৯ | ৫ | |
| ৩৬ | ইতালী | ইউরোপ | ১৯৯৮ | ৫,৭৫,০০ | ৩ | ০.২ | ৩ | ৫,৭৭,৮৮ | ১.০ | ৮৪ | ৫,৭৮ | ৫ | ৫,৭২,১০ | ৫ | |
| ৩৭ | মরিসাস | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১১,৩৪ | ১ | ১.২ | ১ | ১১,৯৭ | ৪৫.০ | ৮৪ | ৫,৩৯ | ৫ | ৬,৫৮ | ৫ | ৬৭ |
| ৩৮ | অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়া | ১৯৯৮ | ১,৮৬,০০ | ৩ | ১.২ | ৩ | ১,৯১,৬৩ | ২.৭৩ | ৫ | ৫,২৪ | ৫ | ১,৮৬,৩৯ | ৫ | ৬৮ |
| ৩৯ | কানাডা | উঃ আমেরিকা | ১৯৯৮ | ৩,০৫,০০ | ৩ | ১.৩ | ৩ | ৩,১৫,০২ | ১.৪৩ | ৫ | ৪,৫০ | ৫ | ৩,১০,৫২ | ৫ | ৬৯ |
| ৪০ | নেদারল্যান্ড | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ১,৫৫,১৭ | ১ | ০.৬ | ১ | ১,৫৯,৪০ | ২.৭৩ | ৫ | ৪,৩৫ | ৫ | ১,৫৫,০৫ | ৫ | ৭০ |
| ৪১ | বুরুন্দী | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৬৪,২৩ | ১ | ২.৬ | ১ | ৭১,২৬ | ৬.০ | ৮৪ | ৪,২৮ | ৫ | ৬৬,৯৮ | ৫ | |
| ৪২ | রুয়ান্ডা | " | ১৯৯৬ | ৬৭,২৭ | ১ | -০.৬ | ১ | ৬৫,৪৭ | ৬.০ | ৮৪ | ৩,৯৩ | ৫ | ৬১,৫৪ | ৫ | |
| ৪৩ | পোল্যান্ড | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৩,৮৬,১৮ | ১ | ০.২ | ১ | ৩,৮৯,৬৭ | ১,০ | ৮৪ | ৩,৯০ | ৫ | ৩,৮৫,৭৭ | ৫ | |
| ৪৪ | বেলজিয়াম | " | ১৯৯৬ | ১,০১,৫৯ | ১ | ০.৩ | ১ | ১,০২,৯৭ | ৩.৪৯ | ৫ | ৩,৬০ | ৫ | ৯৯,৩৭ | ৫ | ৭১ |
| ৪৫ | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ২৭,০৫ | ১ | ২.৯ | ১ | ৩০,৭৭ | ১১.০ | ৮৪ | ৩.৩৮ | ২৭.৩৯ | ৩০,১৫ | ৫ | |
| ৪৬ | সুইডেন | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৮৮,৪৩ | ১ | ০.৬ | ১ | ৯০,৮৪ | ৩.৩১ | ৫ | ৩,০১ | ৫ | ৮৭,৮৩ | ৫ | ৭২ |
| ৪৭ | পানামা | মধ্য আমেরিকা | ১৯৯৬ | ২৬,৭৪ | ১ | ১.৮ | ১ | ২৮,৯৮ | ১০.০ | ৫৫ | ২,৯০ | ৫ | ২৬,০৮ | ৫ | |
| ৪৮ | ক্রোয়েশিয়া | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৪৭,৮১ | ১ | ০.০ | ১ | ৪৭,৮১ | ৫.৪ | ১৫ | ২,৫৮ | ৫ | ৪৫,২৩ | ৫ | |
| ৪৯ | কিউবা | মধ্য আমেরিকা | ১৯৯৬ | ১,১০,১৯ | ১ | ০.৬ | ১ | ১,১২,৮৬ | ২.০ | ৮৮ | ২,২৬ | ৫ | ১,১০,৬০ | ৫ | |

www.pathagar.com

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫০ | গ্রীস | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ১,০৪,৭৫ | ১ | ০.৫ | ১ | ১,০৭,১৩ | ২.০ | ২ | ২,১৪ | ৫ | ১,০৪,৯৯ | ৫ | |
| ৫১ | সুইজারল্যান্ড | " | ১৯৯৬ | ৭০,৭৪ | ১ | ০.৯ | ১ | ৭৩,৬৫ | ২.৭৮ | ৫ | ২,০৫ | ৫ | ৭১,৬০ | ৫ | ৭৩ |
| ৫২ | পর্তুগাল | " | ১৯৯৬ | ৯৯,৩০ | ১ | ০.১ | ১ | ৯৯,৭৫ | ২.০ | ৬৭ | ২,০০ | ৫ | ৯৭,৭৫ | ৫ | |
| ৫৩ | বৎসোয়ানা | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১৪,৮০ | ১ | ২.৫ | ১ | ১৬,৫৪ | ১২.০ | ৮৪ | ১,৯৮ | ৫ | ১৪,৫৬ | ৫ | |
| ৫৪ | মঙ্গোলিয়া | এশিয়া | ১৯৯৬ | ২৬,১৫ | ১ | ১.৮ | ১ | ২৮,৯৮ | ৬.৫৬ | ৫৫ | ১,৯০ | ৫ | ২৭,০৮ | ৫ | ৭৪ |
| ৫৫ | অস্ট্রিয়া | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৮০,৫৯ | ১ | ০.৭ | ১ | ৮৩,১৬ | ২.০ | ৫৮ | ১,৬৬ | ৫ | ৮১,৫০ | ৫ | |
| ৫৬ | উরুগুয়ে | দঃ আমেরিকা | ১৯৯৬ | ৩২,০৩ | ১ | ০.৬ | ১ | ৩২,৫১ | ৫.০ | ৭৭ | ১,৬৩ | ৫ | ৩০,৮৮ | ৫ | |
| ৫৭ | হাইতি | মধ্য আমেরিকা | ১৯৯৬ | ৭৩,৩৬ | ১ | ২.১ | ১ | ৮০,৫৬ | ২.০ | ৬৬ | ১,৬১ | ৫ | ৭৮,৯৫ | ৫ | |
| ৫৮ | নামিবিয়া | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১৮.৮৪ | ১ | ২.৬ | ১ | ১৭,৭৮ | ৭.০ | ৮৪ | ১,২৪ | ৫ | ১৬,৫৪ | ৫ | |
| ৫৯ | চেক প্রজাতন্ত্র | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ১,০৩,১৫ | ১ | -০.১ | ১ | ১,০২,৭৫ | ১.০ | ৭২ | ১,০৩ | ৫ | ১,০১,৭২ | ৫ | |
| ৬০ | ফিজি | ওসেনিয়া | ১৯৯৬ | ৮,০৩ | ১ | ১.৫ | ১ | ৮,৫৯ | ১২.০ | ৮৪ | ১,০৩ | ৫ | ৭,৫৬ | ৫ | ৭৫ |
| ৬১ | হাঙ্গেরী | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ১,০১,৯৩ | ১ | -০.৩ | ১ | ১,০০,৫৬ | ১.০ | ৭২ | ১,০১ | ৫ | ৯৯,৫৫ | ৫ | |
| ৬২ | কোস্টারিকা | মধ্য আমেরিকা | ১৯৯৬ | ৩৪.৪২ | ১ | ২.১ | ১ | ৩৭,৮০ | ২.৫ | ৮৪ | ৯৫ | ৫ | ৩৬,৮৫ | ৫ | |
| ৬৩ | বিষুবীয় গিনি | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৪,১০ | ১ | ২.৬ | ১ | ৪,৬০ | ২০.০ | ৮৪ | ৯২ | ৫ | ৩,৬৮ | ৫ | |
| ৬৪ | লেসোথো | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ২০,২৩ | ১ | ২.১ | ১ | ২২,২১ | ৪.০ | ৮৪ | ৮৯ | ৫ | ২১,৩২ | ৫ | |
| ৬৫ | মাল্টা | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৩,৭৩ | ১ | ০.৯ | ১ | ৩,৮৮ | ২২.০ | ৮৪ | ৮৫ | ৫ | ৩,০৩ | ৫ | ৭৬ |
| ৬৬ | ত্রিনিদাদ ও তোবাগো | দঃ আমেরিকা | ১৯৯৬ | ১২,৯৭ | ১ | ০.৮ | ১ | ১৩,৪৪ | ৬.০ | ২ | ৮১ | ৫ | ১২,৬৩ | ৫ | ৭৭ |
| ৬৭ | গিয়ানা | " | ১৯৯৬ | ৮,৩৯ | ১ | ০.৯ | ১ | ৮,৭৪ | ৯.০ | ২ | ৭৯ | ৫ | ৭,৯৫ | ৫ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬৮ | আর্জেন্টিনা | দঃ আমেরিকা | ১৯৯৬ | ৩,৫২,২০ | ১ | ১.৩ | ১ | ৩,৭৩,২৯ | ০.২ | ৭১ | ৭৫ | ৫ | ৩,৭২,৫৪ | ৫ | |
| ৬৯ | রুমানিয়া | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ২,২৬,০৮ | ১ | -০.৪ | ১ | ২,২২,০৪ | ০.৩ | ১৮ | ৬৭ | ৫ | ২,২১,৩৭ | ৫ | |
| ৭০ | ইউক্রেন | " | ১৯৯৬ | ৫,০৭,১৮ | ১ | -০.৪ | ১ | ৪,৯৮,১২ | ০.১২ | ৫ | ৬০ | ৭৪ | ৪,৯৭,৫২ | ৫ | ৭৮ |
| ৭১ | স্লোভাক প্রজাতন্ত্র | " | ১৯৯৬ | ৫৩,৪৩ | ১ | ০.১ | ১ | ৫৩,৯১ | ১.০ | ৭২ | ৫৪ | ৫ | ৫৩,৩৭ | ৫ | |
| ৭২ | পপুয়া নিউ গিনি | ওসেনিয়া | ১৯৯৬ | ৪৪,০১ | ১ | ২.৩ | ১ | ৪৮.৭৬ | ১.০ | ৮৪ | ৪৯ | ৫ | ৪৮,২৭ | ৫ | |
| ৭৩ | সোয়াযিল্যান্ড | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৯,২৬ | ১ | ৩.১ | ১ | ১০,৬৩ | ৪.০ | ৮৪ | ৪৩ | ৫ | ১০,২০ | ৫ | |
| ৭৪ | ভূটান | এশিয়া | ১৯৯৬ | ৭,১৫ | ১ | ২.৯ | ১ | ৮,১৩ | ৫.০ | ৭১ | ৪১ | ৫ | ৭,৭২ | ৫ | ৭৯ |
| ৭৫ | ডেনমার্ক | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৫২,৬২ | ১ | ০.৪ | ১ | ৫৩,৫৭ | ০.৭ | ১৮ | ৩৮ | ৫ | ৫৩,১৯ | ৫ | |
| ৭৬ | স্লোভেনিয়া | " | ১৯৯৬ | ১৯,৯১ | ১ | -০.১ | ১ | ১৯,৮০ | ১.৭ | ৮৬ | ৩৪ | ৫ | ১৯,৪৬ | ৫ | |
| ৭৭ | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | ওসেনিয়া | ১৯৯৬ | ৩,৮৯ | ১ | ৩.৩ | ১ | ৪,৫০ | ৬.০ | ৮৪ | ২৭ | ৫ | ৪,২৩ | ৫ | |
| ৭৮ | সিচেলস্ | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ৭৭ | ১ | ১.৫ | ১ | ৮৮ | ৩০.০ | ৮৪ | ২৬ | ৬ | ৬২ | ৫ | ৮০ |
| ৭৯ | বেলিজ | মধ্য আমেরিকা | ১৯৯৬ | ২,২২ | ১ | ২.৭ | ১ | ২,৫০ | ১০.০ | ৬২ | ২৫ | ৫ | ২,২৫ | ৫ | |
| ৮০ | বেলারুস | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ১,০২,৯৮ | ১ | ০.১ | ১ | ১,০৩,৪৪ | ০.২১ | ৫ | ২২ | ৭৪ | ১,০৩,২২ | ৫ | |
| ৮১ | মলদাভিয়া | " | ১৯৯৬ | ৪৩,২৭ | ১ | -০.১ | ১ | ৪৩,০৮ | ০.৪৬ | ৫ | ২০ | ৭৪ | ৪২,৮৮ | ৫ | |
| ৮২ | নরওয়ে | " | ১৯৯৬ | ৪৩,৮১ | ১ | ০.৫ | ১ | ৪৪,৮০ | ০.৪ | ১৮ | ১৮ | ৫ | ৪৪,৬২ | ৫ | |
| ৮৩ | সাওতোমো ও প্রিন্সিপে | আফ্রিকা | ১৯৯৬ | ১,৩৫ | ১ | ২.৭ | ১ | ১,৫২ | ১১.০ | ৮৪ | ১৭ | ৫ | ১,৩৫ | ৫ | |
| ৮৪ | এ্যানডোরা | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৭১ | ১ | - | - | ৭১ | ১৫.০ | ৭২ | ১১ | ৫ | ৬০ | ৫ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮৫ | নিউজিল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া | ১৯৯৬ | ৩৬,৩৫ | ১ | ১.৩ | ১ | ৩৮,৫২ | ০.১৭ | ৫ | ৭ | ৭০ | ৩৮,৪৫ | ৫ | |
| ৮৬ | হন্ডুরাস | মধ্য আমেরিকা | ১৯৯৬ | ৬১,০১ | ১ | ৩.০ | ১ | ৬৯,৭০ | ০.১ | ৭১ | ৭ | ৫ | ৬৯,৬৩ | ৫ | |
| ৮৭ | ফিনল্যান্ড | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৫১,২৫ | ১ | ০.৫ | ১ | ৫২,৪১ | ০.০৯ | ৭২ | ৫ | ৫ | ৫২,৩৬ | ৫ | |
| ৮৮ | জ্যামাইকা | মধ্য আমেরিকা | ১৯৯৬ | ২৫,৪৭ | ১ | ৩.০ | ১ | ২৬,৬৪ | ০.২ | ৭১ | ৫ | ৫ | ২৬,৫৯ | ৫ | |
| ৮৯ | জিব্রাল্টার | ইউরোপ | ১৯৯২ | ৩২ | ১ | - | - | ৩২ | ১০.০ | ৭২ | ৩ | ৫ | ২৯ | ৫ | |
| ৯০ | বাহামা | মধ্য আমেরিকা | ১৯৯৬ | ২,৮৪ | ১ | ১.৭ | ১ | ৩,০৬ | ১.০ | - | ৩ | - | ৩,০৩ | ৫ | ৮১ |
| ৯১ | প্যারাগুয়ে | দ : আমেরিকা | ১৯৯৬ | ৪৯,৫৫ | ১ | ২.৭ | ১ | ৫৫,৮৭ | ০.০৪ | ৫ | ২ | ৬৮ | ৫৫,৮৫ | ৫ | |
| ৯২ | লুক্সেমবার্গ | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৪,১৬ | ১ | ১.৪ | ১ | ৪,৪৩ | ০.৫ | ৭২ | ২ | ৫ | ৪,৪১ | ৫ | |
| ৯৩ | নিউ ক্যালিডোনিয়া | ওসেনিয়া | ১৯৯৬ | ১.৯৭ | ১ | ২.৭ | ১ | ২,২২ | ১০.০ | ৮৭ | ২ | ৫ | ২,২০ | ৫ | |
| ৯৪ | চিলি | দঃ আমেরিকা | ১৯৯৬ | ১,৪৪,১৯ | ১ | ১.৬ | ১ | ১,৫৪,৮৭ | - | - | ১ | ৮৭ | ১,৫৪,৮৬ | ৫ | ৮২ |
| ৯৫ | বারমুডা | মধ্য আমেরিকা | ১৯৯৬ | ৬২ | ১ | ০.৪ | ১ | ৬৩ | - | - | ১ | ৮৭ | ৬২ | ৫ | ৮৩ |
| ৯৬ | পুয়োর্টোরিকো | " | ১৯৯৬ | ৩৭,৮৩ | ১ | ১.২ | ১ | ৩৯,৯২ | - | - | ১ | ৮৭ | ৩৯,৯১ | ৫ | ৮৪ |
| ৯৭ | আয়ারল্যান্ড | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৩৬,২৬ | ১ | ০.৬ | ১ | ৩৭,২৫ | ০.০৩ | ৭২ | ১ | ৫ | ৩৭,২৪ | ৫ | |
| ৯৮ | তোঙ্গা | ওসেনিয়া | ১৯৯৬ | ৯৭ | ১ | ০.২ | ১ | ৯৮ | ১.০ | ৮৪ | ১ | ৫ | ৯৭ | ৫ | |
| ৯৯ | আইসল্যান্ড | ইউরোপ | ১৯৯৬ | ৩৬,২৬ | ১ | ০.৬ | ১ | ৩৭,২৫ | ০.০৪ | ৮৫ | ১ | ৫ | ৩৭,২৪ | ৫ | |
| | | | | | | | মোট | ৪৫৯,৬৭,৬৩ | | | ৫১,৬৮,৬৩ | | ৪০৭,৯৮,৯০ | | |
| | | | | | | | সর্বমোট | ৬০৮,০৫,৩৬ | | | ১৭৩,৪৩,১৪ | | ৪৩৪,৬২,২২ | | |

# জনসংখ্যা বিষয়ক পরিসংখ্যানে ব্যবহৃত বিশেষ তথ্যসূত্র

## (ক্রমানুসারে)

[ বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেসব বিশেষ তথ্যসূত্র ব্যবহৃত হয়েছে এখানে তা সন্নিবেশিত হল। এতদসংক্রান্ত চার্টে যে তথ্যের জন্য যে সূত্রক্রমিক নির্দেশ করা হয়েছে নিম্নোক্ত সূত্রসমূহের মধ্য থেকে সেই ক্রমিকের সূত্রটি হতে সংশ্লিষ্ট তথ্যটি গৃহীত হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে তথ্যটি হুবহু কোন তথ্যসূত্র থেকে গৃহীত হয় নি, বরং প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে সেক্ষেত্রে তথ্যসূত্রক্রমিক হিসেবে ৫ (পাঁচ) নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন ঃ কোন দেশের কোন এক সময়ের জনসংখ্যা, শতকরা বার্ষিক বৃদ্ধিহার ও মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার পাওয়া গেছে। এর ভিত্তিতে হিসাব করে ২০০০ খৃষ্টাব্দের সমাপ্তিতে সম্ভাব্য মুসলিম জনসংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। এর তথ্যসূত্রক্রমিক হিসেবে '৫' ব্যবহৃত হয়েছে। ]


১। The World Bank Atlas 1998, Washington, D.C., U.S.A.

২। گیتاشناسی کشورها

৩। Asiaweek : Hong Kong : 21-8-1998

৪। کشورهای جهان

৫। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে হিসাব করে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান।

৬। দৈনিক ইত্তেফাক ঃ ৬-১০-১৯৯৩

৭। দৈনিক মিল্লাত ঃ ৪-৪-১৯৯৩ [ Echo of Islam থেকে উদ্ধৃত ]

৮। The Telegraph, Dhaka : 4-9-1993

৯। দৈনিক ইনকিলাব ঃ ১৯-৯-১৯৯২

১০। Tehran Times, Tehran : 28-10-1991

১১। ইনকিলাব ঃ ১৩-৫-১৯৯২

১২। ইনকিলাব ঃ ৬-৯-১৯৯৩

১৩। Morning Sun, Dhaka : 7-11-1993

১৪। Kayhan International : Tehran : 27-7-1991

১৫। Kayhan International : 20-7-1991

১৬। এপি/ইনকিলাব ঃ ৪-৮-১৯৯২

১৭। سالنامه مرکز آمار ایران ۱۳۶۵


www.pathagar.com

১৮। মিল্লাত ঃ ১৪-৮-১৯৯৩ [Echo of Islam থেকে উদ্ধৃত]

১৯। রয়টার/বিএসএস (আহমদ জিবরীলের উক্তি) ঃ ১৪-৯-১৯৯৩

২০। New Nation, Dhaka : 31-7-1993 (প্যাট্রিস লুমুম্বার পুত্র জনাব আমীর লুমুম্বার সাক্ষাতকার)

২১। اطلاعات ــ تهران : ۲۲, ۵, ۱۹۹۱م

২২। *Manifesto of Arakan Rohingya Islamic Front*, 2nd Edition, 1991, P. 11

২৩। Crescent International, Toronto, Canada: 1-15 September, 1991

২৪। Morning Sun : 18-11-1993

২৫। کیهان ــ تهران : ۱۶, ۶, ۱۹۹۱م

২৬। মিল্লাত ঃ ২২-৬-১৯৯৩

২৭। Morning Sun : 16-10-1993

২৮। মিল্লাত ঃ ২৯-৪-১৯৯৩

২৯। ইনকিলাব ঃ ২৫-২-১৯৯৪

৩০ মিল্লাত ঃ ২৪-১২-১৯৯৩

৩১। ইনকিলাব ঃ ২৯-৩-১৯৯৩

৩২। Daily Star, Dhaka : 12-8-1994

৩৩। Reuters : 10-4-1995

৩৪। New Nation : 2-4-1991

৩৫। *Muslims of Nepal* by Shamima Siddika; Everest Book Service, Jamal, Kathmundu

৩৬। آمارهای بین المللی : سالنامه آمار ۱۳۶۹ - مرکز آمار ایران - تهران

৩৭। ইনকিলাব ঃ ২-৪-১৯৯৮ (World Development Report : World Bank 1997-এর ভিত্তিতে)

৩৮। এএফপি/ইনকিলাব ঃ ১৪-৩-১৯৯৮

৩৯। Crescent International/বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ১০-৯-১৯৯৭

www.pathagar.com

৪০। এপি/ইনকিলাব : ১১-১২-১৯৯৭

৪১। Crescent International : Nov. 1-15, 1997

৪২। ইনকিলাব ঃ ১৩-১১-১৯৯৮

৪৩। ইনকিলাব ঃ ১১-৬-১৯৯৮

৪৪। ইনকিলাব ঃ ২৯-১০-১৯৯৮

৪৫। সোনার বাংলা ঃ ৪-১২-১৯৯৮

৪৬। ইনকিলাব ঃ ২৬-১১-১৯৯৮

৪৭। জাতিসংঘ / সিনহুয়া / আল-মুজাদ্দেদ ঃ ২১-৮-১৯৯৭

৪৮। ইনকিলাব ঃ ২৫-১২-১৯৯৮

৪৯। ইনকিলাব ঃ ১১-১২-১৯৯৭

৫০। ইনকিলাব ঃ ৫-১১-১৯৯৮

৫১। ইনকিলাব ঃ ২১-৮-১৯৯৮

৫২। ইনকিলাব ঃ ১৯-২-১৯৯৮

৫৩। ইনকিলাব ঃ ২০-১১-১৯৯৭

৫৪। چشم انداز- تهران :بهمن ۱۳۷۶هـ ش

৫৫। ইনকিলাব ঃ ১৬-৪-১৯৯৮

৫৬। World Muslim League Journal, June 1994

৫৭। ইনকিলাব ঃ ১৭-৯-১৯৯৮

৫৮। ইনকিলাব ঃ ৩০-৭-১৯৯৮

৫৯। ইনকিলাব ঃ ১৪-৫-১৯৯৮

৬০। ইনকিলাব ঃ ১৫-১-১৯৯৮

৬১। ইনকিলাব ঃ ৮-১০-১৯৯৮

৬২। ইনকিলাব ঃ ১৫-১০-১৯৯৮

৬৩। چشم انداز - تهران : مرداد ۱۳۷۶ هـ ش

৬৪। ইনকিলাব ঃ ৯-৭-১৯৯৮

৬৫। ইনকিলাব ঃ ২৭-১১-১৯৯৭

৬৬। ইনকিলাব ঃ ৪-১২-১৯৯৭

www.pathagar.com

৬৭। ইনকিলাব ঃ ২৯-১-১৯৯৭

৬৮। ইনকিলাব ঃ ২৯-১-১৯৯৭

৬৯। ইনকিলাব ঃ ৫-৩-১৯৯৮

৭০। *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World.*

৭১। *Profiles of Islamic Countries*, Islamic Propagation Organization, Tehran, 1989

৭২। দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১-৪-১৯৭৭

৭৩। ইনকিলাব ঃ ১২-১০-১৯৯৫

৭৪। মিল্লাত ঃ ১৫-৬-১৯৯৩

৭৫। چشم انداز - تهران : خرداد ۱۳۷۶ هـ ش

৭৬। Time : 15-3-1993

৭৭। ইনকিলাব ঃ ২৯-১-১৯৯৯

৭৮। ইনকিলাব ঃ ৫-১-১৯৯৮

৭৯। আলামুজাদ্দেদ ঃ ১৩-১১-১৯৯৪

৮০। এএফপি / ইনকিলাব ঃ ২-১-১৯৯৯

৮১। ইনকিলাব ঃ ১৫-৩-১৯৯৩

৮২। এপি/আলমুজাদ্দেদ ঃ ২-১০-১৯৯৪

৮৩। ইনকিলাব ঃ ১৮-২-১৯৯৯

৮৪। Map of the Islamic World وسسه جغرافیائی وکارتوگرافی سحاب ، تهران ــ ۱۹۸۴ م

৮৫। The Spread of Islam. P. 467

৮৬। Ibi P. 456.

৮৭। اقلیتهای مسلمان درجهان امروز

৮৮। ইনকিলাব ঃ ৪-১১-১৯৯৯

৮৯। ইনকিলাব ঃ ১৭-৬-২০০০

www.pathagar.com

# জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ঃ বিশেষ নোট

জনসংখ্যা উল্লেখের ক্ষেত্রে অত্র পরিসংখ্যানে বহুলব্যবহৃত ১নং তথ্যসূত্রে হাজারের একক এবং ৩নং তথ্যসূত্রে লাখের একক ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা হাজারের একক ব্যবহার করাকে সমীচীন মনে করেছি। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পরিসংখ্যানে এক এককের অর্ধেক বা তার বেশীকে এক একক ধরা হয়েছে এবং এক এককের অর্ধেকের কম হলে তা হিসাব থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এ কারণে ৩নং তথ্যসূত্রে হিসাবে যোগ হওয়া ও বাদ পড়ার সংখ্যা বেশ বেশী বলে আমরা ধরে নিতে পারি। তথাপি অধুনাতম তথ্য হিসেবে আমরা এ সূত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। তাছাড়া ১ম ও ৩য় সূত্র বিভিন্ন ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে স্বীয় পরিসংখ্যানসমূহ প্রণয়ন করে বলে দেশসমূহের জনসংখ্যা ও বৃদ্ধিহারের ক্ষেত্রে আমরা প্রধানতঃ এ দু'টি সূত্রকেই ব্যবহার করেছি।

আমরা ১নং তথ্যসূত্রের ভিত্তিসাল ১৯৯৬-র মাঝামাঝি সময়টিকে চিহ্নিত করেছি এবং ৩নং তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে ১৯৯৮-র মাঝামাঝি বলে ধরে নিয়েছি। তেমনি যেসব দেশের ক্ষেত্রে ৩৭নং তথ্যসূত্র ব্যবহৃত হয়েছে সেসব দেশের ভিত্তিসালের (১৯৯৭) জনসংখ্যা ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ের বলে ধরে নিয়েছি।

১। ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা ১নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে (বছরের মধ্যভাগে ) ১৯ কোটি ৭০ লাখ ৫৫ হাজার ছিল এবং ৩৭নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৯৭-তে (বছরের মাঝামাঝি) ২০ কোটি ২০ লাখ ছিল। কিন্তু ৩নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৯৮-র মাঝামাঝি এ সংখ্যা ২০ কোটি ১৬ লাখ। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক প্রণীত রিপোর্ট (৩৭নং সূত্র)-কে ৩নং সূত্রের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার ১নং সূত্রে শতকরা ১ দশমিক ৭ ও ৩নং সূত্রে ১ দশমিক ৬ ভাগ ধরা হয়েছে। আমরা এব্যাপারে ৩নং সূত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

২। ৩৮নং তথ্যসূত্রে বর্ণিত পরিসংখ্যান ও তথ্য পাকিস্তানের সরকারী সূত্রে প্রকাশিত। এতে ১৯৯৭-র শেষের তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

৩। বাংলাদেশে নাগরিকত্বসনদ বহন এবং জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধীকরণ কার্যতঃ বাধ্যতামূলক নয়। অন্যদিকে আদমশুমারী পদ্ধতিও ত্রুটিমুক্ত নয়। তাছাড়া অনেকের ধারণা, জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাফল্য প্রমাণের জন্য আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন নির্ভুল তথ্য ছাড়াই কাল্পনিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারের ক্রমহ্রাস ঘোষণা করছে। এসব কারণে অনেক সাংবাদিক ও গবেষক মনে করেন, বাংলাদেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ঘোষিত জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। তাঁদের ধারণা, ২০০০

www.pathagar.com

সালের শেষে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পনের কোটি ছাড়িয়ে যাবে। সে যা-ই হোক, ১, ৩ ও ৩৭ নং তথ্যসূত্রের পরিসংখ্যান প্রায় কাছাকাছি বিধায় আমরা অধুনাতম বিবেচনায় ৩নং তথ্যসূত্রের পরিসংখ্যানকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। অবশ্য ১নং তথ্যসূত্রে জনসংখ্যাবৃদ্ধিহার শতকরা ১ দশমিক ৬ ভাগ বলা হয়েছে যা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি।

৪। নাইজেরিয়ার প্রকৃত জনসংখ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। দেশটিতে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বায়াফ্রার বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধে ১০ লাখ লোক নিহত হয়। (দৈনিক মিল্লাত ঃ ২৩-৮-১৯৯৩) এরপর আর দেশটিতে কোন বড় ধরনের জনসংখ্যাবিপর্যয় ঘটে নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখকৃত জনসংখ্যা বিষয়ক পরিসংখ্যানে বিস্ময়কর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের প্রকাশিত তথ্যাদির ওপর ভিত্তিশীল ৩৬নং তথ্যসূত্রে দেশটির জনসংখ্যা ১৯৯০ সালে ১১ কোটি ৩৩ লাখ ৪৩ হাজার এবং ১৯৯৫ সালে ১৩ কোটি ৫৪ লাখ ৫১ হাজার অনুমিত হয়েছে। এসিয়াউইক ঃ ৫-১-১৯৯৪ সংখ্যায় বার্ষিক বৃদ্ধিহার উল্লেখ করা হয়েছে শতকরা ৩ দশমিক ২। সে হিসেবে ১৯৯৬-এ জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৩ কোটি ৯৭ লাখ ৮৫ হাজার। অন্যদিকে এসিয়াউইক ঃ ৫-১-১৯৯৬ সংখ্যায় দেশটির জনসংখ্যা ঐ সময় ১০ কোটি ও বার্ষিক বৃদ্ধিহার শতকরা ২ দশমিক ৯ ভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। সে হিসেবে ১৯৯৬-র শেষে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১০ কোটি ২৯ লাখ। এতে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩ কোটি ৬৮ লাখ ৮৫ হাজার।

তথ্যবিভ্রাটের এখানেই শেষ নয়। ১নং তথ্যসূত্র অনুযায়ী ১৯৯৬-এ (মাঝামাঝি) নাইজেরিয়ার জনসংখ্যা ১১ কোটি ৪০ লাখ ৬৮ হাজার। কিন্তু ৩নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৯৮-র মাঝামাঝি দেশটির জনসংখ্যা ১০ কোটি ৫৯ লাখ। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হল, ৩৭নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৯৭-র মাঝামাঝি দেশটির জসসংখ্যা মাত্র ৯ কোটি ৪৫ লাখ। অথচ ১ ও ৩৭নং তথ্যসূত্রের উৎস অভিন্ন সংস্থা—বিশ্বব্যাংক। যা-ই হোক, আমাদের দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে ১নং সূত্রের তথ্য অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে যদিও নাইজেরিয়ার প্রকৃত জনসংখ্যা ১নং সূত্রে বর্ণিত তথ্য থেকেও অনেক বেশী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দেশটির প্রকৃত জনসংখ্যা ২০০০ খৃষ্টাব্দের শেষে ১৫ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে।

নাইজেরিয়ার মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার সম্পর্কেও মারাত্মক ধরনের বিভ্রান্তি বিরাজমান। এটা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে, নাইজেরিয়া একটি মুসলিম

www.pathagar.com

সংখ্যাগুরু দেশ। তবে দেশটিতে মুসলিম ও অমুসলিম জনসংখ্যার ব্যবধান কম। ৩৯নং সূত্রে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৬৫ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এসিয়াউইক ঃ ২২-২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৫ সংখ্যায় নাইজেরিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ২নং তথ্যসূত্রে দেশটির মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমান, ৩৪ ভাগ খৃস্টান ও বাকী ১৬ ভাগ এনিমিস্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ তথ্যসূত্রের মূল সূত্র পশ্চিমা। ৭০নং তথ্যসূত্রেও এর কাছাকাছি তথ্য রয়েছে। এতে ১৯৬৩ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী শতকরা ৪৯ ভাগ মুসলমান ও ৩৪ ভাগ খৃস্টান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নাইজেরিয়াকে খৃস্টান সংখ্যাগুরু দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশটিতে ব্যাপকভাবে মিশনারী তৎপরতা চালানো হলেও বিগত সাড়ে তিন দশকে এনিমিস্টরা ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যে জন্মহারও বেশী। অন্যদিকে ৮৪নং সূত্রে মুসলমানদের হার শতকরা ৭৬ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ। তবে তথ্যসূত্র হিসেবে ক্রিসেন্ট ইন্টারন্যাশনাল (৩৯নং সূত্র ) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এ কারণে এবং সতর্কতার দৃষ্টিতে এ সূত্রটিই গ্রহণ করেছি।

৫। ইরানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩নং সূত্র অনুযায়ী শতকরা ৩ দশমিক ৪। সে হিসেবে ইরানের জনসংখ্যা ২০০০ খৃষ্টাব্দের শেষে আরো বেশী হবার সম্ভাবনা।

৬। ইথিওপিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগত থেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা দেশটিকে খৃস্টান সংখ্যাগুরু হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, দেশটি দীর্ঘদিন যাবত খৃস্টান শাসনাধীনে থাকলেও এর সংখ্যাগুরু জনগণ মুসলমান। তথ্যসূত্র হিসেবে ক্রিসেন্ট ইন্টারন্যাশনাল (৪১নং সূত্র) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া ইথিওপিয়ার মুসলিম সূত্র থেকেও একই তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৯১ সালে ইথিওপিয়ার একজন সিনিয়র মুসলিম সাংবাদিক জনাব কাদাফো মোহাম্মাদ অত্র লেখকের সাথে আলোচনাকালে ইথিওপিয়ার জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমান বলে জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। ৮৭নং তথ্যসূত্রেও তা-ই বলা হয়েছে।

৭। ২নং সূত্রে তাঞ্জানিয়ার জনসংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য সূত্রেও (South, September 1985) একই তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু দু'টি তথ্যসূত্রে (দৈনিক আল-মুজাদ্দেদ ঃ ২৮-১১-১৯৯৬ এবং

www.pathagar.com

দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ১৩-৬-১৯৯৭) দেশটির জনসংখ্যার শতকরা ৭৮ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কেননা সেক্ষেত্রে দেশটি হবে নিরঙ্কুশ মুসলিম সংখ্যাগুরু এবং তা গোপন থাকা সম্ভব নয়। 'সাউথ'-এর দেয়া তথ্যানুযায়ী মুসলমান ও খৃস্টানদের সংখ্যা পরস্পর সমান এবং বাকী ৩০ ভাগ স্থানীয় ধর্মসমূহের অনুসারী। ৮৪নং সূত্রের তথ্য মাঝামাঝি বলে তা-ই গ্রহণ করেছি। অবশ্য ৮৭নং তথ্যসূত্রে (পৃঃ ২০১) ১৯৮২ সালে তাঞ্জানিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমান ছিল বলে উল্লেখ করা হযেছে।

৮। ৪নং তথ্যসূত্রে সূদানের জনসংখ্যার শতকরা ৭৩ ভাগ মূসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ৮৪নং সূত্রের তথ্যই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।

৯। ৩নং সূত্রে আফগানিস্তানের জনসংখ্যা (১৯৯৮-র মাঝামাঝি) ২ কোটি ১২লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে ১নং সূত্রের তথ্যের সাথে একটা বড় ধরনের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। ৩নং সূত্রে সম্ভবতঃ সর্বশেষ তালেবান হামলার ফলে দেশ ত্যাগকারীদের বাদ দিয়ে পরিসংখ্যান তৈরী করা হয়ে থাকবে। তাছাড়া ৩নং সূত্রে আফগানিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১ দশমিক ৯ বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আফগানদের মধ্যে সব সময়ই জন্মহার বেশী। তাই এ তথ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।

১০। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে উযবেকিস্তানের জনসংখ্যা বিষয়ক পরিসংখ্যানে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। নিইজউইক ঃ ৩-২-১৯৯২ সংখ্যায় দেশটির জনসংখ্যা ১ কোটি ৯৮ লাখ এবং এদের মধ্যে রুশ জনসংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐ সময় দেশটিতে ১ লাখ ৯৮ হাজার কোরীয় বংশোদ্ভুত লোক ছিল (Daily Star : 9-9-1993)। এসব তথ্য সামনে রেখে মুসলিম ও অমুসলিম অনুপাত নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

১১। মালয়েশিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা বিভিন্ন সূত্রে শতকরা ৫০ ভাগ, ৫২ ভাগ, ৫৩ ভাগ, ও ৫৫ ভাগ বলা হয়েছে। তথ্যবিশ্লেষণে ৫৫ ভাগই সঠিক বলে মনে হয়। একটি সাম্প্রতিক সূত্রে (এপি/সংগ্রাম ঃ ১৪-৮-১৯৯৯) মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২। উগান্ডার মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ২নং সূত্রে ১৯৭৯ সালে দেশটির জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ খৃস্টান ও ৬ ভাগ মুসলমান ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি ৭০নং সূত্রে বলা হয়েছে, ১৯৫৯ সালে

www.pathagar.com

শতকরা ৬ ভাগ মুসলমান ছিল এবং সর্বোচ্চ ১৫ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ সূত্রে স্বীকার করা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। ৮৪নং সূত্রে বলা হয়েছে ২৭ ভাগ। ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ। দেশটি ওআইসি-র সদস্য। কিন্তু ইদি আমীনের পতনের পর থেকে সেখানে খৃস্টান শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমাদের ধারণা, দেশটির জনসংখ্যার অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ মুসলমান হবে।

১৩। ৪৯নং সূত্রে মোযাম্বিকের মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লাখ ও মুসলমানের সংখ্যা ৬০ লাখ উল্লেখ করা হয়েছে। এ তথ্য যথেষ্ট প্রামাণ্য নয়। ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগ।

১৪। অবশ্য ৮৪নং সূত্রে ঘানার জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৩৩ ভাগ। তাই ঘানার মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ হবার বিষয়টি সন্দেহাতীত নয়।

১৫। ২নং সূত্রে আইভরি কোস্টে মুসলিম জনসংখ্যার হার শতকরা ২৫ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৮২ সালে আইভরি কোস্টের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগ ছিল মুসলমান। অন্যদিকে ৩৯নং সূত্রে ৭০-এর দশকে দেশটিতে শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমান ছিল বলে দাবী করা হয়েছে। ৮৪নং সূত্রে ১৯৮৪-র ১লা জানুয়ারীতে শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এই শেষোক্ত সংখ্যাটিই গ্রহণ করেছি।

১৬। ১৯৯১-র মাঝামাঝি কাজ্জাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬৪ লাখ। এদের মধ্যে রুশ বংশোদ্ভুতদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৮ ভাগ (Newsweek : 3-2-1992)। এছাড়া কোরীয় বংশোদ্ভুতদের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১০ হাজার। (Daily Star : 9-9-1993) ৩নং সূত্র অনুযায়ী বাকী সংখ্যালঘুরা উইক্সেইন ও জার্মান বংশোদ্ভুত।

দ্বিতীয়তঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার নেতিবাচক হবার কারণ সম্ভবতঃ রুশ বংশোদ্ভুতদের একাংশের রাশিয়ায় চলে যাওয়া। যদিও কাজ্জাকিস্তানের রুশরা কাজ্জাকদের চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে তথাপি জাতিগত টানে অনেকে রাশিয়ায় চলে যাচ্ছে।

১৭। ২নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৮১ সালে বুরকিনা ফাসোর জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ মুসলমান, ৫ ভাগ খৃস্টান ও ৫৫ ভাগ এনিমিস্ট্ ছিল। দেশটি ওআইসি-র সদস্য। বর্তমানে সারা আফ্রিকা মহাদেশে এনিমিস্ট্রা ব্যাপকভবে ইসলাম ও খৃস্টধর্ম গ্রহণ

www.pathagar.com

করছে। একারণে বুরকিনা ফাসোতে ইতিমধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ ছাড়িয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই ৮৪নং সূত্রের তথ্য গ্রহণ করেছি। অবশ্য ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৮২ সালে বুরকিনা ফাসোর জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ ছিল মুসলমান।

১৮। মালাভী ওআইসি-র সদস্য নয়। ৮৪নং সূত্রে জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ।

১৯। অবশ্য ৪৩ নং তথ্যসূত্রে সেনেগালে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৯১ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ।

২০। ১৯৯২ সালে আযারবাইজানের জনসংখ্যা ছিল ৭৭ লাখ। এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ ছিল মুসলমান। (দৈনিক মিল্লাত ঃ ১৫-৬-১৯৯৩) কিন্তু ১নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৯৬-র মাঝামাঝি জনসংখ্যা ছিল ৭৫ লাখ ৮১ হাজার। বলা বাহুল্য যে, বিদ্রোহী নগোর্নো-কারাবাগের বিচ্ছিন্ন হয়ে আর্মেনিয়ায় যোগ দেয়ার পর সেখানকার আর্মেনীয়দের বাদ দেয়ায় জনসংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯৯০-এর শেষে নগোর্নো-কারাবাগের জনসংখ্যা ছিল ১ লাখ ৯০ হাজার যার শতকরা ৮০ ভাগ (অর্থাৎ ১ লাখ ৬২ হাজার) ছিল আর্মানী খৃস্টান। (Kayhan International : 22-9-1991) সে হিসেবে আর্মেনীয়দের বাদ দেয়ার পর মুসলিম ও অমুসলিমের অনুপাত ৮১ঃ১৯-এ দাঁড়িয়েছে।

২১। ৪নং সূত্রে শাদের জনসংখ্যা শতকরা ৪৪ ভাগ মুসলামান, ৩৩ ভাগ খৃস্টান ও ২৩ ভাগ এনিমিস্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ৭০নং সূত্রে 'অর্ধেকের সামান্য বেশী মুসলমান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৮৪নং সূত্রে শতকরা ৫২ ভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য ৮৭ নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ।

২২। ২নং তথ্যসূত্র অনুযায়ী ১৯৭৯ সলে বেনিনের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ এনিমিস্ট, ১৫ ভাগ খৃস্টান, ১৩ ভাগ মুসলমান ও ৭ ভাগ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছিল। বেনিন ওআইসি-র সদস্য। সে হিসেবে সেখানে মুসলমান মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ—এটা বিশ্বাস করা কঠিন। অন্যদিকে সারা আফ্রিকায় প্রতিনিয়ত এনিমিস্টরা ইসলাম গ্রহণ করছে। তাই ৮৪নং সূত্রের তথ্যই সঠিক বলে মনে হয় । অবশ্য ৮৭ নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ।

www.pathagar.com

২৩। ৩৯নং তথ্যসূত্র অনুযায়ী সিয়েরা লিওনে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ। এটা ১৯৭০-এর দশকের সংখ্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ৪নং সূত্রে সেখানে ১৯৭৪ সালে মুসলিম ৪০%, খৃস্টান ৯% ও বাকীরা এনিমিস্ট্ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য ৮৭ নং সূত্রে ১৯৮২ সালে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এনিমিস্টদের ইসলাম গ্রহণ প্রবণতার ভিত্তিতে আমরা ৩৯নং সূত্রের তথ্য গ্রহণ করেছি।

২৪। ৩৯নং সূত্রে ১৯৭০-এর দশকে তোগোর জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমান ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৪নং সূত্রে বলা হয়েছে ৩৭ ভাগ। তাই মাঝামাঝি হিসেবে ৮৪নং সূত্রের ভিত্তিতে মুসলিম জনসংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে।

২৫। লেবাননের জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমান বলে ৮৪নং ও আরো কতক তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তা সঠিক নয়। এক্ষেত্রে ৪৫নং সূত্রের তথ্য সঠিক বলে মনে হয়েছে। মুসলমানদের হার বৃদ্ধি পাবার কারণ লেবানন সংক্রান্ত মূল আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬। ১৪নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৯০-এর শেষে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৪৪ ভাগ। গৃহযুদ্ধে কমপক্ষে দুই লাখ মুসলমান নিহত হয়। এর ফলে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৪৩ ভাগে এসে দাঁড়ায়।

২৭। এখানে কেবল ফিলিস্তিনে বসবাসকারী ফিলিস্তিনী জনগণের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে শতাব্দীশেষে ফিলিস্তিনীদের (মুসলিম ও খৃস্টান) সংখ্যা দাঁড়াবে গাযাহ্ ও পশ্চিম তীরে ২৮ লাখ এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ও অবৈধ যায়নবাদী ইসরাইলে ১২ লাখ। ইহূদীরা ইসরাইলী নাগরিক বিধায় তাদের এ হিসাবে ধরা হয় নি। ফিলিস্তিনী জনসংখ্যার অর্ধেক ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের বাইরে বসবাস করছে। তাদেরও এ হিসাবে ধরা হয় নি। কারণ, সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের জনসংখ্যার মধ্যে তাদেরকেও হিসাব করা হয়েছে। তাই দুইবার যোগ হওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে কেবল ফিলিস্তিনে বসবাসকারীদের সংখ্যাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৪৭-এর ভিত্তিতে মুসলিম-খৃস্টান অনুপাত হিসাব করা হয়েছে।

২৮। মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ওআইসি-র সদস্য নয়। দেশটি সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় নি। ২নং তথ্যসূত্রে দেশটির মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র শতকরা ৮ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। অবশ্য ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা চল্লিশ ভাগ। আমরা ৮৪ নং সূত্রের তথ্য গ্রহণ করেছি।

www.pathagar.com

২৯। ২নং সূত্রে আলবেনিয়ার জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক তথ্যবলী থেকে ৮৪নং সূত্রের তথ্যেরই সমর্থন মেলে।

৩০। আরব আমীরাতের জনসংখ্যার মধ্যে বৈধভাবে বসবাসরত বিদেশী নাগরিকরাও শামিল রয়েছে। সে হিসেবে মুসলিম জনসংখ্যার হার ২নং সূত্রে উল্লেখকৃত হারের চেয়ে কিছু কম হবে।

৩১। মেসিডোনিয়ার জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ১১নং সূত্রে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা সূত্রে মুসলমানদের সংখ্যালঘু বলে উল্লেখ করা হয়। ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানরা সেখানে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠী এবং ১৯৮১ সালে তারা ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩১.৪ ভাগ।

৩২। ১নং সূত্রে ১৯৯০-এর গড় অবস্থার ভিত্তিতে কুয়েতের জনসংখ্যার বৃদ্ধিহারকে নেতিবাচক দেখানো হয়েছে। ইরাকী আগ্রাসন ও দখলের পর বিদেশীদের ও অনেক কুয়েতীর কুয়েত ত্যাগের ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইরাকী দখলের অবসানের পর কুয়েতীরা ফিরে আসে; বিদেশীরাও ফিরে আসতে শুরু করে। তাই স্বাভাবিক জন্মহারসহ শতকরা ৩ ভাগ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনুমিত হয়েছে।

৩৩। ২নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৮০ সালে গ্যাবনের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ ছিল খৃস্টান, ২ ভাগ মুসলমান ও বাকী সবাই এনিমিস্ট্। অবশ্য ৮৭ নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা দশ ভাগ। কিন্তু ৭০% খৃস্টান ও মাত্র ২% বা ১০% মুসলমান অধ্যুষিত কোন দেশ ওআইসি-র সদস্যপদ গ্রহণ করবে এটা অকল্পনীয়। তাই ৮৪নং সূত্রে বর্ণিত মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ সঠিক বলে গণ্য করা হয়েছে। খৃস্টানদের সংখ্যাও শতকরা ৪০ ভাগের বেশী হবার সম্ভাবনা নেই।

৩৪। ৩৯নং সূত্রে সত্তরের দশকে জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ। অন্যদিকে ৪নং সূত্রে ১৯৮২ সালে জনসংখ্যার শতকরা ৫২ ভাগ এনিমিস্ট, ৪৮ ভাগ মুসলমান ও ১০ ভাগ খৃস্টান ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩৯নং সূত্রের তথ্যই সঠিক বলে মনে হয়েছে।

www.pathagar.com

৩৫। পশ্চিম সাহারার বেশীর ভাগ এলাকাই মরোক্কোর দখলে রয়েছে। ১৭নং সূত্রে ১৯৮৪ সালে দেশটির জনসংখ্যা ২ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাতে দেশত্যাগী ছাহ্‌রাভীদের এবং পশ্চিম সাহারায় বসবাসরত বা অবস্থানরত মরোক্কান বংশোদ্ভুতদের ধরা হয় নি। শুধু সেখানে অবস্থানরত ছাহ্‌রাভী (সাহারান) জনসংখ্যার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

৩৬। চেচনিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশ আযারবাইজানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১ ভাগ। সে হিসেবে চেচনিয়ার ক্ষেত্রেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১ ভাগ ধরা হয়েছে।

৩৭। ৭৪নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৯২ সালে আবখাযিয়ার জনসংখ্যা ছিল ৮ লাখ ১২ হাজার। ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধকালে দেড় লাখ জর্জীয় বংশোদ্ভুত দেশত্যাগ করে। আবখাযিয়ার সরকার তাদেরকে আবখাযিয়ার নাগরিক বলে গণ্য করে না। তাদেরকে বিয়োগ করলে ১৯৯২-র ভিত্তিতে আবখাযিয়ার বৈধ নাগরিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ লাখ ৬২ হাজার। এর ওপরে আনুমানিক শতকরা ১ ভাগ বার্ষিক বৃদ্ধিহার হিসাব করা হয়েছে। একটি সূত্র-অনুল্লেখিত তথ্যনোট অনুযায়ী ১৯৯২ সালে আবখাযিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২ লাখ ৫ হাজার। সে হিসেবে জর্জীয়দের বাদে মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের হার শতকরা ৩১ ভাগ। তবে তাদের প্রকৃত হার আরো বেশী হতে পারে।

৩৮। ৪নং তথ্যসূত্রে জিবুতীর জনসংখ্যার শতকরা ৯১ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৯। ১০নং তথ্যসূত্র অনুযায়ী ১৯৯১-র শেষে বাহ্‌রাইনের মোট জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৬২ দশমিক ২ ভাগ ছিল দেশী, বাকীরা ছিল বিদেশী।

৪০। ১নং তথ্যসূত্র অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে সাইপ্রাসের জনসংখ্যা ছিল ৭ লাখ ৪০ হাজার। ২নং তথ্যসূত্র অনুযায়ী সাইপ্রাসের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ মুসলমান (তুর্কী)। এর ভিত্তিতে তুর্কী সাইপ্রিয়টদের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে।

৪১। ময়োত্ দ্বীপ ফরাসী শাসনাধীনে রয়েছে।

৪২। ভারতের মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের দাবী করা হয় যার মধ্যে পারস্পরিক অমিল ও ব্যবধান অনেক বেশী। বিভিন্ন সূত্রে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ১২ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। ২৫ ভাগের দাবীটা ভারতের ইউনিয়ন মুসলিম লীগের। মুসলিম লীগের দাবী অনুযায়ী প্রকৃত ভোটার

www.pathagar.com

লিস্ট বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে। তাই আমরা এ দাবীটি সঠিক বলে গ্রহণ করছি।

৪৩। চীনের মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে ৭০নং সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন সূত্রে ১ কোটি ৪৬ লাখ থেকে ১৪ কোটি ৪০ লাখ পর্যন্ত দাবী করা হয়েছে। ৮৪নং সূত্রে বলা হয়েছে শতকরা ৬ ভাগ। অবশ্য ৮৭ নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা সাড়ে দশ ভাগ (১৯৬৮ সালের প্রাক্কলিত জনসংখ্যা)। আমরা মোটামুটি শতকরা ৮ ভাগ ধরে নিলাম। (এ সম্বন্ধে চীনের মুসলিম সংখ্যালঘু সংক্রান্ত আলোচনায় বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।)

৪৪। ফিলিপাইনের মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন পরিসংখ্যানের উল্লেখ করা হয়েছে। এসব সংখ্যার মধ্যে ৬০ লাখ বহুল প্রচলিত। কিন্তু দক্ষিণ ফিলিপাইনের স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম অঞ্চলের গভর্নর অধ্যাপক নূর মিসুয়ারী ১৯৯৭ সালে ঢাকায় ফিলিপাইনে মুসলমানদের সংখ্যা দুই কোটি বলে উল্লেখ করেন। (ইত্তেফাক ঃ ৮-৩-১৯৯৭) শুধু মুসলিম নেতা হিসেবে নয়, দায়িত্বশীল সরকারী পদের অধিকারী হিসেবে তাঁর উল্লেখকৃত পরিসংখ্যান সঠিক বলে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে ২০০০ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যা ও শতকরা হার নির্ণয় করা হয়েছে।

৪৫। ১৯৯৫-র পার্লামেন্ট নির্বাচনের পূর্বে রাশিয়ার একজন মুসলিম নেতা সে দেশের মুসলিম জনসংখ্যা দুই কোটি বলে উল্লেখ করেন। জাতিগত প্রজাতন্ত্রসমূহের মুসলিম জনসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মোট জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এটা সঠিক বলে মনে হয়। তাই ১৯৯৪ সালের জনসংখ্যা ২ কোটি ধরে বছরে কমপক্ষে শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি ধরা হয়েছে। ৮৯নং তথ্যসূত্রে রাশিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা ৩ কোটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু শতকরা হার বলা হয়েছে ২৫%। এটা একটা অসামঞ্জস্য। কারণ বর্তমানে রাশিয়ার জনসংখ্যা ১৫ কোটি। সে হিসাবে ২৫% মানে পৌনে চার কোটি। এছাড়া সূত্রটিতে তথ্যের মূল উৎসের উল্লেখ নেই।

৪৬। থাইল্যান্ডের মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন সংখ্যা ও শতকরা হার উল্লেখ করা হয়েছে। শতকরা হারে সর্বনিম্ন ৩ ভাগও উল্লেখ আছে। তবে ৭৯নং সূত্রে ২০ ভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূত্রের তথ্যের উৎস ক্রিসেন্ট ইন্টারন্যাশনাল যা তথ্যসূত্র হিসেবে খুবই নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া এক সময় দক্ষিণ থাইল্যান্ডে মুসলিম রাষ্ট্র ছিল। এ কারণে থাইল্যান্ডে মুসলমানদের এরূপ সংখ্যাশক্তি হওয়া স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

৪৭। ৮১ নং সূত্রে আমেরিকায় মুসলমানের সংখ্যা ৭৫ লাখ বলে আধাসরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা ১৯৯২ সালের অবস্থা। আমেরিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গড়ে শতকরা ১ ভাগ হলেও মুসলমানদের বৃদ্ধিহার অভিবাসী মিলিয়ে শতকরা ৫ ভাগের নীচে নয় কোন মতেই। এর ভিত্তিতেও ২০০০ সালের শেষে মুসলিম জনসংখ্যা ১ কোটি ১০ লাখে দাঁড়াবে।

৪৮। ২২নং সূত্রে (১৯৯১ সালে) বার্মার মুসলিম জনসংখ্যা ৮০ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে ২০০০ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা ও শতকরা হার নির্ণয় করা হয়েছে। অবশ্য ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ১৫ লাখ রোহিঙ্গা দেশের বাইরে ছিল। তাদেরকে সহ এ সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে।

৪৯। ৮৪ নং সূত্রে কেনিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ২১ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেখানে মুসলিম জনসংখ্যার হার ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এখানে ২নং সূত্রের তথ্য (২৪%) গ্রহণ করা হল। অবশ্য ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ।

৫০। ৮২নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৯৩-র শেষে ফ্রান্সে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৫০ লাখ। ২৫নং সূত্র অনুযায়ী ফ্রান্সে গড়ে দৈনিক ৩৫ জন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে। এছাড়া মুসলমানদের মধ্যে জন্মহার বেশী। অন্যদিকে প্রতি বছরই বহু মুসলমান অভিবাসীর আগমন ঘটছে। সেসবের ভিত্তিতে গড়ে বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি ধরা হয়েছে যা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

৫১। ৬৫নং সূত্রের ভিত্তিতে ১৯৯৬-র শেষে ব্রাজিলে মুসলিম জনসংখ্যা কমপক্ষে ১৬ লাখ ছিল বলে অনুমিত হয়। তবে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট প্রামাণ্য নয় ও অসম্পূর্ণ।

৫২ ২০ নং সূত্রের ভিত্তিতে হিসাব করলে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো (সাবেক জায়ের)-এর মুসলিম জনসংখ্যা আরো কম—শতকরা ৮ ভাগের মত মনে হয়।

৫৩। অবশ্য ২নং সূত্রে মাদাগাস্কারের জনসংখ্যার মাত্র ৫ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ৮৪নং সূত্রই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

৫৪। কোন কোন সূত্রে অবশ্য জাপানে মুসলমানদের সংখ্যা এক লাখের নীচে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জাপানে অভিবাসী ও চাকরিরত লোকদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান রয়েছে। ৫২নং সূত্রে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫৫। সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো প্রজাতন্ত্র দু'টি নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রতর যুগোস্লাভিয়ার মুসলমানরা প্রধানতঃ তিনটি এলাকায় কেন্দ্রীভূত। সার্বিয়া প্রজাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন কসোভো প্রদেশে ১৯৯২ সালে ২০ লাখ আলবেনীয় বংশোদ্ভূত

www.pathagar.com

মুসলমান ছিল। (New Nation : 10-9-1993) একই সময় সার্বিয়ার অন্তর্গত সানজাক্ এলাকায় ২ লাখ ৫৩ হাজার মুসলমান ছিল। (ইনকিলাব ঃ ১৯-১-১৯৯৩) একই সময় মন্টিনিগ্রো প্রজাতন্ত্রে ২ লাখ ৫০ হাজার মুসলমান ছিল। (ইনকিলাব ঃ ২-২-১৯৯৩) এর ভিত্তিতে যুগোস্লাভিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার নির্ণয় করা হয়েছে এবং জাতীয় বৃদ্ধিহারের ভিত্তিতে ২০০০ খৃস্টাব্দের জনসংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে।

৫৬। অবশ্য ৩৩নং তথ্যসূত্রে কম্বোডিয়ার জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৪ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৭। ৮৪নং সূত্রে বুলগেরিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ১১ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ৫১নং সূত্রের তথ্যই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।

৫৮। ৫০নং তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে বৃটেনের জনসংখ্যায় মুসলমানদের হার নির্ণীত হয়েছে। এর ভিত্তিতে শতাব্দীশেষের সংখ্যা নির্ণীত হয়েছে।

৫৯। ৭৪নং সূত্রের ভিত্তিতে জর্জিয়ার স্বাধীনতাকালীন মুসলিম জনসংখ্যা থেকে আবখাযিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা বাদ দিয়ে জর্জিয়ার মুসলিম জনসংখ্যার হার নির্ণয় করা হয়েছে।

৬০। ৫৪নং তথ্যসূত্রে জিম্বাবের জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬১। ৮৪ নং সূত্রে লাইবেরিয়ার জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য সূত্রে ২৫ থেকে ৫০ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন হারের উল্লেখ দেখা যায়। অবশ্য ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগ।

৬২। অবশ্য ৬০নং তথ্যসূত্রে তাইওয়ানের মুসলিম জনসংখ্যা আরো কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৩। ৬৪নং সূত্রে মেক্সিকোর মুসলিম জনসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে জাতীয়ভিত্তিক বৃদ্ধিহার যোগ করে দেশটির শতাব্দীশেষের মুসলিম জনসংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে।

৬৪। দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগুরু খৃস্টানদের মধ্যে এবং সংখ্যালঘু হিন্দু ও এনিমিস্টদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তাই শতাব্দীশেষে তাদের সংখ্যা ও শতকরা হার আরো বেশী হবার সম্ভাবনা আছে।

৬৫। অবশ্য ৮৪নং তথ্যসূত্রে নেপালে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৭ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ সূত্রেই শতকরা ৩ ভাগ বা তার কম উল্লেখ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩৫নং সূত্রের তথ্য সর্বাধিক প্রামাণ্য বলে তা-ই গ্রহণ করা হয়েছে।

৬৬। ২নং সূত্র অনুযায়ী সিঙ্গাপুরের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ মালয়ী বংশোদ্ভূত এবং শতকরা ৮ ভাগ পাকিস্তানী ও ভারতীয় বংশোদ্ভুত। মালয়ীরা মুসলমান। ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের প্রায় সকলেই মুসলমান ।.

৬৭। ২নং তথ্যসূত্রে মরিসাসের জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১৬ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা বাস্তবভিত্তিক বলে মনে হয় না। তবে দেশটিতে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু।

৬৮। ৫৪নং তথ্যসূত্রে বর্ণিত মুসলিম জনসংখ্যার ভিত্তিতে ২০০০ খৃষ্টাব্দের শেষে অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাব্য মুসলিম জনসংখ্যা প্রাক্কলিত হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে শতকরা হার নির্ধারিত হয়েছে। তবে দীক্ষার ফলে এ হার আরো বেশী দাঁড়াবে।

৬৯। ২৭নং সূত্রে বর্ণিত কানাডার মুসলিম জনসংখ্যার ভিত্তিতে স্বাভাবিক বৃদ্ধি যোগ করে সংখ্যা ও শতকরা হার বের করা হয়েছে।

৭০। দৈনিক কেইহনের ১৬-৬-১৯৯১ সংখ্যায় নেদারল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা ৪ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে বার্ষিক অন্যূন শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি ধরা হয়েছে।

৭১। দৈনিক কেইহন ১৬-৬-১৯৯১ সংখ্যা অনুযায়ী বেলজিয়ামে ( ১৯৯০ সালে) মুসলিম জনসংখ্যা ছিল সাড়ে তিন লাখ। এর সাথে জাতীয়ভিত্তিক গড় বৃদ্ধি যোগ করা হয়েছে।

৭২। ৬১নং সূত্রের ভিত্তিতে সুইডেনের মুসলমানদের শতাব্দীশেষে জনসংখ্যা ও শতকরা হার নির্ণয় করা হয়েছে।

৭৩। ৫৯নং তথ্যসূত্র অনুযায়ী ১৯৯৭-র শেষে সুইজারল্যান্ডে মুসলমান সংখ্যা ছিল দুই লাখ। এর সাথে জাতীয়ভিত্তিক বৃদ্ধিহার যোগ করা হয়েছে এবং শতকরা হার নির্ণয় করা হয়েছে।

৭৪। ৫৬নং তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে মঙ্গোলিয়ার জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের হার শতকরা সাড়ে ৬ ভাগ বলে অনুমিত হয়।

৭৫। ২নং তথ্যসূত্রে ফিজির জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৭৬। ৭২নং সূত্রে মাল্টার জনসংখ্যার শতকরা ১১.৪% মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৭। সূত্রে উল্লেখকৃত মুসলমানদের শতকরা হার বহু পূর্বের। ত্রিনিদাদ ও তোবাগোতে মুসলমানরা খুবই শক্তিশালী। রাষ্ট্রক্ষমতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা রয়েছে। তাই ইতিমধ্যেই তাদের সংখ্যাশক্তি আরো বেশী হবার সম্ভাবনা।

৭৮। ৭৪নং সূত্র অনুযায়ী ১৯৯২ সালে ইউক্রেনে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার। ইউক্রেনে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার সামান্য নেতিবাচক। তাই মুসলিম জনসংখ্যা স্থির ধরা হয়েছে। অবশ্য ৮৭নং সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা শূন্য দশমিক ৩ ভাগ।

৭৯। South, September 1995-তে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে ভুটানের জনসংখ্যা ১১ লাখ ৮৭ হাজার বলে অনুমিত হয়। World Bank Atlas 1994 অনুযায়ী ১৯৯২ সালে দেশটির জনসংখ্যা ছিল ১৪ লাখ ৯৭ হাজার। কিন্তু World Bank Atlas 1998 অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে দেশটির জনসংখ্যা মাত্র ৭ লাখ ১৫ হাজার। অথচ দেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইতিবাচক; প্রথম দু'টি সূত্রে শতকরা ২.২ এবং শেষোক্ত সূত্রে ২.৯। এ অসামঞ্জস্য সত্যিই দুর্বোধ্য।

৮০। ২নং তথ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে, সিচেল্‌সে মুসলমান আছে। কিন্তু কোন সংখ্যা বা শতকরা হার উল্লেখ করা হয় নি। তাই আনুমানিক কমপক্ষে শতকরা ১ ভাগ ধরা হল।

৮১। ২নং তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাহামায় মুসলমান আছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বা শতকরা হার উল্লেখ নেই। তাই আনুমানিক কমপক্ষে শতকরা ১ ভাগ ধরা হল।

৮২। ৮৭ নং সূত্রে ১৯৮২ সালে চিলিতে ১ হাজার মুসলমান ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৩। ৮৭ নং সূত্রে ১৯৮২ সালে বারমুডায় ৫০০ মুসলমান ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদিনে তাদের সংখ্যা আনুমানিক ১ হাজারে উন্নীত হয়ে থাকবে।

৮৪। ৮৭ নং সূত্রে ১৯৮২ সালে পুয়ের্টোরিকোতে ৩০০ মুসলমান ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদিনে তাদের সংখ্যা আনুমানিক ১ হাজারের কাছাকাছি হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

**পরিশিষ্ট-১**

# ওআইসি-র সদস্য দেশসমূহ

| | দেশের নাম | রাজধানী |
|---|---|---|
| ১। | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা |
| ২। | বাংলাদেশ | ঢাকা |
| ৩। | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ |
| ৪। | তুরস্ক | আঙ্কারা |
| ৫। | মিসর | কায়রো |
| ৬। | ইরাক | বাগদাগ |
| ৭। | সউদী আরব | রিয়াদ |
| ৮। | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর |
| ৯। | ইরান | তেহরান |
| ১০। | লেবানন | বৈরুত |
| ১১। | সূদান | খার্তুম |
| ১২। | লিবিয়া | ত্রিপোলি |
| ১৩। | আফগানিস্তান | কাবুল |
| ১৪। | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স |
| ১৫। | সোমালিয়া | মোগাদীসূ |
| ১৬। | মরোক্কো | রাবাত |
| ১৭। | ইয়েমেন | সান্‌আ |
| ১৮। | জর্দান | আম্মান |
| ১৯। | সিরিয়া | দামেশ্‌ক |
| ২০। | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবু যাবী |
| ২১। | ওমান | মাস্কাত |
| ২২। | কুয়েত | কুয়েত |
| ২৩। | কাতার | দোহা |
| ২৪। | বাহরাইন | মানামা |
| ২৫। | তিউনিসিয়া | তিউনিস |

www.pathagar.com

| | | |
|---|---|---|
| ২৬। | মালদ্বীপ | মালে |
| ২৭। | শাদ | এন্‌জামেনা |
| ২৮। | বুরকিনা ফাসো | কুয়াগাদুগু |
| ২৯। | জিবুতী | জিবুতী-ভাইল্‌ |
| ৩০। | সেনেগাল | দাকার |
| ৩১। | সিয়েরা লিওন | ফ্রীটাউন |
| ৩২। | ক্যামেরূন | ইয়াউন্দে |
| ৩৩। | কমোরো | মোরোনি |
| ৩৪। | মালী | বামাকো |
| ৩৫। | মাওরিতানিয়া | নুয়াক্‌চোত্‌ |
| ৩৬। | গাম্বিয়া | বান্‌জুল |
| ৩৭। | নাইজার | নিয়ামী |
| ৩৮। | বেনিন | পোর্তো নোভো |
| ৩৯। | গ্যাবন | লিভারভিল |
| ৪০। | গিনি | কোনাক্‌রি |
| ৪১। | গিনি বিসাউ | বিসাউ |
| ৪২। | উগান্ডা | কাম্পালা |
| ৪৩। | আযারবাইজান | বাকু |
| ৪৪। | তুর্কামানিস্তান | এশ্‌ক্‌ আবাদ |
| ৪৫। | কিরগিজিস্তান | ফোরুন্‌জাহ্‌ |
| ৪৬। | উজবেকিস্তান | তাশকান্দ্‌ |
| ৪৭। | কাজ্জাকিস্তান | আল্‌মা আতা |
| ৪৮। | তাজিকিস্তান | দোশাম্বে |
| ৪৯। | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | সারাযেভো |
| ৫০। | ইরিত্রিয়া | আস্‌মারা |
| ৫১। | ফিলিস্তিন | আরিহা (জেরিকো) |
| ৫২। | ব্রুনাই | বান্দার সেরি বাগাওয়ান |
| ৫৩। | সুরিনাম | পারামারিবো |

www.pathagar.com

**পরিশিষ্ট-২**

# ওআইসি-বহির্ভূত মুসলিম দেশসমূহ

## আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশসমূহ ঃ

| | দেশের নাম | রাজধানী |
|---|---|---|
| ১। | নাইজেরিয়া | আবুজা |
| ২। | আলবেনিয়া | তিরানা |
| ৩। | ইথিওপিয়া | আদ্দিস্ আবাবা |
| ৪। | মেসিডোনিয়া | স্কোপিয়া |
| ৫। | ঘানা | আক্রা |
| ৬। | মালাভী | লিলোঙ্ওয়ে |
| ৭। | তাঞ্জানিয়া | দারুস সালাম |
| ৮। | তোগো | লোমে |
| ৯। | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুল্ |
| ১০। | আইভরি কোস্ট্ | আবিদ্জান |
| ১১। | মোযাম্বিক | মাপুতো |

## আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিবিহীন দেশসমূহ ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১। | পশ্চিম সাহারা | হাউযা |
| ২। | চেচনিয়া (ইচকেরিয়া) | গ্রোজ্নী |
| ৩। | আব্খাযিয়া | সুখুমী |
| ৪। | সাইপ্রাস | লিমোসোল |

## পরাধীন দেশ ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১। | মায়োত্ দ্বীপ | দেযাউদ্যী |

www.pathagar.com

## পরিশিষ্ট-৩

# ওআইসিভুক্ত ও মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশসমূহের আয়তন

| ক্রমিক | নাম | আয়তন[১] (বর্গকিলোমিটার) |
|---|---|---|
| ১। | কাজ্জাকিস্তান | ২৭,১৫,১০০ |
| ২। | সূদান | ২৫,০৫,৮১৩ |
| ৩। | আলজেরিয়া | ২৩,৮১,৭৪১ |
| ৪। | সউদী আরব | ২১,৪৯,৬৯০ |
| ৫। | ইন্দোনেশিয়া | ২০,৪২,০২৪ |
| ৬। | লিবিয়া | ১৭,৫৯,৫৪০ |
| ৭। | ইরান | ১৬,৪৮,১৯৫ |
| ৮। | শাদ | ১২,৮৪,০০০ |
| ৯। | নাইজার | ১২,৬৭,০০০ |
| ১০। | মালী | ১২,৪০,১৪২ |
| ১১। | ইথিওপিয়া | ১১,০৪,৩০০ |
| ১২। | মাওরিতানিয়া | ১০,৩০,৭০০ |
| ১৩। | মিসর | ১০,০১,৪৪৯ |
| ১৪। | তাঞ্জানিয়া | ৯,৪৫,০৮৭ |
| ১৫। | নাইজেরিয়া | ৯,২৩,৭৬৮ |
| ১৬। | পাকিস্তান | ৮,০৩,৯৪৩ |
| ১৭। | মোযাম্বিক | ৭,৯৯,৩৮০ |
| ১৮। | তুরস্ক | ৭,৮০,৫৭৬ |
| ১৯। | আফগানিস্তান | ৬,৪৭,৪৯৭ |
| ২০। | সোমালিয়া | ৬,৩৭,৬৫৭ |
| ২১। | মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র | ৬,২২,৯৮৪ |
| ২২। | ইয়েমেন | ৫,২৭,৯৬৮ |
| ২৩। | তুর্কামানিস্তান | ৪,৮৮,১০০ |
| ২৪। | ক্যামেরুন | ৪,৭৫,৪৪২ |
| ২৫। | মরোক্কো | ৪,৫৮,৭৩০ |

www.pathagar.com

| | | |
|---|---|---|
| ২৬। | উযবেকিস্তান | ৪,৪৯,৬০০ |
| ২৭। | ইরাক | ৪,৩৮,৪৪৬ |
| ২৮। | মালয়েশিয়া | ৩,২৯,৭৪৯ |
| ২৯। | আইভরি কোস্ট | ৩,২২,৪৬৩ |
| ৩০। | বুরকিনা ফাসো | ২,৭৪,২০০ |
| ৩১। | গ্যাবন | ২,৬৭,৬৬৭ |
| ৩২। | পশ্চিম সাহারা | ২,৬৬,০০০ |
| ৩৩। | গিনি | ২,৪৫,৮৫৭ |
| ৩৪। | ঘানা | ২,৩৮,৫৩৭ |
| ৩৫। | উগান্ডা | ২,৩৬,০৩৬ |
| ৩৬। | ওমান | ২,১২,৪৫৭ |
| ৩৭। | কিরগিজিস্তান | ১,৯৮,৫০০ |
| ৩৮। | সেনেগাল | ১,৯৬,১৯২ |
| ৩৯। | সিরিয়া | ১,৮৫,১৮০ |
| ৪০। | তিউনিসিয়া | ১,৬৪,১৫০ |
| ৪১। | সুরিনাম | ১,৬৩,২৫৬ |
| ৪২। | বাংলাদেশ | ১,৪৭,৫৭০ |
| ৪৩। | তাজিকিস্তান | ১,৪৩,১০০ |
| ৪৪। | মালাভী | ১,১৮,৪৮৪ |
| ৪৫। | ইরিত্রিয়া | ১,১৭,৬০০ |
| ৪৬। | বেনিন | ১,১২,৬২২ |
| ৪৭। | জর্দান | ৯৭,৭৪০ |
| ৪৮। | আযারবাইজান | ৮৬,৬০০ |
| ৪৯। | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮৩,৬০০ |
| ৫০। | সিয়েরা লিওন | ৭১,৭৪০ |
| ৫১। | তোগো | ৫৬,০০০ |
| ৫২। | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | ৫১,১২৯ |

www.pathagar.com

| | | |
|---|---|---|
| ৫৩। | গিনি বিসাউ | ৩৬,১২৫ |
| ৫৪। | আলবেনিয়া | ২৭,৭৪৮ |
| ৫৫। | ফিলিস্তিন | ২৭,০০০ |
| ৫৬। | মেসিডোনিয়া | ২৫,৭১৩ |
| ৫৭। | জিবুতী | ২২,০০০ |
| ৫৮। | কুয়েত | ১৭,৮১৭ |
| ৫৯। | চেচনিয়া (ইচকেরিয়া) | ১৬,০০০ [২] |
| ৬০। | গাম্বিয়া | ১১,২৯৫ |
| ৬১। | কাতার | ১১,০০০ |
| ৬২। | লেবানন | ১০,৪০০ |
| ৬৩। | আবখাযিয়া | ৮,৬০০ |
| ৬৪। | ব্রুনাই | ৫,৭৬৫ |
| ৬৫। | সাইপ্রাস | ৩,৪২৩ [৩] |
| ৬৬। | কমোরো | ১,৭৯৭ |
| ৬৭। | বাহ্‌রাইন | ৬২২ |
| ৬৮। | মায়োত্ দ্বীপ | ৩৭৩ |
| ৬৯। | মালদ্বীপ | ২৯৮ |

**পাদটীকা ঃ**

১) চেচনিয়া ও আবখাযিয়ার আয়তন اقليتهای مسلمان درجهان امروز গ্রন্থ থেকে এবং অন্যান্য দেশের আয়তন گيتا شناسی كشورها গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

২) প্রাপ্ত একাধিক তথ্যসূত্রে চেচনিয়া ও ইঙ্গুশতিয়ার মিলিত আয়তন ১৯,৩০০ বর্গকিলোমিটার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু চেচনিয়া ও ইঙ্গুশতিয়ার মানচিত্রদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, চেচনিয়ার আয়তন ১৬ হাজার বর্গকিলোমিটারের মত হবে। তাছাড়া কারাচাই চারকেসের আয়তন ১৪,১০০ বর্গকিলোমিটার বলে উল্লেখ করা হয়েছে—মানচিত্রদৃষ্টে যার তুলনায় চেচনিয়াকে কিছুটা বড় বলে মনে হয়।

৩) গোটা সাইপ্রাস দ্বীপের আয়তন ৯২৫১ বর্গকিলোমিটার।সাইপ্রাসের শতকরা ৩৭ ভাগ এলাকা তুর্কীদের নিয়ন্ত্রণের রয়েছে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট–৪

# অমুসলিম-প্রধান দেশসমূহের কতিপয় মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকার আয়তন

| ক্রমিক | নাম | দেশ | আয়তন[১] (বর্গকিলোমিটার) |
|---|---|---|---|
| ১। | ইয়াকুতিয়া | রাশিয়া | ৪৫,৫৬,৪০০[২] |
| ২। | সিনকিয়াং | চীন | ১৬,৪৬,৭০০ |
| ৩। | দক্ষিণ ফিলিপাইন | ফিলিপাইন | ১,৫০,০০০[৩] |
| ৪। | বাশকোরোস্তান | রাশিয়া | ১,৪৩,০০০ |
| ৫। | জম্মু ও কাশ্মীর | ভারত | ১,০১,৩৮৭ |
| ৬। | তাতারিস্তান | রাশিয়া | ৮৬,০০০ |
| ৭। | আরাকান | বার্মা (মায়ানমার) | ৬৪,৭৫০ |
| ৮। | দাগেস্তান | রাশিয়া | ৫০,৩০০ |
| ৯। | উদ্‌মুত | রাশিয়া | ৪২,১০০ |
| ১০। | ক্রিমিয়া | ইউক্রেন | ২৭,০০০[৪] |
| ১১। | মারদু | রাশিয়া | ২৬,২০০ |
| ১২। | মারী | রাশিয়া | ২৩,৮০০ |
| ১৩। | চুভাস | রাশিয়া | ১৮,৩০০ |
| ১৪। | কারাচাই চারকেশ | রাশিয়া | ১৪,১০০ |
| ১৫। | কাবারদিনো বেলকারিয়া | রাশিয়া | ১২,৫০০ |
| ১৬। | কসোভো | যুগোস্লাভিয়া (সার্বিয়া) | ১০,৮৮৭ |
| ১৭। | সানজাক | যুগোস্লাভিয়া | ৮,৬৮৭ |
| ১৮। | উত্তর ওশেতিয়া | রাশিয়া | ৮,০০০ |
| ১৯। | আদিগাহ্ | রাশিয়া | ৭,৬০০ |
| ২০। | দক্ষিণ ওশেতিয়া | জর্জিয়া | ৩,৯০০ |
| ২১। | ইঙ্গুশ্‌তিয়া | রাশিয়া | ৩,৩০০[৫] |
| ২২। | আযারিস্তান | জর্জিয়া | ৩,০০০ |
| ২৩। | লাক্ষা দ্বীপ | ভারত | ৩২ |

www.pathagar.com

**পাদটীকা ঃ**

১। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভূক্ত এলাকাসমূহের (ইয়াকুতিয়া বাদে) আয়তন اقليتهای مسلمان درجهان امروز গ্রন্থ থেকে, সিনকিয়াং ও লাক্ষা দ্বীপের আয়তন گيتا شناسی كشورها গ্রন্থ থেকে এবং অন্যান্য জায়গার আয়তন অন্য সূত্র থেকে নেয়া হয়েছে।

২) ইয়াকুতিয়ার সঠিক আয়তন জানা যায় নি। প্রাপ্ত সূত্রে ইয়াকুতিয়ার আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের তিনগুণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে এ আয়তন অনুমিত হয়েছে। প্রকৃত আয়তন এর চেয়ে কিছু কম বা বেশী হবে।

৩) দক্ষিণ ফিলিপাইনের ১৩টি প্রদেশ মুসলিম প্রধান। এর প্রকৃত আয়তন জানা যায় নি। তবে মানচিত্রের দিকে তাকালে এ অঞ্চল ফিলিপাইনের অর্ধেক বলে মনে হয়। এর ভিত্তিতে আনুমানিক আয়তন ধরা হয়েছে।

৪) অবশ্য বর্তমানে ক্রিমিয়ায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু। তবে ঐতিহাসিকভাবে ক্রিমিয়া তাতার মুসলমানদের ভূখণ্ড এবং এখনো সে পরিচিতি অব্যাহত আছে।

৫) তথ্যসূত্রে চেচেন-ইঙ্গুশতের আয়তন একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯,৩০০ বর্গ কিলোমিটার। এ থেকে চেচনিয়ার আনুমানিক আয়তন বাদ দেয়া হয়েছে। (এ প্রসঙ্গে পরিশিষ্ট-৩-এর ১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

www.pathagar.com

# তথ্যসূত্র

[অত্র গ্রন্থ রচনায় সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত তথ্যসূত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে।]

**গ্রন্থাবলী ঃ**

১ــ گیتا شناسی کشورها : محمود محجوب وفرامرز یاوری ــ انتشارات گیتاشناسی - تهران ــ چاپ دوم -دی ۱۳۶۲ هـ ش

২ــ کشورهای جهان : عبد الحسین سیدیان ــ انتشارات علم و زندگی ـ تهران ــ چاپ دوم - ۱۳۶۹ هـ ش

৩ــ سالنامه مرکز آمار ایران ــ ۱۳۶۹ هـ ش ــ (بخش آمارهای بین المللی) : مرکز آمار ایران - تهران

৪ــ سالنامه مرکز آمار ایران ــ ۱۳۶۸ هـ ش - مرکز آمار ایران ـ تهران

৫ــ سالنامه مرکز آمار ایران ــ۱۳۶۵ هـ ش ــ مرکز آمار ایران ــ تهران

৬ــ بریطانیا وابن سعود العلاقات السیاسیاة وتاثیروها علی المشکلة الفلسطینیة ــ محمد علی سعید ــ دار الجزیرة للنشر - لندن ـ ۱۳۰۲ هـ ــ ۱۹۸۲م

৭ــ اقلیتهای مسلمان در جهان امروز ــ تالیف : علی کتانی - ترجمه : محمد حسین آریا ــ موسسه انتشارات امیر کبیر ــ تهران ــ ۱۳۶۸ هـ ش

www.pathagar.com

8. *Muslim Unrest in China*. Published from Hong Kong
9. *World Bank Atlas 1998*, Washington, D.C. U.S.A.
10. *The Oxford Enyclopedia of the Modern Islamic World*
11. *Profiles of Islamic Countries* : Islamic Propagation Organization, Tehran, 1989
12. *Muslims of Nepal* by Shamima Siddika. Everest Book Service, Jamal, Kathmondu
13. *Manifesto of the Arakan Rohingya Islamic Front*, Second Edition, 1991
14. *An Introduction to the History of the Spread of Islam* by Abdul-Fazil Ezzati; The Ahl-ul-Bayt (AS) World Assembly, Qom, Islamic Republic of Iran, 1994
15. *American Heritage Dictionary of English Language* : American Heritage Publishing Co. Inc., New York

পত্রিকা-সাময়িকী-বুলেটিন ঃ

১৬ ــ روزنامه جمهوری اسلامی ــ تهران

১৭ ــ روزنامه اطلاعات ــ تهران

১৮ ــ روزنامه کیهان ــ تهران

১৯ ــ الکیهان العربیة ــ طهران

২০ ــ جشم انداز ــ تهران

21. Tehran Times : Tehran
22. Kayhan International : Tehran
23. Iran News, Tehran
24. Daily Telegraph : Dhaka

www.pathagar.com

25. Daily Star : Dhaka
26. Morning Sun : Dhaka
27. Independent : Dhaka
28. Financial Express : Dhaka
29. New Nation : Dhaka
30. South: London
31. Asiaweek : Hong Kong
32. Newsweek : New York
33. Time : New York
34. Bangladesh Today : Dhaka
35. Friday : Dhaka
36. Crescent International : Toronto, Canada
37. Echo of Islam : Tehran
38. Mahjubah : Tehran
39. World Muslim League Journal : Makka
40. Arakan ( Bulletines)
41. Updated Reports in Human Rights Violations in Tunisia

৪২। দৈনিক ইনকিলাব ঃ ঢাকা
৪৩। দৈনিক মিল্লাত ঃ ঢাকা
৪৪ দৈনিক ইত্তেফাক ঃ ঢাকা
৪৫। দৈনিক সংগ্রাম ঃ ঢাকা
৪৬। দৈনিক আলমুজাদ্দেদ ঃ ঢাকা
৪৭। দৈনিক দিনকাল ঃ ঢাকা
৪৮। দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ঢাকা
৪৯। দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ ঢাকা
৫০। সাপ্তাহিক জাহানে নও ঃ ঢাকা
৫১। সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ঃ ঢাকা
৫২। পাক্ষিক পালাবদল ঃ ঢাকা
৫৩। মাসিক নিউজ লেটার ঃ ঢাকা
৫৪। সাপ্তাহিক কলম ঃ কলিকাতা

www.pathagar.com

**বার্তাসংস্থা ও ফিচার ব্যুরো ঃ**

55. IPS
56. AP (Through UNB)
57. Reuters (Through BSS)
58. AFP (Through BSS)
59. Sinhua (Through BSS)
60. PTI (Through BSS)
61. IRNA (Through BSS)
62. POLE (Through BSS)

**বিবিধ ঃ**

63. Moro National Libration Front (MNLF) কর্তৃক প্রকাশিত ফিলিপাইনের মানচিত্র
64. Map of the Islamic World وسسه جغرافیائی وکار توگرافی سحاب ــ تهران - ۱۹۸۴ م

**৬৫। সাক্ষাৎকার ও আলোচনা ঃ**

ক) আবদুল কাদের ওরিরে, প্রাদেশিক প্রধান বিচারপতি ঃ সোকোতো স্টেট, নাইজেরিয়া

খ) মোহাম্মদ আউয়াল (সাংবাদিক) ঃ নাইজেরিয়া

গ) কাদাফো মোহাম্মাদ ( সাংবাদিক) ঃ ইথিওপিয়া

ঘ) আবদুর রাজ্জাক জালালুদ্দীন (বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপক) ঃ ফিলিপাইন

ঙ) আলী ইয়াকুব (সাংবাদিক) ঃ ফিলিপাইন

চ) এম, ইস্কান্দার খান খান্‌খেন্ ( মোবাল্লেগ) ঃ থাইল্যান্ড

ছ) মোহাম্মদ আল্‌মা'মূন আল্‌হুদাইবী ( সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি; সাবেক মহাসচিব ঃ ইখওয়ানুল মুসলিমীন) ঃ মিসর

জ) শাব্বীর হুসাইন ( রাজনীতিবিদ) ঃ আরাকান

www.pathagar.com